সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন ২০১০

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

সেমিনার-প্রবন্ধ সংকলন
২০১০

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

সূচীক্রম

সেমিনার-প্রবন্ধ

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত
মুহাম্মদ নূরুল আমিন ॥ ৫

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ২৫

ইসলামে নারীর মর্যাদা
খোন্দকার রোকনুজ্জামান ॥ ৫৩

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার অবসান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ
ড. মাহফুজ পারভেজ ॥ ৯২

ইসলামী ব্যবস্থাপনা
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ॥ ১০৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধানের উপায়
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ॥ ১৫১

বঙ্গভঙ্গ, না বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
ড. মাহফুজ পারভেজ ॥ ১৯৫

সার্ক : সূচনা ও ক্রমবিকাশ
মুহাম্মদ নূরুল আমিন ॥ ২১৫

কাশ্মীর : ভারতের তৈরি আরেক ফিলিস্তিন
আজিজুল হক বান্না ॥ ২৩১

পরিশিষ্ট

সেমিনার-প্রতিবেদন
মোশাররফ হোসেন খান ॥ ২৯৩

www.pathagar.com

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

ভূমিকা

দেশপ্রেম এবং আত্ম মর্যাদাবোধ স্বাধীন সার্বভৌম যে কোনও দেশের জন্য একটি সম্পদ। দেশের সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, সরকারী কর্মকতা-কর্মচারী এবং রাষ্ট্রনায়কদের দেশপ্রেম দেশের অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এদের যে কোন একটি শ্রেণীর দেশপ্রেমে ঘাটতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দেশ প্রেমকে সর্বত্র সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়, দেশপ্রেমিকরা শ্রদ্ধার পাত্র হন এবং যাদের দেশ প্রেম নেই তাদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরা সর্বকালে, সর্বযুগে নিন্দার পাত্র। আত্মমর্যাদাবোধ দেশ প্রেমিকদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই দুই এর সমন্বয় মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায় এবং আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে মুকাবিলা করতে উজ্জীবিত করে। দেশপ্রেম ছাড়া মুসলিম মিল্লাতের কল্পনা করা যায় না। একটি আরবী প্রবচনে বলা হয়েছে 'হব্বুল ওয়াতন মিনাল ঈমান' অর্থাৎ দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। বিগত শতাব্দীসমূহে এই উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের প্রতিকূল শক্তির মুকাবিলায় দেশপ্রেম ও ঈমানী দায়িত্ব পালনের বহু অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং এখনো স্থাপন করে চলেছে। তাদের সাফল্য গাথার বহু চিত্র ইতিহাস গ্রন্থ ও সাহিত্যের পাতায় ছড়িয়ে আছে এবং যুগে যুগে নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করছে। ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও দেশ প্রেমের অনুরূপ নজির পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

রামায়নের একটি আখ্যানকে কেন্দ্র করে কবি মধুসুদন দত্ত প্রণীত রূপকাশ্রয়ী কাহিনী মেঘনাদবধ কাব্যেও এর নজির রয়েছে। এই কাব্যে কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে/উজ্জলিত নাট্যশালা সম আছিল এ মোর সুন্দরী পুরী– অর্থাৎ রাবনের সোনার লংকা বহিরাগত শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লন্ডভন্ড ও ধ্বংস প্রাপ্ত হতে দেখি, কিন্তু রাবন এর প্রতিকার করতে পারছেন না। তার দেশপ্রেম শোর্যবীর্য কোনও কাজে আসছেনা। এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য অস্ত্রবল, সৈন্যবল ও অর্থবলের তার কোনও কমতি ছিলনা। কিন্তু তা সত্বেও লংকায় 'একে একে শুকাইছে ফুল, নিভিছে দেউটি'। শত্রুর আক্রমণ আর তারই পিতৃব্য ঘরের শত্রু বিভীষণ রাবনের কপালে কলংক তিলক পরিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায়ও রাবন ভাঙ্গছে কিন্তু মচকাচ্ছে না। তারস্বরে সে জানিয়ে দিচ্ছে যে, পরবশ্যতা সে কিছুতেই মানবেনা। দেশ প্রেম তার এতই শানিত এবং উচ্চকিত, আত্ম-মর্যাদাবোধ তার এতই প্রবল যে, কোন ভাবেই সে তা বিসর্জন দেবেনা, ব্যক্তি স্বার্থে তো নয়ই। এখানে আত্ম-মর্যাদাবোধ ও দেশ প্রেমকে এই কাহিনীর মর্মবাণী হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৩৮ বছর আগে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এর আগে ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে আমরা বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম বারের মতো পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করি এবং ২৪ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানী হিসেবে আমাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের পূর্ব পুরুষরা রক্ত দিয়ে পাকিস্তান অর্জন করেছিলেন তা অর্জিত না হওয়ায় এবং শাসক শ্রেণীর অবিমৃশ্যকারিতায় ঐ দেশটি টেকেনি। তার ধ্বংসস্তুপের উপর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার গত ৩৮ বছরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়ে এখনো প্রশ্ন উঠছে এবং পাশাপাশি এ দেশের নাগরিকদের দেশ প্রেম নিয়েও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে এবং এ প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতার হেফাজতের পন্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা, অর্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ, দেশপ্রেম উজ্জীবনে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা, দেশপ্রেমের অপব্যবহার, বিভিন্ন দেশে দেশপ্রেমের মাত্রা, ইসলামের দৃষ্টিতে দেশপ্রেমের মাপকাঠি, বাংলাদেশে দেশপ্রেমের অবস্থা এবং স্বাধীনতা সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দেশপ্রেমের সংজ্ঞা, অর্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ

দেশপ্রেমের ইংরেজী প্রতিশব্দ Patriotism. গ্রীক Patria শব্দ থেকে Patriotism শব্দের উৎপত্তি। Patria অর্থ হচ্ছে The land of one's fathers, কোনও ব্যক্তির পিতৃপুরুষদের জন্মভূমি। Patriotism বা দেশ প্রেমের বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। Weebies এর সংজ্ঞা অনুযায়ী দেশপ্রেম হচ্ছে, Love for or devotion to one's country. আবার Mike Wasdin নামক প্রখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে Patriotism বা দেশপ্রেম হচ্ছে "a feeling of love and devotion

www.pathagar.com

to one's own homeland." এখানে হোমল্যান্ড বলতে পিতৃভূমিকে বুঝানো হয়েছে। দেশপ্রেমের প্রজ্ঞা নিয়ে খুব কম লোকই প্রশ্ন তোলেন। এটা থাকা উচিত কিনা, থাকলে এর ধরন প্রকৃতি কি হওয়া উচিত এ ধরনের প্রশ্ন সচরাচর দেখা যায় না।

বর্তমান দুনিয়ায় রাষ্ট্র হচ্ছে দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় সংগঠক। রাজনীতিবিদরা দেশাত্মবোধক বক্তৃতা বিবৃতি দিতে পছন্দ করেন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য সাধারণ নাগরিকদের পরামর্শ দেন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসেবে উপস্থাপন করেন। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমসমূহ সরকারী আমলাদের পরিচালনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় তোতা পাখির ন্যায় দেশ প্রেমের বুলি আওড়ায়, সরকারের বা সরকারী দলের নেতা-কর্মীদের দেশ প্রেমকে মানুষের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ দেশ প্রেমের এ ধরনের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন; শাসক দলের প্রচারধর্মী বক্তৃতা বিবৃতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ডকুমেন্টারী, গান বাজনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিদেশী কালচার ও কুরুচিপূর্ণ নাটক সিনেমার প্রচার আদৌ দেশ প্রেম অথবা তাদের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত কোন কোন বিষয়ে মতামত রাখার ব্যাপারে বাক ও লেখনীর স্বাধীনতাকে সীমিত বা খর্ব করার বাহানা হিসেবে দেশ প্রেমকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারী নীতি পলিসির সমালোচনা বা বিরোধিতাকে দেশ প্রেমের পরিপন্থী বা বিশ্বাস ঘাতকতা বলে গণ্য করা হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটেই সম্ভবতঃ স্যামুয়েল জনসন বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "Patriotism is the last refuge of a scoundrel" অর্থাৎ দেশপ্রেম হচ্ছে পাজি বদমাশদের সর্বশেষ আশ্রয়। তার এই উক্তির মমার্থ তাৎপর্যপূর্ণ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেশের প্রতি ভালবাসা বা আসক্তি থাকার প্রয়োজন আছে কিনা। কেউ কেউ মনে করেন যে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনও ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা অনিচ্ছা কাজ করেনা। কোনও দেশ বা এলাকায় জন্ম গ্রহণের বিষয়টি নিতান্তই আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার। ব্যক্তির নিজের প্রতি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা থাকার যৌক্তিকতা বোধগম্য। কিন্তু দেশের প্রতি অনুরূপ নিষ্ঠা ও ভালবাসা ব্যক্তিস্বার্থের কতটুকু অনুকূল তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। সমতল ভূমি ও পাহাড়িয়া অঞ্চল কিংবা উপকূলের বাসিন্দা ও সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারীদের দেশ প্রেমের মিটার এক রকম নয়। দেশ প্রেমে ঝুঁকি আছে। এই ঝুঁকি এবং স্বার্থের মিল না ঘটলে দেশ প্রেম ফলপ্রসূ হয় না। আবার জাতীয় পর্যায়ে স্বার্থের বিভিন্নতা এত বেশি যে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য ব্যক্তির স্বার্থের অনুকূল প্রমাণিত হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রে তাকে নিজের স্বার্থের চিন্তা না করে এমন নীতি ও পলিসির প্রতি সায় দিতে হয় যা তার পছন্দ নয়। উইবিজ এর ভাষায়, "Patriotism is just a cover for collective thinking. It promotes the idea that the nation is responsible for

www.pathagar.com

any good that happens to the individual and the individual owes his life to the nation. Patriotism tries to assign any benefit that an individual receives not to the individuals' acts of people, but because of the collective good of the nation. Patriotism demands that the individual subjugate his desires to the collective interest of the nations, even to sacrificing himself, family and friends. Patriotism advocates group responsibility over individual responsibility."

কেউ কেউ মনে করেন যে দেশকে ভালবাসার যৌক্তিক কারণ থাকুক বা না থাকুক, দেশ প্রেম অধিকাংশ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রবৃত্তি বা দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা তারা কিভাবে প্রকাশ করেন। দেশ প্রেম প্রকাশের বাহন কি এবং কিভাবে দেশ প্রেমিকরা প্রমাণ করেন যে অন্যদের তুলনায় তারা উত্তম এবং ভিন্ন দেশের নাগরিকদের চেয়ে তারা বেশি অধিকার ভোগ করেন। এই বিষয়টি নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে তেমনি দেশের মানুষ এবং বিদেশীদেরই বা তারা কোন দৃষ্টিতে দেখেন তাও গবেষণার বিষয়।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে অনেক সময় দেশ প্রেমকে (Patriotism) যুদ্ধরত জাতীয়তাবাদের একটা অংশ বলে মনে হয়। জর্জ আরওয়েলের ভাষায় Nationalism বা জাতীয়তাবাদ হচ্ছে Loyalty and devotion to a nation; especially: a sense of national consciousness exalting one nation above all others and placing primary emphasis on promotion of its culture and interests as opposed to those of other nations and supernational groups.

অপরাপর জাতিসমূহকে ছোট গণ্য করে নিজের পিতৃভূমির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মধ্যে কেউ কেউ দেশ প্রেমের অভিব্যক্তি দেখতে পায়। তাদের দৃষ্টিতে বিদেশীরা মনুষ্য পদ বাচ্য নয় অথবা তারা মানুষ হলেও অস্পৃশ্য বা ছোট জাতের। অতীতে দেশ প্রেমের এই বর্ণবাদী ধারণা বিশ্বে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ইহুদী ও নাৎসিরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দেশ প্রেমিকের মধ্যেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত নিজ দেশের প্রতি আসক্তি বা ভালবাসা এবং ভিন দেশের প্রতি ঘৃণা অথবা নিজ দেশের যারা সরকারী দলের লুটপাট কিংবা বিতর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধিতা করে তাদের শত্রু গণ্য করার নাম দেশ প্রেম নয়। Edward Abbey'র মতে If patriotism has any value it would be as a friendly competition between equals who have the same rights where one hopes that all competetors do well but hopes that his side does the best. A patriot must always be ready to defend his country not only against foreign aggressors but also against his government.

www.pathagar.com

রাষ্ট্র ও দেশপ্রেম

কোন কোন দেশের দেশপ্রেমের লালন ও পরিপুষ্টির জন্য রাষ্টীয়ভাবে My country right or wrong এই ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহর লাল নেহেরু এই অঞ্চলে এই মতামতের উদ্ভাবক ছিলেন। নীতি ও নৈতিকতার দিক থেকে এই মতবাদটি সর্বজন গ্রাহ্য নয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ একে বিকারগ্রস্ততা বলে অভিহিত করেন। Senator Carl Schulz এই শূণ্যগর্ভ মতবাদের বিপরীতে দেশপ্রেমের আরেকটি ধারণা পেশ করেছেন। তার ধারণাটি হচ্ছে My country right or wrong, if right, to be kept right, if wrong to be set right.

ন্যায়-অন্যায় যা করি আমরাই সঠিক, আমাদের যারা বিরোধিতা করে তারা দেশের শত্রু, আমাদের শত্রু এই ধারণাটি সুস্থ মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এর ফলে ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে আসে, মানবতার অবমাননা হয়। জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে এই ধারণাটি যখন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপ্তি লাভ করে তখন মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক ঘোষিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার দেশগুলোর প্রতি You are either with us or against us ধরনের হুমকীমূলক আহ্বান এবং এর পরিণতিতে মার্কিন নেতৃত্বে মিত্র দেশগুলো কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাকের ন্যায় মুসলিম অধ্যুষিত দু'টি দেশে ধ্বংসযজ্ঞের অনুষ্ঠান অন্ধ দেশ প্রেমের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাধারণ মানুষকে দেশ প্রেমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, এর মধ্যে সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ, পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের এসেমব্লি, স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, প্রেসিডেন্ট এবং শাসনতান্ত্রিক পদধারী ব্যক্তিরা রাষ্ট্র, সংবিধান ও আইনের প্রতি অনুগত থাকার যে শপথ বাক্য পাঠ করেন তা দেশ প্রেম বহাল রাখারই একটা পদ্ধতি বা কৌশল।

রাষ্ট্রীয় ভূমিকার প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেম সম্পর্কে স্যামুয়েল জনসন অত্যন্ত তিক্ত মন্তব্য করেছেন, তার ভাষায়, "The merits of patriotism are dubious at best. As practiced the kindest description is that patriotism is a national Psychosis where those who suffer from it can no longer determine right from wrong, and advocate that the state commit barbaric atrocities in their name. As with all other mental derangements, those who suffer from its delusional effects should not be encouraged to continue or spread their disease but seek qualified help to overcome their impairment."

www.pathagar.com

স্যামুয়েল জনসনের হতাশার কারণ সুস্পষ্ট। কোন কোন রাষ্ট্র দেশপ্রেমকে অন্যায়-অবিচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। কোনও বিশেষ ইস্যু সম্পর্কিত সরকারের নীতি পলিসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমালোচনা বন্ধ করার জন্য দেশ প্রেমকে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যমান অবস্থায় অনেকেই মনে করেন যে দেশ প্রেম স্বাধীনতা ও অবাধে মতামত প্রকাশের শত্রু। তবে প্রকৃত দেশ প্রেম ও দেশ প্রেমিকরা এ ধরনের সমালোচনার উর্ধ্বে। একজন সত্যিকার দেশ প্রেমিক তার দেশের সরকার এবং নেতৃবৃন্দের কাজ কর্মের ব্যাপারে সর্বদা প্রশ্ন তুলবেন। স্বাধীনতা প্রিয় প্রত্যেকটি মানুষ অবহিত রয়েছেন যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারই হচেছ স্বাধীনতার বড় হুমকী; চলা ফেরা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা বিবেক ও বাক স্বাধীনতা তার হাতেই বেশি বিপন্ন হয়, বিদেশী রাষ্ট্রের কোনও নাগরিকদের হাতে নয়। আবার ক্ষমতায় থাকার জন্য কিংবা সংকীর্ণ দলীয় ও আর্থিক স্বার্থে এ ধরনের সরকারই বিদেশী শক্তির হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব তুলে দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

মোদ্দা কথা হচ্ছে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর, স্বার্থহীন যে কোনও কর্মকান্ড দেশ প্রেমের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেশের জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়া, সৈন্যদের রসদ ও অস্ত্র যোগানে সাহায্য করা এবং তাদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা চালানো প্রভৃতি হচ্ছে দেশ প্রেমের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক ।

দেশপ্রেমের রাজনৈতিক অপব্যবহার কিভাবে বিপদ ডেকে আনে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এডলফ হিটলার। ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে তিনি ক্ষমতা দখল করেন এবং ডিক্টেটারে পরিণত হন। তার দেশপ্রেমের অন্ধত্ব, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ এবং সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদী ধ্যান ধারণা ও অহংবোধ, প্রতিবেশী দেশসমূহের উপর আক্রমণ ও জবর দখল সারা দুনিয়াকে যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ঠেলে দেয়। নিজ দেশের ভূখন্ড সম্প্রসারণ আধিপত্য বিস্তার অথবা সম্পদ বা বাজার দখলের জন্য অন্য দেশের উপর হামলা দেশপ্রেম নয়। মাইক ওয়াজদিনের ভাষায়,

"Patriotism embodies two things: selflessness, which virtually everyone admires, plus a belief that we owe a greater allegiance to our fellow citizens than to ourselves, or a foreign countrymen", অর্থাৎ দু'টি উপাদান নিয়ে দেশপ্রেম গঠিত। একটি হচ্ছে, নিঃস্বার্থপরতা যা কার্যত সকলেই ভালবাসেন। আরেকটি হচ্ছে এই বিশ্বাস বা ধারণা যে আমাদের নিজের বা বিদেশীদের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষের প্রতি অধিকতর আনুগত্য এবং দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। বিদেশীদের তুলনায় দেশের মানুষ অধিকতর প্রিয় ও কাছের কিনা বাস্তব জীবনে প্রায়শঃই এই প্রশ্নটির মুখোমুখী হতে হয়। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক দেশের অভিবাসন আইন অনুযায়ী নিছক জন্ম সূত্রেই কোনও ব্যক্তি একটি দেশের নাগরিক হতে পারেন এবং সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা

www.pathagar.com

পাবার যোগ্য বিবেচিত হন। কিন্তু বিদেশীরা তা পান না। অবশ্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং দেশের মানুষের প্রতি আনুগত্য ও দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যবধান নিয়ে সর্বত্র বিতর্ক রয়েছে। এর অবসানের চেষ্টাও চলছে।

সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে জন্ম না হলেও কোনও ব্যক্তি সে দেশের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমিক হতে পারেন না অথবা সে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন না তা নয়। ভিন দেশে জন্ম গ্রহণ করেও অন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় লড়াই করেছেন অথবা প্রাণ দিয়েছেন ইতিহাসে এর অনেক নজির রয়েছে। Marquis de Lafayette নামক একজন ফরাসী বীর আমেরিকার ১৩টি বৃটিশ কলোনীর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। দেশাত্মবোধক কাজকে দু'ভাগে দেখা যায়, বিস্তৃত অর্থে এ হচ্ছে এমন একটি কাজ যার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থ নেই এবং যা থেকে রাষ্ট্র উপকৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে বিশেষভাবে দেশপ্রেমের অনুভূতি থেকে উৎসারিত নিঃস্বার্থ যে কোন কাজই হচ্ছে দেশাত্মবোধক কাজ।

দেশপ্রেমের অনুভূতি সম্পর্কে দার্শনিক Alasdair MacIntyre 'Is Patriotism a Virtue' শীর্ষক গবেষণা পত্রে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার ভাষায় "One explanation that has been proposed is that such feelings result in the long run, from kin selection. Our ancestors certainly lived in small groups of genetically related individuals. Feelings of intense loyalty to one's own group might have led individuals to take actions that were poorly justified on grounds of self interest but helped the group as a whole. Since genes tend to have been shared by the entire group, and cooperation likely was critical to group survival, a propensity to experience feelings of loyalty to the group was probably favoured by natural selection." Alasdair-এর এই ব্যাখ্যাটিতে ডারউইনের থিওরীর উপাদান পাওয়া যায়। এখানে রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক দেশপ্রেমের মানদণ্ড। এর বাইরে আদর্শের সম্পর্ক যে দেশপ্রেমের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক তা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।

দেশপ্রেমের পরিমাপ

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে দেশপ্রেম পরিমাপের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনার নজির রয়েছে। সরকারের নীতি পলিসির সংস্কার বা পুনর্গঠন ছিল এই সমীক্ষাসমূহের মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর The Correlates of War Project নামক ইউরোপীয় দেশসমূহের একটি প্রকল্পের তরফ থেকে এ ধরনের একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই সমীক্ষা যুদ্ধের তীব্রতার সাথে দেশপ্রেমের একটা সম্পর্ক চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

আবার এও দেখা গেছে যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন হয়। এক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগে জার্মানদের দেশপ্রেম ছিল তুঙ্গে কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী তাদের অবস্থা এখন সর্ব নিম্নে এসে পৌঁছেছে। World Value Survey এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দেশপ্রেমের স্কোর বা মাত্রা সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। "আপিন কি আপনার দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে গর্বিত" এই প্রশ্নের উত্তরকে ভিত্তি করে এই রিপোর্টটি তৈরী করা হয়েছে এবং এর স্কোর সর্ব নিম্ন ১ (গর্বিত নই) থেকে সর্বোচ্চ ৪ (অত্যন্ত গর্বিত) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমীক্ষায় প্রাপ্ত গড় দেশওয়ারী ফলাফল নিম্নরূপঃ

দেশের নাম	১৯৯০-১৯৯২ সালের সমীক্ষার স্কোর	দেশের নাম	১৯৯৫-১৯৯৭ সালের সমীক্ষার স্কোর
আয়ারল্যান্ড	৩.৭৪	ভেনেজুয়েলা	৩.৯২
যুক্তরাষ্ট্র	৩.৭৩	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.৭৩
ভারত	৩.৬৭	ভারত	৩.৭২
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.৫৫	যুক্তরাষ্ট্র	৩.৭০
কানাডা	৩.৫৩	পেরু	৩.৬৮
স্লোভেনিয়া	৩.৪৬	স্লোভেনিয়া	৩.৬৪
স্পেন	৩.২৮	পোল্যান্ড	৩.৫৫
ডেনমার্ক	৩.২৭	অস্ট্রেলিয়া	৩.৫৪
ইতালি	৩.২৫	স্পেন	৩.৪০
সুইডেন	৩.২২	চিলি	৩.৩৮
ফ্রান্স	৩.১৮	আর্জেন্টিনা	৩.২৯
ফিনল্যান্ড	৩.১৭	সুইডেন	৩.১৩
		মলডোভা	২.৯৮
বেলজিয়াম	৩.০৭	জাপান	২.৮৫
নেদারল্যান্ড	২.৯৩	রাশিয়া	২.৬৯
জার্মানী	২.৭৫	সুইজারল্যান্ড	২.৫৯
গড়	৩.২৬	লিথুয়ানিয়া	২.৪৭
		লাটভিয়া	২.১০
		জার্মানী	১.৩৭
		গড়	৩.১২

www.pathagar.com

উপরোক্ত রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে কোনও পরিসংখ্যান নেই। এ প্রেক্ষিতে এদেশের মানুষের দেশপ্রেমের স্কোর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা কঠিন। তবে যেহেতু সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অগণিত মানুষের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের বিনিময়ে এই দেশটি অর্জিত হয়েছে সেহেতু স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে, আমাদের দেশপ্রেমে খাদ বা ঘাটতি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথম ওপি ওয়ানের মাধ্যমে অভিবাসন কর্মসূচী শুরু করেছিল তখন বাংলাদেশ থেকে এক কোটি যুবক সে দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিল। এই অবস্থা দেখে কেউ কেউ তাদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমি তাদের এই আচরণকে দেশপ্রেম বর্জিত কোনও পদক্ষেপ বলে মনে করি না বরং জীবিকা অর্জনের উৎস সন্ধানের প্রয়াস হিসেবে দেখি। অভিবাসন পেলেও তারা জন্মভূমির খেদমত করতে পারেন। এতে কোনও বাধা থাকার কথা নয়।

দেশপ্রেমের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত ইনসাফ ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা, উলুল আমর এর আনুগত্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, জনগণের সংশোধন এবং আমর বিল মা'রুফ ও নেহি আনিল মুনকারের নীতিমালার প্রয়োগ, ইসলামী আইন ও দন্ডের বিধান কার্যকরকরণ এবং জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ প্রভৃতি হচ্ছে ঈমানদার প্রত্যেকটি মানুষের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি ভূখন্ডের প্রয়োজন। এটি পিতৃভূমি, মাতৃভূমি অথবা Place of domicile হতে পারে। এই ভূখন্ডের প্রতি ভালবাসা, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার সামরিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা প্রত্যেকটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে দেশ প্রেম। এই দেশ প্রেমের ভিত্তি আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপরের প্রতি মহব্বত (হুব্বুন ফীল্লাহ), আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শরিয়া নির্ধারিত পন্থায় অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ (বুগদুন ফীল্লাহ), রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহব্বত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শ্রেষ্ঠ জানা এবং উসওয়ায়ে হাসানা বলে মানা, ইখলাস বা আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা, সবর এবং আল্লাহভীরুতা। এখানে অন্ধ প্রেমের কোনও সুযোগ নেই।

এ ব্যাপারে সূরা আল আনয়ামের ১৬২ নং আয়াত প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে, "বলোঃ আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, তার কোনও শরীক নেই।"

সূরা আল-বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসে। এই ভালবাসা এত প্রবল ও সুদৃঢ় যে অন্য কোনও ভালবাসা অথবা ভীতি তাদেরকে এক বিন্দুও টলাতে পারেনা।"

কুরআন মাজীদে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সূরা আল মুজাদিলার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তুমি (মুহাম্মাদ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের এমন কখনও দেখতে

www.pathagar.com

পাবেনা যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতাকারীদের প্রতি তারা ভালবাসা পোষণ করে। যদিও (ঐ সব বিরোধিতাকারীরা) তাদের পিতা-মাতা হোক, সন্তানাদি হোক, ভাই বেরাদার হোক কিংবা বংশ পরিবারের লোক হোক। এরা সেই সমস্ত লোক যাদের অন্ত রে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটা রুহ দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। .... এরাই হচ্ছে আল্লাহর দলের লোক।" সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা অপর মুমিন ছাড়া কাফিরদের কখনো পৃষ্ঠপোষক বানায় না।"

সূরা আল হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।"

সূরা আত্ তাওবার ৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুমিন নারী ও পুরুষের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পরস্পরের বন্ধু, সাহায্যকারী। তারা একে অপরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করে....... ।"

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী দেশপ্রেম কুরআন সুন্নাহর আদর্শকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ভূখন্ডের পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে না। আল্লামা ইকবাল তার কবিতায় এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন, "চীন ওয়া আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা, মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতন, সারা জাঁহা হামারা।" অবশ্য আধুনিককালে পরিচয়ের জন্য আদর্শ ভিত্তিক জাতীয়তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে এদেশের মুসলিমরা গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে তাদের দেশপ্রেম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে দেশপ্রেম ঃ একটি পর্যালোচনা

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি জনপদ হিসেবে বাংলাদেশ ভূখন্ডটি যুগযুগ ধরে সুপরিচিত হলেও মীর জাফরের ন্যায় বিশ্বাস ঘাতকের সংখ্যাও এই অঞ্চলে কখনো কম ছিলনা। ব্যক্তি স্বার্থে গোষ্ঠী ও জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার নজির এখানে প্রচুর রয়েছে। দেশপ্রেম এখানে জোয়ার ভাটার ন্যায় কখনো ভরা কাটাল কখনো মরা কাটালের রূপ ধারণ করেছে। মীর জাফর, জগৎশেঠ, উমি চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার কাছে দেশপ্রেম পরাভূত হবার পর এই ভূখন্ডটি বৃটিশ বেনিয়া শক্তির কবলেই শুধু যায়নি বরং তাদের ভারত বর্ষ দখলের গেটওয়ে হিসেবেও কাজ করেছে। ফলে প্রায় পৌনে দু'শ বছর ধরে আমরা বৃটেনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামী করতে বাধ্য হই। দেশী বিশ্বাস ঘাতক ও বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির শোষণ নির্যাতনের ধকল সামলিয়ে এদেশের দেশ প্রেমিক শক্তির মেরুদণ্ড খাড়া করে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনে প্রায় ১০০ বছর সময় লাগে এবং ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের

www.pathagar.com

মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি ঘটে। কিন্তু আবারও শিখ এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর বিশ্বাস ঘাতকতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রযাত্রা রূদ্ধ হয়ে যায়। মঞ্জিলে পৌছাতে আরো ৯০ বছর সময় লাগে। এ পথেও বাধা আসে। এই বাধা ডিঙ্গিয়ে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমি হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করি। বাংলাদেশ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত হয় এবং ১৯৭১ সালে নয় মাস ব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর এই সময়টা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের জন্য মহা সংকটকাল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রদেশব্যাপী যে অসহযোগ, হরতাল, অবরোধ, অগ্নি সংযোগ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং অবাঙ্গালী জনপদের উপর যে অত্যাচার-অবিচার শুরু হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আর্মীর নির্মম ক্র্যাকডাউন সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছিল অমানিশার অন্ধকার। তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের কোনও নিরাপত্তা ছিলনা। যখন তখন গ্রেফতার, পাশবিক ও দৈহিক অত্যাচার এবং নির্যাতন পরিণত হয়েছিল নিত্যদিনের ভাগ্য লিপি। এই সময়টি ছিল দেশ প্রেমিকদের পরীক্ষা দেয়ার প্রকৃষ্ট সময়। সীমান্তপারে ভারত ভূখন্ডে আশ্রয় প্রার্থী ৭৫.৫৬ লক্ষ শরণার্থী ব্যতীত বাকী ৭ কোটি বাঙ্গালী ছিল কার্যতঃ সশস্ত্র হিংস্র পাক বাহিনীর হাতে বন্দী। এরা পাক বাহিনীর জুলুম সহ্য করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আহার, আশ্রয় এবং অন্যান্য সহযোগিতা দিয়েছে। তারা আত্মত্যাগ করেছে, স্বজন হারিয়েছে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। ভারতপন্থী দলগুলো ছাড়া অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীরা তাদের সাহস জুগিয়েছে; পাক বাহিনীর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতপন্থী দলগুলোর নেতা-নেত্রীরা দেশবাসীকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাথে সে দেশে প্রাণ ভয়ে শরণার্থী হয়েছিল ৭৫.৫৬ লক্ষ লোক, সাম্প্রদায়িক বিভাজন অনুযায়ী যাদের মধ্যে ছিল ৬৯.৭১ লক্ষ হিন্দু, ৫.৪১ লক্ষ মুসলিম এবং ০.৪৪ লক্ষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক। প্রবীণ রাজনীতিবিদ জাতীয় লীগ প্রধান অলি আহাদের ভাষায়,

"ভাগ্যের কি পরিহাস, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশের মৃত্যুঞ্জয়ী সাত কোটি মানুষ মুহূর্তের মধ্যে ভারতের আশ্রয় প্রার্থী শরণার্থীদের দৃষ্টিতে পাক বাহিনীর সহযোগী রূপে অভিযুক্ত হয় এবং এক পলকে পরিণত হয় এক অচ্ছ্যুত শ্রেণীতে। আরো পরিতাপের বিষয় ১৬ ডিসেম্বরের পরে অনুষ্ঠিত অত্যাচার, অবিচার, লুটপাট, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ-নির্যাতন ১৬ ডিসেম্বরের আগেকার মতই সমভাবে শহর নগর গ্রামের বাঙ্গালী জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। ভারত প্রত্যাগত মুষ্টিমেয় শরণার্থী ছিল এর জন্য দায়ী।" দেশ প্রেমের দলীয়করণ এ ক্ষেত্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলকে ভারসাম্যহীন করে তোলে এবং তারা সারা জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুটি শক্তিতে বিভক্ত করে নেয়। আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরোধিতা

www.pathagar.com

এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারকেও রাজাকারে পরিণত করে। দেশপ্রেম একটি বিশেষ দলের পৈত্রিক সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কাগজে কলমে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পেলেও কার্যত তা ভারতের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের মাটি থেকে ঢাকায় পদার্পন করেন ২০ শে ডিসেম্বর। বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীসহ তাদের কেউই পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। ভারতের আশ্রয় থেকে স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সরকার ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী এক আদেশ বলে বাংলাদেশের মুদ্রামান ৬৬ শতাংশ হ্রাস করেন। পাশাপাশি একই তারিখ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ঘোষণা করা হয় এবং দেশীয় পাটকলের স্বার্থে এতদিন পর্যন্ত ভারতের কাছে পাট বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশ এবং ভারত পাট, চা, চামড়া বিক্রির ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী ছিল। সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের পাট, চা ও চামড়া শিল্পে অন্ধকার নেমে আসে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল কাঁচা পাট ও পাট জাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল। পাটের বাজার উন্মুক্ত করে দেয়ায় এবং পাশাপাশি সীমান্ত খুলে দেয়ায় বৈধ ও অবৈধ উভয় পথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাট পাচার ও রফতানী মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ভারতের যে সমস্ত পাট কল ২০/২২ বছর ধরে বন্ধ ছিল কিংবা ক্যাপাসিটির এক চতুর্থাংশও উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছিল না সে পাট কলগুলো এতে পুনরায় পূর্ণ ক্যাপাসিটিতে চালু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শ্রমিক অসন্তোষ, কাঁচা মালের অভাব, গুদামে আগুন প্রভৃতি কারনে আমাদের পাট কলগুলো একের পর এক বন্ধ হতে থাকে এবং এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে ভারতের সাথে প্রতিযোগিতার সামর্থ ও যোগ্যতা উভয়টাই আমরা হারিয়ে ফেলি। আমাদের রফতানী আরও সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পায়। ফলে খাদ্য-সামগ্রী, শিল্পের কাঁচামাল এবং জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র আমদানীও কঠিন হয়ে যায়। ভারতীয় সিকিউরিটি প্রেস থেকে মুদ্রিত বাংলাদেশী নোটের সংখ্যা সরকার ঘোষিত সংখ্যা থেকে অনেক বেশি বলে প্রমাণিত হয় এবং এ প্রেক্ষিতে সরকার এই নোট অচল ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে এই সিদ্ধান্তের একটা অভিনব ও বিস্ময়কর দিক ছিল এই যে, সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরও ভারতে মুদ্রিত নোট বদলানোর সুযোগ দু'মাস পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সাধারণ মানুষের চোখেও ধরা পড়ে। বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রকট মুদ্রাস্ফীতির শিকারে পরিণত হয়। বাজারে এর অভিব্যক্তি ঘটে বিস্ময়করভাবে। কেনা কাটায় ভারতীয় মুদ্রার অবাধ প্রচলন শুরু হয়। ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং ভারতের সাধারণ নাগরিকরা বাংলাদেশের বাজার থেকে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রীত বিদেশী পণ্য সামগ্রীসহ কয়েক শ' কোটি টাকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে ভারতে নিয়ে যায়। এছাড়াও ভারতের

www.pathagar.com

মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কলকারখানা থেকে শত শত কোটি টাকার মেশিন পত্র ও যন্ত্রপাতির খুচরা অংশ, কাঁচামাল প্রভৃতি পাচার করে নিয়ে যায়। দুনিয়ার ইতিহাসে বহু রাষ্ট্র বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য-সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জন করেছে; কিন্তু কোনও রাষ্ট্র কর্তৃক তার কাগজী নোটের বিনিময়ে অর্থাৎ বিনামূল্যে সংঘবদ্ধ প্রতারণার মাধ্যমে লুটপাট করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রকে এইভাবে নিঃস্ব করার নির্দয় নজির আর কোথাও নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারে যারা ছিলেন তারা এ দেশের মাটির সন্তানই ছিলেন, কিন্তু তারা এদেশে বেআইনীভাবে ভারতীয় কাগজী মুদ্রা প্রচলনে বাধা দেন নাই। দেশ বিক্রিতে তাদের বাধেনি। ৯৩০০০ যুদ্ধ বন্দী বাংলাদেশ থেকে সোনা দানা সহ যে দামী দ্রব্য-সামগ্রী লুট করে আত্মসাৎ করেছিল ভারতীয় সেনা বাহিনী তাদের কাছ থেকে সেগুলোও ছিনিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে এবং তাদের পরিবার পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানী সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্র-সস্ত্রও ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশকে দেয়নি, ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় দৈনিক অমৃত বাজারে ১৯৭৪ সালের ১২ মে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত সরকার পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র-সস্ত্রের মধ্য থেকে দুই থেকে আড়াই শ' রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্র-সস্ত্র ভারতে স্থানান্তরিত করেছে এবং এতে বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি ছিল। এ ছাড়াও মহা চীন কর্তৃক নির্মিত জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী থেকে ভারতীয় সৈন্যরা শত শত কোটি টাকার অস্ত্র, নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ভারতে নিয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত চিনি কল, বস্ত্র কল ও পাট কলের যন্ত্রপাতি পাচার তো ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। যারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তৎকালীন সরকারের দৃষ্টিতে তারা হয়ে পড়েছিলেন দেশের শত্রু। এই প্রতিবাদের কারণে মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম সেক্টার কমান্ডার মেজর জলিলকে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারতে অবস্থানকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার বিনিময়ে ভারত সরকারের সাথে সাতটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তিগুলোর বিষয় বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

১) ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে। গুরুত্বের দিক থেকে এবং অস্ত্র-শস্ত্র এবং সংখ্যায় এই বাহিনী মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হবে (যেমন, রক্ষী বাহিনী)।

২) ভারত থেকে সমরোপকরণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতে হবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শের ভিত্তিতে তা করতে হবে।

৩) ভারতীয় পরামর্শেই বাংলাদেশের বহিঃবাণিজ্য কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে।

৪) ভারতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৫) বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির অনুরূপ হবে।

২—

www.pathagar.com

৬) ভারতের সম্মতি ছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত কোনও চুক্তি বাতিল করা যাবে না।

৭) ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোনও সময় যে কোন সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে বাধাদানকারী শক্তিকে চুরমার করে দেয়ার অধিকার তার থাকবে।

উপরোক্ত চুক্তিগুলো প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সাতটি চুক্তি ঈষৎ পরিমার্জিত রূপে ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকার বুকে বঙ্গভবনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান স্বাক্ষরিত ২৫ সালা 'বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তি' চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেশের সকল রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করেছিল। তৎকালীন সরকার দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ও জাতিদ্রোহী অবস্থান থেকে এক চুলও নড়তে রাজী ছিলনা এবং চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে পার্লামেন্টের বা বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণেরও প্রয়োজন বোধ করেনি।

ভারতকে মরণ বাঁধ ফারাক্কা চালুর অনুমতি প্রদান ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের ঘৃণ্যতম কাজগুলোর অন্যতম। এই বাঁধ চালু করার ফলে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবার ঝুঁকিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে পদ্মা ও তার অববাহিকা অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যায়, গাছ-পালার পুষ্টি উপাদানে সংকট দেখা দেয় এবং আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব বিপদ সীমা অতিক্রম করে। লোনা পানির প্রাদুর্ভাবও বেড়ে যায় এবং এর ফলে উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট মিল খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল সহ বাংলাদেশের হাজার হাজার শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে যায়। শীত মওসুমে পদ্মার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও গোদাগাড়ি পয়েন্টে এখন লঞ্চ, ষ্টীমারের পরিবর্তে গরুর গাড়ী চলে। নদী এখন চর। এছাড়াও ১৯৭৪ সালের ১৬ মে মুজিব ইন্দিরার মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু তার পরিবর্তে তিন বিঘা করিডোরসহ বাংলাদেশের পাওনা ছিট মহলগুলোতে অদ্যাবধি আমাদের দখল ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিজ ভূখন্ড বিদেশের হাতে তুলে দেয়া, স্বাধীন একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার বিসর্জন ও তার আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দান দেশ প্রেমের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা তা অবশ্য পরীক্ষা সাপেক্ষ ব্যাপার।

সন্দেহ নেই আওয়ামী লীগ দেশ প্রেমের দাবীদার একটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ছিনতাই, লুণ্ঠন, পাচার, হত্যা, গুম ও ব্যভিচার দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সরকারের ব্যর্থ প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পলিসি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির যোগানদার অর্থনীতিতে পরিণত করে। পণ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রেতা সাধারণের নাগালে বাইরে চলে যায়। ক্ষেত, খামার ও কলকারখানায় উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়, কলকারখানা ও

www.pathagar.com

কাঁচা পাটের গুদামে শুরু হয় অগ্নিসংযোগ ও স্যাবোটেজ। সর্বত্র দেখা দেয় খাদ্য সামগ্রী ও পণ্য দ্রব্যের তীব্র অভাব। ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে দুর্ভিক্ষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে লক্ষ লক্ষ লোক। বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্দ করার লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন, জন নিরাপত্তা আইন প্রভৃতি প্রণয়ন ও নির্বিচার প্রয়োগ পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার উচ্চ মার্গে পৌছে। কিন্তু তাতেও এই দলের ক্ষমতা লিপ্সা শেষ হয়নি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী সংযোজনের মাধ্যমে সারা দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাকশাল নামক একটি মাত্র দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। দু'টি সরকার দলীয় ও দু'টি সরকারী মালিকানাধীন পত্রিকা ছাড়া আর সকল দৈনিক পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রবীণ রাজনীতিক অলি আহাদের ভাষায়, “ক্ষমতার লোভ, এক শ্রেণীর মেরুদন্ডহীন নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী, নীতিহীন বুদ্ধিজীবি ও চরিত্রহীন টেন্ডলের যোগসাজশে বাংলার সর্বত্র নগরে, বন্দরে, কলকারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, ক্ষেতে খামারে দিল্লীর দাসেরা আওয়াজ তুলতে থাকে, এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।”

এখানে স্মরণ করা দরকার যে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক বিপ্লবের পূর্বে নোয়াখালীর রামগতির তোরাবগঞ্জে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছিল। এতে এর আরোহী দু'জন সিনিয়র ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছিল। পরদিন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারযোগে এই দুই ভারতীয় কর্মকর্তার মৃতদেহ কোলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশের আকাশ সীমা লংঘন করে প্রতিবেশী দেশের একটি সামরিক হেলিকপ্টারের এত অভ্যন্তরে এসে বিধ্বস্ত হবার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত রহস্যজনক। ভারতীয় দৈনিক আনন্দবাজার ও আজকাল বার বার সে দেশের সরকারের কাছে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়েও কোনও উত্তর পায়নি। বাংলাদেশের তরফ থেকেও এ ঘটনার উপর কোনও মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে কূটনৈতিক বাধা, সরকারী নিষেধাজ্ঞা এবং গোয়েন্দা বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে যে গোপন তথ্যটি পরবর্তী কালে বেরিয়ে এসেছিল তাতে দেখা যায় যে, ঐ হেলিকপ্টারের আরোহীরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক দলিল বহন করছিলেন। এই দলিল অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে আগরতলা ভিত্তিক ভারতীয় বাহিনীর কম্যান্ডে ন্যস্ত করার প্রস্তাব ছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন সেনা প্রধান এই দলিলে স্বাক্ষর করার পর হেলিকপ্টার আরোহীরা আগরতলা কম্যান্ড এর কাছ থেকে প্রতিস্বাক্ষর করে কোলকাতা ফিরছিলেন বলে জানা যায়। ইতোমধ্যে ঢাকা সেনানিবাস ও বিমানবাহিনী হেড কোয়ার্টারের দেশ প্রেমিক কর্মকর্তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন এবং দেশ এবং সেনাবাহিনীকে রক্ষার জন্য হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত করে সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৫ আগষ্টের পট পরিবর্তন ঘটে। এতে দেশ ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে যেমন মুক্ত হয়েছিল তেমনি গণতন্ত্রও ফেরত পেয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা যে লুটপাটের রাজত্ব

www.pathagar.com

কায়েম করেছিল তারও অবসান ঘটেছিল। তখনকার দিনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মাহবুবুল আলম চাষী যথার্থই বলেছেন, "Many of the freedom fighters, who were once eager to sacrifice their lives for the cause of their motherland, were now trying to devour the entire nation. Excesses committed by them made normal work nearly impossible. Situation became so unmanageable that once a leader of a foreign delegation asked me whether the country was really liberated or it was conquered. I wanted to know why she asked this question. She told in reply that in a liberated country every body felt safe and happy, while in a conquered country, people were afraid and conquerers looted and plundered the conquered land. In her opinion the general condition in Bangladesh was closer to the latter."

অর্থাৎ 'মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই যারা এক সময় মাতৃভূমির জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল তারা এখন গোটা জাতিকে গিলে খাবার জন্য উদ্যত হয়ে পড়তে দেখা গেল, তাদের বাড়াবাড়ির ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়লো, পরিস্থিতির এতই অবনতি ঘটলো যে, একবার বিদেশী এক প্রতিনিধি দলের নেতা আমাকে প্রশ্ন করেই বসলেন যে, এই দেশটি আসলে কি স্বাধীন করা হয়েছে না জয় করা হয়েছে। আমি তার এই প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলাম, তিনি বললেন যে, স্বাধীন একটি দেশে প্রত্যেকটি লোক নিরাপদ থাকে এবং নিজেকে সুখীও পরিতৃপ্ত বোধ করে। পক্ষান্তরে বিজিত একটি দেশের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকে এবং বিজেতারা বিজিত দেশে লুটপাট চালায়। তার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অবস্থা শেষোক্ত দেশের অবস্থার খুবই কাছাকাছি।' জনাব চাষীর এই উদ্বৃতি থেকে বিদেশীদের কাছে তৎকালীন বাংলাদেশের ইমেজ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ১৯৭৫ সালের ১৮ জানুয়ারী বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর বিএসএফ এর গোলক মজুমদার কর্তৃক ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব শ্রী রুস্তমজীকে লেখা এক গোপনীয় পত্রেও অনুরূপ একটি চিত্র পাওয়া যায়। এতে তিনি বলেছেন, "Conditions continue to be difficult in Bangladesh. Salt sells at Tk. 100.00 per seer while the cost of mustard oil is Tk. 250.00 per seer. The general public has become disgusted with corruption amongst high officials and politicians. Some sections have started openly questioning the competence of Sheikh Mujibur Rahman to administer the country. The opposition forces are trying hard to put up a strong front against the Awami League and armed clashes are not at all uncommon, specially in the country side.

www.pathagar.com

Quite a few police and army posts have been attacked and daring decoity have taken place in Dacca in broad day light. Students are becoming restive. There is a tendency to blame India for all ills of Bangladesh and in the process communal feelings are developing quite fast. Hindus are becoming more and more frustrated and there is a growing feeling amongst them that they are not wanted in Bangladesh ." রুস্তমজীকে লেখা গোলক মজুমদারের এটিই একমাত্র পত্র নয়, আরো অসংখ্য পত্রে তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের অবস্থা তুলে ধরেছিলেন যা কোন ক্রমেই সুখকর ছিলনা।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লংঘন, গণতন্ত্র হত্যা ও অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে জানমাল কুরবানী করেছে। তাদের রক্তের সাথে যারা বিশ্বাস ঘাতকতা করে দেশ শাসন করেছেন, লুটপাট, অত্যাচার নিপীড়ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংসে পাকিস্তানীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন তাদের দেশ প্রেমের স্কোর অবশ্য নির্ণিত হয়নি।

স্বাধীনতার হিফাজত ঃ কিছু করণীয়

১) স্বাধীনতা অর্জনের তুলনায় স্বাধীনতার হেফাজত বা সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন একটি কাজ। এজন্য প্রয়োজন জাতির ইস্পাত কঠিন ঐক্য। সংকীর্ণ স্বার্থ, রাজনৈতিক ঈর্ষা-বিদ্বেষ, ক্ষমতার লোভ ও বিদেশী শক্তির আনুগত্য এবং দালালী এই ঐক্যের পথে বড় অন্তরায়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্ধীদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা ঐক্য বিনষ্ট করে। জাতীয় ঐক্য ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। ফিলিপাইনের জাতীয় বীর ডঃ রিজালের ভাষায় Why liberty if the slaves of today become the tyrants of tomorrow? রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, অত্যাচার, নির্যাতন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ক্ষমতাসীন দলের সীমাহীন দলীয়করণ, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার জাতি প্রেম দেশাত্মবাবোধক কাজ নয়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি দেখা দেয়, পারস্পরিক আস্থাহীনতার জন্ম হয় এবং শত্রুরা উৎসাহিত হয়। দেশ রক্ষা এবং স্বাধীনতা হেফাজতের জন্য এই প্রবণতা রোধ করা অপরিহার্য।

২) ১৭৫৭ সালে মীর জাফর, জগৎশেঠ, উমি চাঁদের ন্যায় জনবিচ্ছিন্ন বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে বিদেশীদের কাছে দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিক্রির ফলে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে পরাধীনতার অমানিশা নেমে আসে। এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পৌনে দু'শ বছরের সংগ্রাম প্রয়োজন হয়েছিল। এই সংগ্রামে কোটি

www.pathagar.com

কোটি মানুষকে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যারা বিশ্বাসঘাতক ও দালাল ছিল সংখ্যায় তারা ছিল হাতে গোনার মত। কিন্তু তাদের সংকীর্ণ স্বার্থের বলি যারা হয়েছিল তারা ছিল সংখ্যায় কোটি কোটি এবং বংশ পরম্পরায় প্রায় দু'শ বছর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মীর জাফররা মরে না, তারা Recycled হয়। তাদের ক্ষমতা লিপ্সা এবং ষড়যন্ত্রও অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য এদের মুখোশ উন্মোচনের শক্তিশালী ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা নিরাপদ থাকতে পারে না। জনসচেতনতা ও জনগনের সতর্কতাই এর নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৩) রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বের পেছনে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আদর্শিক স্বকীয়তাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই উপমহাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম এই দু'টি জনগোষ্ঠি দু'টি স্বতন্ত্র সত্তা এবং আলাদা জাতি। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল এবং ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতেই গণভোটের মাধ্যমে বৃহত্তর সিলেট আসাম থেকে এবং পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়েছিল। জনগণের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস তথা ইসলামী আদর্শই ছিল এক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন, প্রসাদ রাজনীতির ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, অবিচার এবং অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা ১৯৭১ সালে এই দেশের মানুষকে সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পতাকার এই পরিবর্তন এবং নতুন এই দেশের সৃষ্টি দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করেনি বরং লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মূল ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা আদর্শিক স্বাতন্ত্রের বিষয়টি মুখ্য না থাকলে ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আদলে গঠিত আদর্শের ধারক বাহক হিসেবে তার থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের টিকে থাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই। একটি মহল ইসলামকে গৌণ বিষয়ে পরিণত করে এ দেশে ভারতীয় আদর্শ চাপিয়ে দিতে চায়। সংবিধান থেকে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল, রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস সম্পর্কিত ধারার অবলোপনের চেষ্টা এরই একটি অংশ। এই প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়া যায়না। এ ব্যাপারে দেশের মানুষ যাতে অতন্ত্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করতে পারে তার জন্য দেশ প্রেমিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোকে জনমত গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

৪) অরক্ষিত স্বাধীনতা দেশকে পরাধীনতার দিকে ঠেলে দেয়। আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও বিকাশ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের এই যুগে যদি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ভিত্তিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তাহলে আদর্শকে বাচিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। দেশের মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজ যদি আদর্শ বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে দেশ টিকে থাকতে পারে না। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করতে হলে নিজস্ব সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত শক্তিশালী গণমাধ্যম বিশেষ করে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সৃষ্টি করতে হবে এবং সেগুলো পরিচালনার জন্য আদর্শনিষ্ঠ জনবল তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আহরণ এবং বুদ্ধি বৃত্তির কোনও বিকল্প নেই।

৫) দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যার সর্বশেষ কৌশল এবং যথাসম্ভব সর্বোন্নত যুদ্ধ উপকরণে তাদের সমৃদ্ধকরণ ও সেগুলো ব্যবহারে উন্নতর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর অপরাপর সংস্থাগুলোকে অবশ্যই দলীয় প্রভাব এবং সংকীর্ণ রাজনীতির উর্ধে রেখে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। সেনাবাহিনীর দলীয়করণ কিংবা তাদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি তাদের বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং এর ফলে বিদেশী হামলা মুকাবিলা করা এবং স্বাধীনতার হেফাজত তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দেশপ্রেমকে উজ্জীবিত করা এবং দেশাত্মবোধক কাজ কর্মকে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। এছাড়াও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, জাতীয় আদর্শ এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সুরক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুসমূহে রাজনৈতিক দলসমূহের ঐকমত্য অপরিহার্য। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। পাশাপাশি সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ক্ষমতায় যাওয়া বা কাউকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য বিশেষ কোনও বহিঃশক্তির আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকারের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিহার করাও জরুরী। এ ব্যাপারে দেশপ্রেমিক শক্তিকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শেষ করার আগে স্যার ওয়াল্টার স্কটের একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই, তিনি বলেছেন, "স্বদেশ প্রেমিকের ধর্ম বীরের ধর্ম, ভীরুর ধর্ম নয়। হয়ত গৃহ লক্ষ্মীর আহ্বান তোমাকে মুহূর্তের জন্য বিমনা করবে। হয়ত পুরানো স্মৃতির মায়া তোমাকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু জীবনের প্রতি পদে যারা ভয়ে ভয়ে ছোট ছোট বিধি নিষেধের গন্ডিতে নিজেদের বেঁধে রেখে গুটি গুটি এগিয়ে যায় তাদের মত তোমাকে অচেনা অজানায় অখ্যাতির বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে না। আগামী দিনের পৃথিবী তোমাকে জানাবে সত্যিকারের শ্রদ্ধার্ঘ, হে বিদ্রোহী বীর, এগিয়ে চল।"

www.pathagar.com

তথ্যপুঞ্জী

১) Alasdair MacIntyre: *Is Patriotism a Virtue,* State University of New York Press, 1995.
২) Charles Blattberg: *From Pluralist to Patriotic Politics,* Oxford Unversity Press, 2000.
৩) Craig Calhun: *Is it Time to be Post National,* Cambridge University Press, 2004.
৪) George Orwell: *Notes on Nationalism,* Secker and Warberg, 1953.
৫) Paul Gomberg: *Patriotism is Like Racism,* Humanity Books, 2002.
৬) Daniel Bar-Tal and Ervin Stand, *Partriotism,* Wadsworth Publishing 1999.
৭) Weebies: *Patriotism.*
৮) Mike Wasdin: *Blind Patriotism.*
৯) Emma Goldman: *What is Patriotism.*
১০) Samuel Johnson: *Patriotism,* Oxford University Press, 1948.
১১) Al-Quran.
১২) Oli Ahad: জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫।
১৩) Mahbubul Alam Chashi: *In Quest of Swanirvar,* Bangladesh Swanirvar Society.
১৩) Ministry of Foreign Affairs, Government of India, *Bangladesh Documents.*
১৩) S. K. Dasgupta *Midnight Massacre in Dacca.*
১৩) UPLB Press, *Works of Dr. Rizal.*

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল আমিন- বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ৯ জানুয়ারী, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

■

সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শন (Secular Political Thought)

সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনেরই আরেক নাম সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজম (Secularism) মানবতার জন্য এক অভিশাপ। এটি মানবতা বিধ্বংসী কালনাগিনী, যার বিষাক্ত বিষ প্রতিক্রিয়ায় বিদগ্ধ আজ সারা পৃথিবী। বেশ কিছুদিন আগের কথা। ইউরোপীয় গির্জা অধিপতিদের ধর্মের নামে অধর্মের প্রচলন, ধর্মের দোহাই দিয়ে যুলম-নির্যাতন, নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সমগ্র বিশ্ববাসী। ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য অস্বীকার করা হয়। চার্চের নির্দেশ অমান্য করে বিজ্ঞান চর্চা করার কারণে অনেক বিজ্ঞানী চরম যুলম নির্যাতনের শিকার হন। তাদের এ সকল অপকর্মের দুর্গন্ধ আবর্জনার উপরে জন্ম হয় মানবতার আজন্ম শত্রু Secularism-এর। মূলত ধর্মযাজকদের অবাঞ্ছিত যুলমের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ ও তাদের ধর্মের নামে অধার্মিক অনুশাসনের খড়গ হস্তকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে এ মতবাদের উদ্ভব হয়। এ মতবাদের রূপরেখা অনেকটা অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তির কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

www.pathagar.com

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা (Definition of Secularism) : সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেক্যুলারিজম (Secularism) ল্যাটিন শব্দ Secularis থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে বৈষয়িক (Worldly), অস্থায়ী (Temporal), প্রাচীন (Oldage) ইত্যাদি। সেক্যুলার শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহলৌকিক, ইহজাগতিক, পার্থিব, পরকাল বিমুখ, আখিরাত বিমুখ ইত্যাদি। খ্রিস্টান গীর্জার কোন খাদেমা যদি বৈরাগ্যবাদী খানকাহী, মঠ জীবন পরিত্যাগ করে, সাংসারিক বৈষয়িক জীবনে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাকে সেক্যুলার বলে অভিহিত করা হয়। আভিধানিক দিক দিয়ে সেক্যুলারিজম হচ্ছে বৈষয়িকতাবাদ, ইহলোকিকতাবাদ, ইহজাগতিকতাবাদ। আরবীতে বলা হয় তাল আল মানিয়া-ইহজাগতিক। ড. মাহফুজ পারভেজের মতে, সেক্যুলারিজম শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো : ইহজগৎ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বহির্ভূত। অর্থাৎ ইহজাগতিকতা। অভিধানের ভাষায় সেক্যুলার বা ইহজাগতিকতা, মানে–

- যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।
- যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।
- যা কোনও ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- এমন সামাজিক বা রাজনৈতিক দর্শন, যা ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। অন্য কথায় যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোনও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোনও ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধী যারা সেকুলারিজম বা ইহজাগতিকতাকে বিশ্বাস ও লালন করেন তারাই সেক্যুলার বা ইহজাগতিক।[১]

কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। পারিভাষিক অর্থে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন একটি মতবাদ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস, যা পারলৌকিক ধ্যান ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্মনিরপেক্ষাতাবাদ হলো একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয়। র‍্যানডম হাউস অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ-এ সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয় (Not regarded as religious or spiritually sacred); যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয় (Not pertaining to connected with religion); যা কোন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি হলো একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোন ধর্মের অন্তর্গত নয়, কোন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, কোন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং আধ্যাত্মিকতা, জবাবদিহিতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ।

চেম্বারস ডিকশনারীর মতে সেক্যুলারিজম হচ্ছে, "The belief that the state morals, education should be independent of religion" অর্থাৎ

www.pathagar.com

"ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার মতে রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু ধর্মমুক্ত থাকবে।"

এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানার মতে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।' (Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religions or supernaturalism)[২]

অক্সফোর্ড এডভান্সড লার্নারস ডিকশনারীর মতে, সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারেনা এমন বিশ্বাসই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।' (Secularism is the belief that religion should not be involved in the organisation of society, education etc.)[৩]

জ্যাকব হোলিয়ক (Jacob Holyoake ১৮১৭–১৯০৬)-এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি– যা পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কেবল মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অনির্দিষ্ট, অবিশ্বাস্য মনে করে তাদের জন্য প্রণীত। (Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite, unreliable or unbelieveable.)[8]

Oxford Dictionary-এর মতে, "Secularism means the doctrine that morality should be based solely on regard to the wellbeing of mankind in the present life to the exclusion of all considerations drawn from belief in God or in future state. অর্থাৎ "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ, যা মনে করে আল্লাহ্ বিশ্বাস বা পরকাল বিশ্বাস নির্ভর সমস্ত বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানব জাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।"

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথ-এর মতে, "The Secular state is a state which guarantees freedom of religion, deals with individuals as citizen irrespective of his religion is not constitutionally connected to a particular religion nor does it seek either to promote or interfere with religion."

অর্থাৎ "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝায়, এমন একটি রাষ্ট্রকে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে, ব্যক্তিকে ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র কোন ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে না। ধর্মের উন্নতিও চায় না, হস্তক্ষেপও করে না।[৫]

'Secularism is a code of duty pertaining to life founded on considerations purely human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or

www.pathagar.com

unbelieveable. Its essential principles are three : the improvement of this life by material means. That science is the available providence of men. That it is good to do good. Whether there is other good or not, the good of present life is good and it is good to seek that good,' অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল মানুষের ইহলৌকিক দায়িত্ব সংক্রান্ত গুণাবলী এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অপূর্ণ, অস্পষ্ট, আস্থা স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের জন্য। এর মূল উপাদান তিনটি : এক. ইহলৌকিক জীবনের উন্নয়ন কেবল বস্তুর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। দুই. বিজ্ঞানই মানুষের জন্য একটি প্রাপ্তিসাধ্য ঈশ্বর। তিন. যে কোন ভালো কাজই ভালো। অন্য কোন ভালো থাকুক বা না থাকুক বর্তমান জীবনের জন্য যা ভালো তার সন্ধানই শ্রেয়।'[৬]

বস্তুত Secularism বলতে বুঝায় এমন এক মতবাদ, যা পারলৌকিক ধ্যান ধারণা ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলে। ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা হবে না। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির একান্ত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা। ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা।

কেউ কেউ মনে করেন যে, যদি নেহায়েত কেউ প্রয়োজন মনে করে তাহলে ব্যক্তিগত জীবনেই ধর্মের অনুশীলনের অনুমতি রয়েছে। মানুষের জীবনের অন্য যেসব দিক রয়েছে যেমন : পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায়, রাষ্ট্র প্রভৃতি আঙিনায় ধর্মের অনুপ্রবেশ কাম্য নয়। তবে হ্যাঁ, কেউ মানতে চাইলে তার অনুমতি রয়েছে। এটি হচ্ছে কিছু সংখ্যক বিদ্বানদের দৃষ্টিতে Secularism-এর ব্যাখ্যা। এসব বিদ্বানদের মতে সেক্যুলারিজম আল্লাহকে অস্বীকার করে না, তবে দীনকে দুনিয়া থেকে পৃথক মনে করে। এ ব্যাখ্যাটি আসলে ভুল। ইসলামের জন্য এটাই বেশি মারাত্মক। কেননা এর মাধ্যমে মুসলিমগণ মানুষকে (Muslim masses) প্রতারিত করা হয়। কেননা এ মতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে চিরতরে মুছে ফেলা। মানুষকে ধর্মদ্বেষী, ধর্মত্যাগী বানানো; এমনকি ব্যক্তিগত জীবনকেও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই হচ্ছে এ মতবাদের মূল উদ্দেশ্য। এ আলোকে Secularism-এর অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা। জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম পালন নয়। রাষ্ট্র যখন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে তখন তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে রাষ্ট্র ধর্মকে কোন নীতি বা উপাদান হিসেবে ব্যবহার করবে না।[৭]

বাংলা ভাষায় Secularism-এর অনুবাদ করা হয়ে থাকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, যার ধর্ম তার কাছে, পরধর্ম সহিষ্ণুতা এর উদ্দেশ্য। আসলে ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা মুসলিমরা আজীবন প্রতারিত হয়েছে। এমনকি শুধু বিভিন্ন পরিভাষাকেই পরিবর্তন বা বিকৃত করে তাদেরকে ধোকা দেয়া হয়নি বরং অনেক পরিভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রেও মুসলিমদেরকে ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষেপ করে উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা

www.pathagar.com

চালানো হয়েছে। Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হওয়াটাও মূলত এ ধরনের ষড়যন্ত্রের প্রামাণ্য দলীল। এখানে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে যার অর্থ 'নেই'। অন্য কথায় অপেক্ষা নেই যার। এখানে 'অপেক্ষা'-এর যে অর্থগুলো বাংলা একাডেমীর বাংলা অভিধানে স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় 'ভরসা' বা 'নির্ভরতা'। তাহলে ধর্মের ওপরে নির্ভরতা না থাকার নামই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কোন কোন অভিধানে 'নিরপেক্ষতা'-এর অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতশূন্য বা উদাসীন। সুতরাং কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না করা ও কোন ধর্মের ব্যাপারে উদাসীনতা হচ্ছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' যা মূলত ধর্মহীনতারই আর এক নাম। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যার ধর্ম তার কাছে একথা মোটেও ঠিক নয়। এর অর্থ ধর্মহীনতা বললে মুসলিমরা এটাকে গ্রহণ না করে বরং এর মুখে থু থু নিক্ষেপ করবে সেজন্য অত্যন্ত চালাকি করে চমকদার মোড়কে এমন একটি শব্দ এর জন্য চয়ন করা হয়েছে যাতে কিছুটা হলেও অর্থগত দিক থেকে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। আর এটি এজন্য যে যাতে মুসলিমদেরকে অন্ধকারে রেখে বিভ্রান্ত করে তাদের ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক এ ধর্মহীনতাকে গেলানো যায়, এটি তারই একটি সুনিপুণ ষড়যন্ত্র। তাই Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষবাদ' হওয়াটা মূলত মুসলিমদেরকে এ শব্দটির বাস্তব অর্থ থেকে আড়ালে রাখারই অপপ্রয়াস, যাতে এর গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস না পায়। উল্লেখ্য যে, এ শব্দটিকে যখন আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছে তখন কিন্তু এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখা হয়েছে যেখানে সামান্য বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। Secularism-এর আরবীতে অনুবাদ হচ্ছে 'আল লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহীনতা।

এমনকি "The Oxford Study Dictionary"তেও Secular-এর অর্থ করা হয়েছে Not involving or belonging to religion, যার অর্থ এককথায় ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদি। সুতরাং Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলে একে 'যার ধর্ম তার কাছে' ব্যাখ্যা দিয়ে চালিয়ে দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই ধর্মনিপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে 'ধর্মহীনতা'।

সাম্প্রতিককালে কোন কোন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেক্যুলারিজমকে ধর্মহীনতা বলতে নারাজ। কোন বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা বা প্রশাসন পরিচালনা না করে সকল ধর্মাবলম্বীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই কেউ কেউ সেকুলারিজম অর্থে গ্রহণ করেন। অন্য কথায় সকল ধর্মের অস্তিত্বই সমভাবে স্বীকৃত দেশসমূহই তাদের মতে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে স্বীকৃত।

এ প্রসঙ্গে ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী লিখেছেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল কিছু খারাপই নয়, এটি সত্য-বিধ্বংসী ইবলিসী কালকূট। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সামান্যতম ছাড় দেয়াটাও একজন ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে অসম্ভব। আর নিশ্চয়ই কোন মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষ নয়, আর যে ধর্মনিরপেক্ষ সে মুসলিম নয়, খোদাদ্রোহী। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র সত্য, পূর্ণাঙ্গ, মনোনীত দীন

www.pathagar.com

হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ ও প্রসার করার ঘোষণা দেয়ার পর আর কোন মানব রচিত দীন, ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মের সহযোগে ককটেল বা সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের, নূর-যুলমের সহাবস্থানরূপী ব্যবস্থাস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ গুমরাহী ও ইবলিসী কারবার। দীন বা জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামের প্রশ্নে কোন আপোষ, ছাড় নেই; মিথ্যার সাথে সহাবস্থান নেই, দীনকে ব্যক্তিগত জীবনে আবদ্ধ রাখার বিষয়ও নেই। সমগ্র জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, সাধনা ও সংগ্রামই কেবল গ্রহণযোগ্য।৮ কাজেই কোন মুমিন ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করতে পারে না।

সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অসদাচরণের মতো। কেননা দেখা গেছে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দেন তারা মূলত ধর্মবিরোধী।৯

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ 'যার ধর্ম তার কাছে নয়।' শুনতে বড়ই অবাক লাগে যখন কোন মুসলিম আল কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন– বুখারী শরীফে আছে– "লাকুম দীনুকুম অলিয়াদীন।" অর্থাৎ যার ধর্ম তার কাছে। এখানে কুরআন-হাদীসের মধ্যে পার্থক্য না করতে পারার ক্ষেত্রে জ্ঞানের দৈন্যের সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থের বিকৃতি মূলত তাদের মূর্খতারই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।১০ ধর্মনিরপেক্ষতা মানে মানুষকে ধর্মহীন করে রাখা।১১

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা (Fundamental ideas of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা হচ্ছে–

- রাষ্ট্র বা রাজনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। ইহজাগতিক বা পার্থিব জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা হয়।

- ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে। এটি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

- রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনায় কোনভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা হবে না। এ মতবাদ ঈশ্বর বা পরকালীন জীবনের কথা স্বীকার করে না। এটি ইহকালীন জীবন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত মতবাদ। ইহকালীন বিষয়ে ধর্মের কোন স্থান নেই, পরজগত বিষয়েও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন বক্তব্য নেই।

- সেক্যুলারিজমের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে কেবল বস্তুগত উপায়ে মানব সমাজের উন্নতির প্রচেষ্টা চালানো। মানব কল্যাণে শুধু বস্তুগত উপায়-উপকরণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ– এক্ষেত্রে কোন অদৃশ্য শক্তির বা স্রষ্টার কোন ভূমিকা নেই এবং স্রষ্টার সাহায্যেরও কোন প্রয়োজন নেই।

- মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলামমুক্ত শাসন। ইসলামকে ব্যক্তির একান্ত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা।

- ইসলাম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে

www.pathagar.com

ইসলামের সাথে সম্পর্কহীনভাবে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে পরিচালনা করার মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলাম থেকে জীবন, রাজনীত, সমাজনীতি, পারিবারিক প্রথা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সকল কিছুকেই পৃথক করতে চায়। এটা তাদের এক কৌশলী হাতিয়ার।

● ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজ সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে ধর্মহীন করা, ইসলামমুক্ত করা। ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সকল প্রকার অপচেষ্টা। ইসলামের মূল আদর্শ, চেতনা এবং প্রেরণা মানুষকে দূরে রাখতে চায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

● ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কার্যত রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতা। মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কোন আদর্শ নেই। নেই কোন ভিত্তি। এ মতবাদের অনুসারীরা ইসলামের মূল আদর্শ, চেতনা এবং স্পিরিট থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চায়।

সেক্যুলারিজমের নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্য (Characteristics and Rules of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কতিপয় নীতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান প্রধান নীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এমন এক উদার নীতির পরিচায়ক– যার মধ্যে ফ্রয়েডের যৌনদর্শন, কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্র, বস্তুবাদ, পশ্চিমা পুঁজিবাদ, ভাববাদ এসবই একাকার হয়ে যায়।

২। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কেবল বস্তুগত উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষের উন্নতির প্রচেষ্টা। এ মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র বস্তুগত উপায়-উপাদানের মাধ্যমে মানুষ তার বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জন করতে পারে।

৩। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তাগণের মতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেমন : পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদির মতই মানুষের আচরণ ও সমাজের কল্যাণের জন্য যে নীতিমালা ও আইন-কানুনের প্রয়োজন তা একমাত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রচনা করা সম্ভব। এর জন্য কোন ধর্মবিশ্বাস, নবী-রাসূল, প্রত্যাদেশ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

৪। তত্ত্বগতভাবে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীগণ জগতকে দু'ভাগ করেন– একটি বস্তুগত জগৎ বা প্রাকৃতিক জগৎ যার মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আর একটি হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগৎ বা অতিপ্রাকৃতিক জগৎ যা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব। তাদের মতে আধ্যাত্মিক বা অতিপ্রাকৃতিক জগৎ একটি অজ্ঞেয় জগতও বটে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতে, প্রথমটিতে ধর্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং এ জগতে মানববুদ্ধি, পরীক্ষা নিরীক্ষা বা অভিজ্ঞতাই একমাত্র পথ নির্দেশক। আর দ্বিতীয় জগৎটিতেই ধর্ম বিচরণ করার অধিকার পেতে পারে– অন্য কোথাও নয়।

৫। তত্ত্বগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নাস্তিকতা বা আস্তিকতা কোনটাই নয়। কিন্তু

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হোলিয়কের (১৮১৭-১৯০৬) নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি সরাসরি নাস্তিকতার কথা না বললেও ব্রেডলাফের (১৮৩৩-১৮৯১) নেতৃত্বাধীন অপর শক্তিশালী গ্রুপ একই সাথে নাস্তিকতার প্রচার করতে এবং তাদের মতে, ধর্ম বিশ্বাসের সরাসরি বিরোধিতা না করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

৬। নৈতিকতার ভিত্তি ধর্ম বিশ্বাস নয় বরং যুক্তিবুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নির্ভর নয় বরং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অভাব থেকে সৃষ্টি। হোলিয়কের মতে, বিজ্ঞান যেভাবে স্বাস্থ্য বিধি শিক্ষা দেয়, তদ্রূপ নৈতিক শিক্ষাও দিতে সক্ষম।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ (Orgin and Development of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রাচীন একটি মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভাবধারা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের সফিস্টদের চিন্তাধারার[১২] মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সক্রেটিসের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) চিন্তাধারাতেও এ ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবে রোমান ও গ্রীক সমাজ প্রধানত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যার ভাবধারা রেনেসাঁর মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আধুনিক ভাবধারার প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে মধ্যযুগের শেষদিকে পশ্চিম ইউরোপে। এক্ষেত্রে স্কলাস্টিক ও নমিনলিস্ট দার্শনিকদের চিন্তাধারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরি করে। লুথার কিং-এর খ্রিস্টান প্রটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলন (যা ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে আখ্যায়িত করে), ইতালীর ম্যাকিয়াভেলীর নৈতিকতামুক্ত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার মতবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে।

১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন (Enlighterment Movement) শুরু হয় এবং এ আন্দোলনের সন্তান হিসেবে সেক্যুলারিজমের যাত্রা নতুন গতি লাভ করে। ১৮০০ শতাব্দীর শেষে যে পরিবর্তন বা যে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন শুরু হয় তার আগে ইউরোপে দু'টি আন্দোলন হয়েছিল। প্রথমটি রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। এটি ছিল সাহিত্য আর্টের ক্ষেত্রে; ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। এর পরেরটি হচ্ছে সংস্কার আন্দোলন (Reformation movement) যার মানে হলো গির্জা ক্ষেত্রে রেনেসাঁর প্রভাবকে সম্প্রসারণ করে জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বাধাসমূহকে অপসারিত করা এবং এর ফলে সত্যিকার অর্থে আধুনিক ইউরোপের জন্ম সম্ভব হয়ে ওঠে। সংস্কার আন্দোলন মূলত একটি ধর্মীয় আন্দোলন। ধর্মীয় আন্দোলন হলেও এ আন্দোলনের একটি বড় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, তা ব্যক্তি বিবেকের (Individual Conscience) নামে পার্থিব বা রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে ব্যক্তিকে তার নিজস্ব বিবেক অনুসারে স্বাধীনভাবে মতামত নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করে। এর বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যায় না গিয়ে বলা যায় যে, এরই ফলে চার্চ নানাভাবে বিভক্ত হয়, যেমন মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে লুথারিয়ান চার্চ (Lutherian Church) ক্যালভিনের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

ক্যালভিনিস্ট চার্চ (Kelvinist Church), ব্রিটিশ প্রাইস্ট (British Priest) এবং অন্যান্য। এর সবগুলোকে একত্রে বলা হয়ে থাকে প্রোটেস্ট্যান্ট মুভমেন্ট (Protestant Movement), যেটা হলো রিফরমেশন আন্দোলনের ফল। তৃতীয় আর একটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে। সেটি শুরু হয় মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের নামে। ১৮০০ শতকের শেষে এবং ফরাসি বিপ্লবের আগে ও পরে এর প্রভাব বজায় থাকে। এ আন্দোলনের বেশির ভাগ নেতা ছিলেন নাস্তিক বা গুপ্ত নাস্তিক অথবা নাস্তিকের মতো। মাত্রা ইতিহাসে এই প্রথম করা এ দর্শন নিয়ে এলেন যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ থেকে ধর্মকে বিদায় করতে হবে। অন্যকথায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকবে না। ধর্ম থাকতে হলে কারো অন্তরে থাকবে, যদি কেউ রাখতে চায়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আইনসভা– এসব থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। এ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিলো, যুক্তিই জীবনের ভিত্তি হবে। যে কারণেই হোক, এই আন্দোলন ইউরোপের তৎকালীন নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

১৯ শতকের মাঝামাঝিতে এসে একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অভ্যুদয় ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন ব্রিটেনের জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪)। তিনি ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হলেও পরবর্তী সময়ে সমাজ ও মানুষের প্রতি প্রচলিত চার্চের সহানুভূতির অভাব দেখে চার্চের প্রতি বিমুখ হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৪১ সালে পুরোপুরিভাবে ধর্ম ও আল্লাহ বিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি আজীবন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হলিয়কের যারা সহযোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে চার্লস ব্রেডলাফ (১৮৩৩–১৮৯১), চার্লস সাউথওয়েল, থমাস কপার, চার্লস ওয়াটস, ডি. ডব্লিও ফুটের (১৮৫০–১৯১৫) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হোলিয়ক ও তার অনুসারীদের আন্দোলন শুরু হয় ১৮৬৪ সালে। সে সময় নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন নামে আর একটি আন্দোলন চলছিল। সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জনমন থেকে ঈশ্বর বিশ্বাসকে চিরতরে মুছে ফেলা। তারই পাশাপাশি শুরু হয়েছিল কার্ল মার্কস[১৩] (১৮১৮–১৮৮৩) ও এঙ্গেলস[১৪] (১৮২০–১৮৯৫)-এর কমিউনিজমের আন্দোলন। সেটাও এক ধরনের নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন ছিল।

তদানীন্তন ইউরোপের জনগণ যতই ধর্মবিমুখ হোক না কেন নাস্তিকতার সরাসরি প্রচারণা তারা মেনে নিতে পারল না। এমনকি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি পর্যন্ত স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকৃতির ব্যাপক প্রচারণাকে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতে থাকেন। তাদের যুক্তি ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার বা চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

হোলিয়ক ও তার সঙ্গীরা মূলত সেই সময়কার নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনের বিকল্প অথচ সহধর্মী একটি আন্দোলন গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা শুরু করেন।

১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম তাদের আন্দোলনটিকে বুঝানোর জন্য সেক্যুলারিজম পরিভাষাটির

৩—

www.pathagar.com

প্রয়োগ শুরু হয়। এ শব্দটি এজন্যই প্রয়োগ করা হয়েছিল যাতে করে লোকেরা এ আন্দোলনটিকে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন মনে না করে। কেননা যারা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তারা প্রায় সবাই বিশেষ করে ব্রেডলাফ ও তার সহযোগী চার্লস ওয়াটস, ডি. ডব্লিও ফুট প্রমুখ সবাই কট্টর নাস্তিক ছিলেন। এমনকি ব্রেডলাফ ও তার সহযোগীরা এ আন্দোলনকে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলন বলে প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। ব্রেডলাফের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলনকে সফল করতে হলে অবশ্যই নাস্তিকতার ধারণাও প্রচার করতে হবে। তার মতে, নাস্তিকতাবাদ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ টিকে থাকতে পারে না। অবশ্য জেকব হোলিয়ক নাস্তিকতাবাদ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। অবশ্য এর কারণও ছিল। তদানীন্তন খ্রিস্টিয় ইউরোপে এমন অনেকেই ছিলেন যারা ধর্মের নিগড় থেকে মুক্তি চাচ্ছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মের হস্তক্ষেপ তারা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু ঐসব লোক আবার সরাসরি নাস্তিক হতেও রাজি ছিলেন না। ব্যক্তির জীবন, সীমিত পরিসরে ধর্মের উপযোগিতা তারা অস্বীকার করতে চাইতেন না। জর্জ জেকব হোলিয়ক যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন শুরু করেন– তখন তিনি চাচ্ছিলেন এমন সব লোকদের আন্দোলনে শরীক করতে, যারা চার্চের প্রতি বীতশ্রদ্ধ অথচ নাস্তিক নয়। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য চার্চবিরোধী সর্বশ্রেণীর লোকদের তারা ব্যক্তিজীবনে আস্তিক হোক, নাস্তিক হোক, ধার্মিক বা অধার্মিক হোক না কেন তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন যাতে নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনে পরিণত না হয় সেজন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করতেন। তারা প্রচার করতেন যে, তাদের আন্দোলন আস্তিকতাও নয়, নাস্তিকতাও নয়। যদিও তারা জানতেন যে, আস্তিকতাও নয়, নাস্তিকতাও নয়, এমন ধরনের অবস্থার বাস্তবতা নেই। তবুও তারা বাস্তব কারণেই প্রকাশ্যে আস্তিকতা প্রশ্নে চুপ থাকাকেই শ্রেয় মনে করতেন।

যতদিন পর্যন্ত হোলিয়ক আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সরাসরি নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনরূপে প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু পূর্ববর্তী এবং ১৯ শতকের সত্তরের দশকের বিভিন্ন দার্শনিকের (যেমন : নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭), থমাস হব্‌স, মাঁবোদা, ইউগু গুসিয়াস, জর্জ জেবক হোলিয়ক (১৮১৭–১৯০৬), ব্রেডলাফ, মার্কস, এঙ্গেলস, ভলটেয়ার প্রমুখ) নাস্তিকতাবাদ, বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

পশ্চিমা জগতে চার্চের প্রভাব ও হস্তক্ষেপমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেকুলার রাষ্ট্রদর্শন গড়ে উঠে। মনে রাখা প্রয়োজন, চার্চ যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, সে খ্রিস্ট ধর্ম গোড়া থেকে কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রবক্তা ছিল না। সে ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনার কোন নীতি, রিধি-বিধান প্রণয়ন করেনি। তাই প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে খ্রিস্ট ধর্ম বিকশিত হয়েছে। গোড়া থেকেই এখানে স্রষ্টা ও রাষ্ট্রের (সিজারের) পৃথক পৃথক বা দ্বৈত আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছিল :

www.pathagar.com

"Render therefore unto Caesar the thing that are Caesar's and unto God the things that are God's."

চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টেনটাইনের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ফলে খ্রিস্ট ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের 'রাষ্ট্রীয়' ধর্মে পরিণত হয়। পঞ্চম শতকে প্রথম গ্যালাসিয়াস দু'তলোয়ার তত্ত্বের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক– ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও পার্থিব, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরবর্তীতে মধ্যযুগে পোপের শুধু ধর্মীয় কর্তৃত্ব নয়, বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। ফলে রাষ্ট্র কার্যত পোপ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় নিরঙ্কুশ পোপের শাসন। অথচ মূল খ্রিস্ট ধর্মে বা খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থে এর কোন অবকাশ ছিল না, ছিল না কোন নীতিমালা, বিধি-বিধান। পোপের শাসন সমাজের অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও মানুষের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার মাধ্যমে পশ্চিমা জগৎ মূলত পোপের স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যেহেতু মূল খ্রিস্ট ধর্মে এমন কোন নীতিমালা ও বিধিবিধান ছিল না, যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব, তাই খ্রিস্ট ধর্মের পক্ষে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না।

কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত, ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও নীতিমালা দিয়েছে। 'খিলাফাত' তত্ত্ব হচ্ছে ইসলামের মূল রাষ্ট্রতত্ত্ব। যার মূলকথা, সমস্ত কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। জনগণ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মূল সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছার প্রকাশরূপে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। একজন মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে ইসলামে বিশ্বাসী ও ইসলামের অনুবর্তী। একজন মুসলিম যেমন ব্যক্তিজীবনে ইসলামের অনুবর্তী হবে, তেমনি তাকে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামের অনুবর্তী হতে হবে। কাজেই ইসলামী তত্ত্বে রাজনীতি ও ইসলামকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ একজন মুসলিম বা মুসলিম সমাজ নীতিগত বা তত্ত্বগতভাবে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্র ও রাজনীতি বরাবরই ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্র ছিল সার্বিকভাবে ইসলামভিত্তিক। আইন-কানুন, নীতিনিয়ম সবকিছুরই মূল উৎস ছিল কুরআন-সুন্নাহ। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র ও ইসলামের বন্ধন দুর্বল হতে থাকে। তবুও অনেক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ছিল ইসলাম। কুরআন-সুন্নাহ ছিল আইনের মূল উৎস। স্বৈরাচারী নিপীড়ক শাসককেও তাদের শাসনের বৈধতার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রীয় ভিত্তিকে মেনে নিতে হত। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ ইসলামী খিলাফাতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি পর্যন্ত কমবেশি এ অবস্থা বিরাজ করছিল। পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম বিশ্বে সেকুলার ভাবধারার প্রসার ঘটে।

মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮)-এর নেতৃত্বে সেকুলার তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের মধ্যদিয়ে মুসলিম বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর পরবর্তী দশকগুলোতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন রূপ (Various Types of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদ। এর কারণ হচ্ছে ইসলাম করার কারণে যেসব মুসলমান ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় তন্মধ্যে অন্যতম হলো একথা বিশ্বাস করা যে, রাসূল (সা)-এর শাসন নীতির চেয়ে অন্য নীতি উত্তম এবং রাসূল (সা)-এর পেশকৃত হিদায়াতের চেয়ে অন্য ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ। স্বতন্ত্র মতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে শুরু হলেও বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এর অনুশীলন হচ্ছে। তত্ত্বগতভাবেও এ মতবাদকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে প্রধানত চারটি ধরনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মের প্রতি উপেক্ষা নীতি গ্রহণ করে। ধর্মের ব্যাপারে এ মতবাদ প্রকাশ্যভাবে মারমুখো নয়। ব্যক্তির নিজস্ব পরিমণ্ডলে ধর্মের অনুশীলন উদারনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা স্বীকার করে থাকেন। তাদের মূল আপত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ধর্মের কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে। ব্যক্তিজীবনে কেউ ধার্মিক হলে তাতে আপত্তি করার তেমন কিছু নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যে কোন ধর্মে বিশ্বাস ব্যক্তির অধিকারও বটে। তবে এ বিশ্বাস যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে। পাশ্চাত্য জগতের গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব রয়েছে।

২। চরমপন্থী বা মারমুখো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা ধর্মের বিরুদ্ধে চরমনীতি অবলম্বন করে থাকে তা-ই চরমপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। "ধর্মই অনিষ্টের মূল, শোষণের হাতিয়ার, জনগণের জন্য আফিমস্বরূপ, তাই ধর্মকে শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নয় ব্যক্তির মন মগজ থেকেও উৎখাত করতে হবে।" চরমপন্থী ধর্মনিপেক্ষতাবাদ ধর্মের প্রতি উল্লিখিত মারমুখো মনোভাবই পোষণ করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ কমিউনিজমই প্রধানত এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা। তত্ত্বগতভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইকে এ মতবাদ ঐতিহাসিক দায়িত্ব মনে করে। ইদানিং অবশ্য কৌশলগত কারণে ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব কিছুটা কমে এসেছে। তবে তত্ত্বগত অবস্থানের তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।

৩। সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা : বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধার প্রতি অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করলেও যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত তার প্রতি মোটেই গুরুত্ব না দেয়াকে সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হলো সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখা হবে ঠিকই কিন্তু যে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি গঠিত, সে ধর্মের ভিত্তিতে সম্প্রদায়টি পুনর্গঠন করতে প্রস্তুত না হওয়া। যেমন : বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত এদেশে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা মুসলিমদের জন্য বিগলিত প্রাণ, মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি তাদের মাঝে রয়েছে প্রবল উৎসাহ। কিন্তু সমাজজীবনে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে তারা এড়িয়ে যান বা অস্বীকার করেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ মুসলিমদের স্বার্থেই নাকি রাজনীতির সাথে পবিত্র ধর্মকে জড়িত করা উচিত হবে না– এ

www.pathagar.com

তত্ত্বও প্রচার করে থাকেন। তারা মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন। সাথে সাথে তারা ধর্মনিরপেক্ষতারও সমর্থক। এ দু'য়ের অদ্ভুত সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা। ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষতাও এমনি আর একটি উদাহরণ।

৪। **ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ :** আর এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অস্তিত্ব রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে, তা হচ্ছে ছদ্মবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এর তাৎপর্য হচ্ছে, প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হবে না, কিন্তু কাজে কর্মে সব বিষয়েই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাধান্য লাভ করবে। শুধু কথা বা প্রচারের সময় ধর্মের নামটা ব্যবহার করা হবে। অথবা কোথাও কোথাও ধর্মের ছদ্মাবরণে ধর্মনিরপেক্ষতারই শাসন চলবে। কারণ জনমতের ভয়ে ক্ষমতার স্বার্থে ক্ষমতাসীনরা ও রাজনীতিকগণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ ভণ্ডামীর আশ্রয় নেন। তারা প্রকাশ্যে তাদের মনের কথা বলতে সাহস পান না। তাই ইসলামের নাম ব্যবহার করেন শুধু ধোকা দেয়ার জন্য। তারা ধর্মের ব্যবসায় করেন, ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজনীতি করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে ম্যাকিয়াভেলীর পরামর্শক্রমে ধর্মকে ব্যবহার করেন। এরা কখনো সাম্প্রদায়িকতাকেও কাজে লাগায়। এ ধরনের ভণ্ডামীপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতাকেই ছদ্মাবেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলা হয়।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পার্থক্য (Islam vs Secularism)

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য। দু'টির দুই প্রান্তসীমায় অবস্থান। ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দূরতম কোন সম্পর্ক থাকাও সম্ভব নয়। উভয় মতবাদের পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ :

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)

১। মানুষের তৈরি মতবাদ।
অন্যকথায় মানব রচিত।
Man- made in origin.

২। এ পৃথিবীকেন্দ্রিক। ইহজগতমুখী।
সম্পূর্ণরূপে পার্থিব।
This- worldly orientation.

৩। যুক্তি, কার্যকারণ, পর্যবেক্ষণ এবং
পরীক্ষণের ওপর জোর দেয়।
Emphasizes reason,
observation and experiment.

৪। মানবতায় বিশ্বাসী।
Believes in humanism.

৫। ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করা।
ধর্মকে রাজনীতি হতে পৃথক করে।
Separates religion and politics.

www.pathagar.com

৬। ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত গণ্ডীকে আবদ্ধ রাখে।

Relegates religion to personal sphere.

ইসলামের দর্শন অত্যন্ত পরিষ্কার। তার অবস্থানও সংশয়হীন ও সুদৃঢ়। এজন্যই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামকেই প্রধানতম শত্রু মনে করে।

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Western Secularism)

গ্রীক নগর রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক চলে আসছে। আধুনিককালের পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা 'সেক্যুলারিজম'কে আধুনিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন যে, সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ অখণ্ড সমাজ মানব মনীষা প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এতে প্রাকৃতিক কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। প্রাচীন রোমের ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা গ্রীসের এ ধর্মনিরপেক্ষ উত্তরাধিকারকে গ্রহণ, লালন ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে। গ্রীক সভ্যতার এ ভাবধারা আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার সামগ্রিক চিন্তাচেতনার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।[১৫]

মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় এবং তার ফলে সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। চার্চ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং সম্রাট ও চার্চের উপর খবরদারি শুরু করে। চার্চ গ্রীক দর্শন থেকে এমন কতগুলো তত্ত্ব ও বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল যাকে তারা 'পরম সত্য' বলে মনে করত এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষায় তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও তার বিরোধিতা করা ধর্ম বিরোধিতা বলে গণ্য করত। ধর্মযাজকদের এ গোঁড়ামির ফলে ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস ও ধর্মযাজকদের প্রতি অবিশ্বাস প্রবল হতে থাকে। চার্চ যতই ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করতে থাকে এবং সেই ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দমননীতি অনুসরণ করতে থাকে, ততই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে।

ধর্মযাকজদের বাড়াবাড়ি এক সময় এমন পর্যায়ে পৌছে যে, পৃথিবী গোলাকার এ বক্তব্যের জন্য বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারা আরম্ভ হয়। জনসাধারণের দৃষ্টিতে এ সময় ধর্ম পরিণত হয় এমন একটা দানবে যার অত্যাচারে দিবারাত্র অতিষ্ঠিত হতে হয়। ধর্মের নামে এরূপ মিথ্যাচার, কুসংস্কার ও প্রতারণার প্রতিবাদে ইউরোপের বিবেকমান স্বাধীনচিত্ত মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠে। মার্টিন লুথার (১৪৮৩–১৫৪৬)[১৬] প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের (Protestant Reformation Movement) মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। পঞ্চদশ শতকে এ আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

একই সময় ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে 'মানবতাবাদ' তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এ মতের পণ্ডিতরা ধর্ম প্রসঙ্গটিকে আমলে না এনে মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কথা বলেন। এরপর রেনেসাঁর ফলে চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে ইউরোপে বিপ্লব সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

রেনেসাঁর ফলশ্রুতি হতে আধুনিকতা এর সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতকে দার্শনিক হিউম, ভলটেয়ার, ফ্রান্সিস বেকন প্রমুখের হাতে এবং পূর্ণ বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতকে ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), মার্কস, ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯), বাট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), আরনল্ড টয়েনবি প্রমুখের মাধ্যমে। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের পর রেনেসাঁর পণ্ডিতরা চার্চের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকেই সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অপরিবর্তনীয় গাণিতিক আইনে সমগ্র সৌরজগৎ পরিচালিত হয়- নিউটনের এ মতবাদে আত্মহারা হয়ে রেনেসাঁর যুগের পণ্ডিতরা বলতে শুরু করেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বিপরীতে সকল বিশ্বাসকে পরিহার করতে হবে, ভল্টেয়ার, হিউম, ফ্রান্সিস বেকন, রুশোর মতো দার্শনিকরা অতীতের সকল জ্ঞান ও ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এ বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে, সর্বজনীন গণশিক্ষা যে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিজ্ঞান প্রচার করেছে তাতে বিশ্বে একটি সত্যিকার স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের ভাগ্য বদলে দেয়ার বৈজ্ঞানিক যাদু এখন মানুষের করায়ত্বে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাফল্য এবং সর্বজনীন শান্তি বিরাজ করবে। ক্রমবর্ধমান জ্ঞান মানবজীবনকে দীর্ঘায়িত করবে এবং সকল রোগ ও কষ্ট নিঃশেষ করে দেবে। পরবর্তী শতকের প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এ নতুন বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করেছে যে, কোন অলৌকিক সাহায্য ছাড়াই বিশ্বে মানবজীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করে।[১৭] ইউরোপীয় দার্শনিকদের এ বস্তুবাদী চিন্তা ডারউইন, ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, বাট্রান্ড রাসেল তুঙ্গে পৌঁছে দেন। তারা মানবজীবনে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশাসনকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করেন। তাদের দৃষ্টিতে নৈতিকতা একটি আপেক্ষিক বিষয় মাত্র।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের ফরাসি চিন্তাবিদ অগাস্ট কোঁতে মানুষের চিন্তার ক্রমোন্নতির ইতিহাসকে তিনটি স্তরে (Theological stage, Metaphysical stage and Positive stage) ভাগ করে আধুনিক স্তরকে Positive stage (নিশ্চিত জ্ঞানের স্তর) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ হলো কোন ঘটনারাজি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এসব কার্যকারণের বরাত দেয়া হয়, যা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জানা ও বুঝা যায়, Scientific Empiricism এতে আধ্যাত্মিক কোন নিরঙ্কুশ শক্তির স্থান নেই। হিউম, মিল, রাসেল প্রমুখরা এরূপ ধারণাকে বলেছেন বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়বাদ। আর বর্তমান বিশ্বে গবেষণা ও প্রচারণার ক্ষেত্রে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইতালির ম্যাকিয়াভেলী রেনেসাঁর যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে ব্যক্তিগতভাবে কোন ধর্ম ও নৈতিকতা অনুসরণ করতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রকে তার উর্ধে থাকতে হবে। ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী নীতির প্রবক্তা ম্যাকিয়াভেলী আরো বলেন, অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছু মাত্র উপকারী হয়, হবে তা

www.pathagar.com

করতে কোন বাধা নেই।১৮ ম্যাকিয়াভেলীর এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেকুলারিজম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ ধারণাকে সমর্থন দিয়েছেন ইংরেজ দার্শনিক থমাস হবস্। তাঁর মতে একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনটাই ক্ষমতার বেপরোয়া অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

কম্যুউনিজমের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ও তার অনুসারীরা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে শুধু আলাদাই নয়; মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার ও ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তাদের দর্শনের মূল কথা হলো, মানবজীবনের প্রতিটি বিষয়কে বস্তুবাদী ধারণায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা।

ইউরোপে মধ্যযুগ ও পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার টানাপোড়নের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপরে তুলে ধরা হলো। চার্চের কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপরীতে 'সেকুলারিজম' ও নাস্তিকতাবাদ এর বিকাশ ঘটেছে ঠিকই; তাই বলে খ্রিস্ট ধর্মের ইতিবাচক নীতির আলোকে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন উদ্যোগই ছিল না এমনটি নয়। সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০), সেন্ট থমাস একুইনাস (১২২৭-১২৭৪), মাসির্লিও অব পাডুয়া (১২৭০-১৩৪০) গ্রীক দর্শনের সাথে ধর্ম ও নৈকিতার সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠনের ধারণা প্রচার করেন। অবশ্য তা সমকালীন ইউরোপে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।

যাহোক, জাতি ও গোত্রগত বিবাদে বিধ্বস্ত ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তাদের একমাত্র বন্ধন সৃষ্ট ধর্ম অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। একে একে অসংখ্য ধর্মীয় গ্রুপের উদ্ভব হয়। এর ফলে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থানকে সংহত করতে সক্ষম হয়। তবে ধর্মীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটে এবং অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্রের (Nation states) উদ্ভব হয়।

মুসলিম বিশ্বে ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক (Relation between Religion and State in Muslim World)

যে পরিবেশে ইউরোপের জনগণ চার্চের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র থেকে তাকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল মুসলিম বিশ্বে সেরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব কখনো ঘটেনি। বিজ্ঞানের কোন তথ্য ও তত্ত্বের সাথে ইসলামের কোন সংঘাত দেখা দেয়নি। (মরিস বুকাইলী) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতাও দেখা দেয়নি। মুসলিম জনগণের মাঝে ইসলামের কোন নীতি বা অনুশাসন তাদের জন্য শোষণ, নিপীড়ন ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে দেখা দেয়নি। কোন কোন শাসকের বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষ, কৌশল বা সিদ্ধান্ত নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলেও ধর্ম হিসেবে ইসলামের ও ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি কোন ক্ষোভ বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি। আজ পর্যন্ত কোন মুসলিম বৈজ্ঞানিকের মনে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়নি। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কখনো কোন যুদ্ধ বাধেনি। অথবা কোন মুসলিম শাসনকর্তা বা ধর্মীয় নেতা কোন বিজ্ঞানীকে পুড়িয়ে মারেনি বা অত্যাচার করেনি।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ফলশ্রুতি (Result of Secularism)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা ধর্মহীনতা পাশ্চাত্য জগতে হাজারো সমস্যার জন্ম দিয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেও রাষ্ট্র শাসকদের বেলেল্লাপনার কারণে ধর্ম ও নৈতিকতা বর্জিত রাজনীতি-সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা হওয়ার কারণে দেশে দেশে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. চিন্তাধারায় সংশয়বাদ (Confusion in thought) : ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান পরিণতি হলো চিন্তাধারায় সংশয়বাদ : ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক হবার কারণে মানুষের চিন্তা ও চেতনায় সংশয়বাদ আসন করে নিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে সন্দেহ সংশয়। সরকার জনগণকে বিশ্বাস করেন না। কি জানি কখন জনতার উত্তাল তরঙ্গ তাদেরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত করে ফেলে। অন্যদিকে জনগণও সরকারকে আপনজন হিসেবে ভাবতে পারেন না, ফলে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসহীনতার কারণে সন্দেহ সংশয় ছড়িয়ে পড়ে, সরকার ও জনগণের মধ্যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক গড়ে উঠে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতাদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় না। চিন্তাধারায় ও বিশ্বাসে সংশয়বাদ সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন না।

২. মূল্যবোধে বিভ্রান্তি (Confusion in values and morality) : নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল্যবোধের ব্যাপক বিভ্রান্তি ও অবক্ষয় ঘটে। ব্যাপক দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্রমবর্ধমান প্রয়াস যখন শুরু হয় তখন সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। ন্যায় ও মানবীয় গুণাবলী লুপ্ত হতে থাকে। লোভ লালসা, সুবিধাবাদ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ, পাশবিকতা, নির্লজ্জতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণে অনেকের কাছেই অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায় স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়প্রীতি ও কোটারী স্বার্থ শাসকগোষ্ঠীকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সুস্থতা হারিয়ে অশান্তি ও দুর্যোগে নিপতিত হয়।

৩. জীবনযাত্রায় বিলাসিতা (Luxery in life style) : সেক্যুলার সমাজে শাসকগোষ্ঠী ও ধনিকগোষ্ঠী বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার বিলাস দ্রব্য আমদানী করা হয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে অনুৎপাদনশীল খাতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়াতে ব্যাপক জনগণ উন্নয়নের স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিন দিন দরিদ্র হতে থাকে। সমস্যা দিন দিন বেড়েই যায়। আর এটা জানা কথা যে বিলাসভিত্তিক জীবনের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা একবার শুরু হলে তা আর দূর করা যায় না।

৪. আচরণের অশিষ্টতা (Bad manners) : আচরণের অশিষ্টতা কর্মক্ষেত্রে নীতি থেকে আলাদা করার কারণে শাসকগোষ্ঠী ও ডমিনেন্ট এলিটরা আচার আচরণ ও ব্যবহারের অশিষ্টতা প্রদর্শন করেন। ব্যাপক জনগণ এ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়

www.pathagar.com

বলে তাদের মধ্যেও এ আচরণগত দিক সম্প্রসারিত হয়। সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার নামে বেহায়াপনা ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ব্যাপকতা লাভ করে। পুরো সমাজ ব্যবস্থা অনৈতিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ডুবে যায়। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে না, বড়রাও ছোটদের স্নেহ করে না। ক্ষমতার দাপটে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান।

৫. বিভক্তিকর ও শাসনকর নীতি (Divide and rule policy) : নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার কারণে রাজনীতিতে শাসকগোষ্ঠী বিভক্তিকর ও শাসনকর নীতি অনুসরণ করেন। একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে দেন। সাম্রাজ্যবাদীদের শিখিয়ে যাওয়া এ নীতি মুসলিম দেশের পাশ্চাত্যমনা শাসকগণ প্রয়োগ করে নিজেদের দেশের মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের বীজ বপন করেন।

এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী আলেমকে তারা হাত করতে সক্ষম হন। কলমবাজী, ফতোয়াবাজীর মাধ্যমে দেশের ইসলামপন্থীদেরকেও বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষের লড়াই লাগিয়ে দিয়ে বিশৃঙ্খলতার অভিযোগ এনে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ব্যক্ত করে নিজেদের অন্যায় শাসনকে আরো পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পান।

৬. ডিপ্লোমেসিতে সুবিধাবাদ (Hypocracy in Diplomacy) : নৈতিকতা বিসর্জিত ডিপ্লোমেসিকে কপটতা বা মুনাফিকী বলে চিহ্নিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থই প্রাধান্য পায়। তাদের স্বার্থই জাতীয় স্বার্থ বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Islam and Secularism)

ইসলাম কিছু বিশ্বাস, তার মৌখিক স্বীকৃতি ও সেই অনুযায়ী নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্র পরিচালনার নাম। অন্যকথায় ইসলাম একটি ধর্মীয় আদর্শ ও ধর্মীয় জীবনব্যবস্থা। ধর্মহীনতা বা Secularism-এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্কতো নেই-ই বরং এ মতবাদ ইসলামের বিপরীত মতবাদ। আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে ইসলাম তো বটেই বরং কোন ধর্মই এ মতবাদে বিশ্বাস করে না। সুতরাং এ মতবাদ শুধু ইসলামের বিপরীতমুখী মতবাদ নয় সকল ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদ। যা হোক, ইসলামের সাথে এ মতবাদের সম্পর্ক হচ্ছে বৈপরীত্যের সম্পর্ক। পানি আর আগুনের সম্পর্ক। সাপ ও নেউলের সম্পর্ক। পানি ও আগুনের সহঅবস্থান যেমন অসম্ভব, তেমনি এ ধর্মহীন মতবাদ ও ইসলামের সহঅবস্থান একেবারেই অবাস্তব। আমি মুসলিম তবে আমি ধর্মনিরপেক্ষবাদী, আমি সেক্যুলার এ অবাস্তব চিন্তা যারা করে তারা মূলত বোকার স্বর্গেই বাস করছে। তুমি সেক্যুলার তার অর্থ তুমি ধর্মহীন, তুমি মুসলিম নও। ইসলামের সাথে তোমার সম্পর্ক নেই। মুসলিম দাবি করারও তোমার অধিকার নেই। ফলে যারা সেক্যুলার বলে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলেন তাদেরকে এ বাস্তব সত্যকে মেনে নিতেই হবে।

যারা মনে করেন সেক্যুলারিজমের অর্থ ধর্মহীনতা নয় বরং ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ করা, ধর্মকে জীবনের কিছু ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে একই সময়ে মুসলিম ও সেক্যুলার থাকার পথ খোঁজেন, সেটা মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আসলে কিন্তু ইসলাম অবিভাজ্য একটি

www.pathagar.com

জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় ইসলামের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামকে মানলেই ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানা হয়। আর জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিলে ইসলামের আংশিক পালন করলাম বলে মনে করলেও আসলে ইসলামই পালন হয় না। কেননা ইসলামের মূল রূপ হচ্ছে আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রদর্শন। আংশিক আনুগত্য করা আর অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীনতা মূলত আনুগত্যহীনতাকেই প্রমাণ করে। যেমন : একজন চাকরিজীবী তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দু'একটি পলিসির বিরোধিতা করলে তার চাকরি নিয়ে টান পড়াটাই স্বাভাবিক। সেজন্য সেক্যুলারিজমের প্রবক্তারা ব্যক্তিজীবনে ইসলাম মানার কথা বললেও তারা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম মেনে চলার কারণে তাদের ইসলাম নিয়ে দোটানায় পড়াটাই স্বাভাবিক। তাহলে ব্যক্তিজীবনে মুসলিম, আর অন্য জীবনে অমুসলিম থাকাকে অনিবার্য করে জীবনের দু'একটি ক্ষেত্রে যারা আল্লাহর আনুগত্য দেখান আর অন্য ক্ষেত্রে আনুগত্যহীন হওয়া মূলত তাদের পূর্ণ আনুগত্যহীন হওয়ারই শামিল। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, "পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না।"[১৯] এর অর্থ হচ্ছে মুসলিম হতে হলে পূর্ণভাবে হতে হবে। সুতরাং সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে যারা জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে ধর্মকে অনুশীলন করে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মুসলিম থাকতে চায়– তাদের এ চাওয়াই একেবারেই অবান্তর। কথায় আছে, "আল্লাহ্ ভী খোশ রাহে ভগবান ভী নারাজ না হো যায়ে"– মূলত কোন মুসলিমের চরিত্র হতে পারে না। অতএব, সেক্যুলারিজমের যে কোন ব্যাখ্যাই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক; এতে কোন সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

রাজনীতি ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্য একটি রূপ। এ আলোকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশীলনকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপ্রবেশ শক্তভাবে নিষিদ্ধ। এ ছদ্মাবরণে ইসলাম বিদ্বেষী এ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে অন্য কিছু না বুঝিয়ে এ দ্বারা ধর্মহীন রাজনীতি ও রাষ্ট্র এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, এখন মুসলিমরা অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মমুক্ত রাজনীতি ও ধর্মহীন রাষ্ট্র বুঝে থাকে। এ ব্যাখ্যার আলোকে ধর্মনিরপেক্ষতার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ারও ঢের কারণ রয়েছে। সুবিধাবাদী মুসলিম রাজনীতিকরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করেছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্র ইসলামী অনুশাসনের আওতায় পরিচালিত হলে সেখানে যেমন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ারও সুযোগ থাকে না তেমনি ভেজালপূর্ণ লোকদের প্রতিষ্ঠা লাভের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই এ সকল লোকদের নিকট ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সাংঘাতিক গ্রহণযোগ্য বাজার পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এ ব্যাখ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিন্তু আত্মতৃপ্তির ভাগটাও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলোর চেয়ে বেশি। সেখানে শুধু ব্যক্তিজীবনে ধর্মকে অনুশীলনের সুযোগ ছিল। পক্ষান্তরে, এখানে শুধুমাত্র রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যতীত সকল

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে ধর্মকে মেনে চলার সুবিধা রয়েছে। ফলে মনে করা হয় সেজন্যও মুসলিমরা অনেকটা ধর্মীয় আত্মতৃপ্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে লালন করছে, পালন করছে। তাদের দৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রে তো ইসলামী অনুশীলন পালন করছি, শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে এটা উপেক্ষা করলে আর কিই বা হবে? এমনি ধরনের এক অবান্তর চিন্তা তাদেরকে এ পথ অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সেজন্য মুসলিম হতে হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো রাজনৈতিক অঙ্গন এবং রাষ্ট্রীয় আঙিনাও ইসলামী ধাঁচে পরিচালিত হওয়া অনিবার্য। শরীরের কোন অঙ্গে ক্যান্সার হলে যেমন অন্য অঙ্গ একেবারে ভাল থাকলেও রোগী বাঁচানো যায় না, ঠিক তেমনি জীবনের কোন এক ক্ষেত্রে ইসলামবিমুখতা চর্চার জন্য উন্মুক্ত থাকলে অন্য ক্ষেত্রে যতই ইসলাম পালন হোক না কেন সেখানে মুসলিম থাকার সুযোগ থাকে না। আল্লাহ পাক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'তোমরা কি কুরআনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে?' যারা এটি করে তারা দুনিয়ার জীবনে, লাঞ্ছিত হয়, কিয়ামাতের কঠিন দিনে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'[২০]

কুরআনের কিছু অংশ পালন ও কিছু অংশ বর্জন করে মুসলিম থাকার সুযোগ থাকলে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই এই কঠোর সাজার কথা বলা হত না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বৈপরীত্যের সম্পর্ক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হয়ে মুসলিম থাকার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। এই মতবাদ কুফরী মতবাদ। এ মতবাদ আল্লাহদ্রোহী মতবাদ। এ আদর্শ অমুসলিমদের আদর্শ।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism in Muslim World)

মুসলিম বিশ্ব বা মুসলিমদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সবচেয়ে সরব ও মুখ্য প্রবক্তা হচ্ছেন শেখ আলী আবদ আল রাজিক (১৮৮৮–১৯৬৬)। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন এবং কিছুদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও অর্থনীতির উপর পড়াশুনা করেছিলেন। ই.আই.জে. রোজেনথালের মতে, আল রাজিক প্রণীত গ্রন্থ 'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম' ইসলাম ও সরকারের নীতি রাষ্ট্রের জাগতিক কর্মকান্ড হতে.....ধর্মকে চূড়ান্তভাবে পৃথক করার তাত্ত্বিক ভিত রচনা করে।[২১] আবদ আল রাজিক রাজনীতি ও রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সবকিছু বর্জন করে ইসলামকে শুধুমাত্র একটি ধর্ম হিসেবে পেশ করেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন রাসূল (Messanger), যার শাসন করার বা রাষ্ট্র গঠনের কোন উদ্দেশ্য ছিলো না।[২২] ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অবিসংবাদিত ধর্মীয় (Religious), বা আধ্যাত্মিক (Spiritual) নেতা, যাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন এবং ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংহতিকরণ ছিল নিছক ঘটনাচক্র মাত্র এবং এর সাথে তাঁর নবুয়াতী মিশনের কোন সম্পর্ক ছিল না।[২৩] সংক্ষেপে আবদ আল রাজিকের মতে ইসলাম ও রাজনীতির মধ্যে রয়েছে যোজনব্যাপী ব্যবধান এবং উভয়কে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে। আল রাজিকের গ্রন্থ 'আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম' প্রবল প্রতিবাদের সৃষ্টি করে এবং আল আজহারের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ড

www.pathagar.com

কাউন্সিল এ গ্রন্থের তীব্র নিন্দা করে। কাউন্সিল গ্রন্থকারের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিপ্লোমা বাতিল করে। এতে ভুল নেই যে, আল রাজিক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে নবুওয়াতী মিশন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঘোষণা করেছিলেন, যে মিশনের লক্ষ্য শুধু একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনই নয় বরং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনও ছিল। তবে আরব বিশ্বে ফারাহ আনতুয়ান (১৮৭৪–১৯২২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আরো কয়েকজন প্রবক্তা হচ্ছেন আহমদ লুতফী সাইয়্যেদ, ইসমাইল মাযহারী, কাসিম আমিন, মাইকেল আফলাক, ত্বহা হুসাইন, জামাল আবদুন নাসির, আনোয়ার সাদাত, আনতুন সাতাদাহ, আবদুল আজিজ দাইমী, কালাম আতাতুর্ক প্রমুখ।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কোন কোন মুসলিম দেশে শাসন পদ্ধতির মানদন্ডরূপে পরিবর্তন করার প্রয়াস চলছে। বস্তুতপক্ষে ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মতাদর্শকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামী বিশ্বাস ও সংস্কৃতি তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিদ্বেষ প্রসূত আক্রমণ ইসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পরিমন্ডলে অবক্ষয়ী ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আমদানী-রফতানীর রমরমা বাণিজ্যের উৎসব চলছে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মুসলিম সর্বত্র ইসলামকেও পাদ্রীদের ধর্মের ন্যায় উন্নতি ও প্রগতি বিরোধী মনে করছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায় :

১। মুসলিম বিশ্বে যারা জ্ঞানচর্চা করছেন তাদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক অমুসলিম চিন্তানায়কের চেয়েও কম জানেন। তারা অনেক মোটা মোটা বই মুখস্থ করেছেন কিন্তু কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি, হয়ত বা প্রয়োজনও বোধ করেননি। অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে যারা কুরআন ও হাদীসের গবেষণা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন না করার ফলে এবং পার্থিব জীবনকে সর্বদিক দিয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার সুযোগের অভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে যোগ্য নেতৃত্ব দান করতে অক্ষম। দীর্ঘকাল অনৈসলামী শাসনের ফলে ইসলামী মন মগজ ও চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্ব জীবনের সকল দিক থেকেই উৎখাত হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অথচ ইসলামী মন মস্তিষ্কশূন্য মুসলিমদের নেতৃত্বই মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এ নেতৃত্বের পক্ষে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা এবং যে কোন পন্থায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া মোটেই বিস্ময়কর নয়।

২। মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান, চিন্তাগবেষণার ইঞ্জিনই বিশ্বের এ বিরাট গাড়িখানাকে টেনে নিয়ে চলছে। চিন্তানায়ক

www.pathagar.com

সাধকরাই উক্ত ইঞ্জিনের পরিচালক। তাদের মর্জি অনুযায়ী গোটা গাড়ির সকল যাত্রীকেই চলতে হয়। যতদিন মুসলিম জাতি চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ততদিন ইসলামী চিন্তাধারাই মানব জাতিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর, ভালো ও মন্দের ইসলামী মাপকাঠিই তখন একমাত্র গ্রহণযোগ্য ছিলো। ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের ফলে বর্তমান খোদাহীন চিন্তাধারার বন্যার মুখে ইসলামী জ্ঞান বঞ্চিত মুসলিমদের ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে আধুনিক জ্ঞান সাধনার যে ইঞ্জিন দুর্বার গতিতে মানব জাতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতে মুসলিম নামধারীদের এমনকি ধার্মিক বলে পরিচিত বহু মুসলিমেরও প্রভাবান্বিত হওয়া বিস্ময়কর নয়।

চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ দাসত্ব মুসলিম নেতৃত্বকে পঙ্গু করে রেখেছে। তারা ইউরোপের ওস্তাদদের নিকট নৈতিক ও মানসিক আত্মবিক্রয়ের মাধ্যমে বিশ্বস্ত শাগরিদের ন্যায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করে চলছে। তাদের স্বাধীন মন মগজ বা চক্ষু আছে বলে মনে হয় না। তারা পাশ্চাত্যের চক্ষু দ্বারা সুন্দর-অসুন্দরের সিদ্ধান্ত নেয়; ইউরোপের মগজ দিয়ে উন্নতি-অবনতির হিসাব করে এবং ওস্তাদদের মন দিয়েই ভালো-মন্দের বিচার করে।

ইউরোপের এসব মানস সন্তানগণ যদি মানসিক দাসত্ব ত্যাগ না করে তাহলে একদিন রাজনৈতিক দাসত্বই এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর উপর নেমে আসবে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো আজ এ কারণেই বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামে পরিণত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গ্রহণের কুফল (Effects of adaptation of Secularism in Muslim World)

মুসলিম বিশ্বে সেকুলার রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণের ফলাফল মোটেই শুভ হয়নি। সেকুলারিজমের প্রসারের ফলে যে সমস্ত সংকট দেখা দিয়েছে, তা প্রধানত নিম্নরূপ :

১। জাতিসত্তা সঙ্কট (Nationality Crisis) : মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশ্বের যে দেশেই বাস করুক না কেন, জাতিসত্তার প্রাথমিক ভিত হচ্ছে তার মুসলিম চেতনাবোধ। অবশ্য ইসলাম ভাষা, অঞ্চল, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত পরিচয়কে কখনোই ইসলামের উপর প্রাধান্য দেয়ার অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলাম নিরপেক্ষ, ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন কোন জাতিসত্তার ধারণা ইসলাম অনুমোদন করে না। অথচ মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলারপন্থীরা ইসলামী জাতিবোধকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে নিছক ভাষা, নৃতত্ত্ব বা ভৌগোলিক পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছে এবং এসবের ভিত্তিতেই জাতিসত্তা নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত মনন চিন্তাচেতনা কখনোই এটি মেনে নিতে পারে না। ফলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেক্যুলার ভাবধারার ভিত্তিতে জাতিগঠন প্রক্রিয়া (Nation Building process) সবসময় সংকটের জন্ম দিয়েছে। জাতিসত্তার ভিত্তি সর্বদা থেকে গেছে দুর্বল, অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকর। যেমন : বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে জাতিসত্তার ব্যাখ্যা করে, তাতে যেমন একদিকে মুসলিম পরিচয়কে অস্বীকার করা হয়, অন্যদিকে আমাদের ইতিহাস ও

www.pathagar.com

ভূগোলের সাথেও তা অসংগতিপূর্ণ। বস্তুত মুসলিম পরিচয় পরিহার করে সেক্যুলার ভাবধারা ভিত্তিক কোন জাতি গঠন প্রক্রিয়া দুর্বল ও সংঘাতপূর্ণ হতে বাধ্য।

২। মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সাথে সংঘাত (Clash with Muslim solidarity and brotherhood) : তত্ত্বগতভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সংহতির কোন সুযোগ নেই। সেক্যুলারিজম মেনে নিলে অন্য কোন দেশের বা অন্য ভাষাভাষি মুসলিমদের সাথে একাত্মতার সুযোগ কোথায়? মুসলিম উম্মাহর ধারণা নীতিগতভাবে সেক্যুলার দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। কাজেই সেক্যুলারিজম মানে মুসলিম উম্মাহর ধারণাকে, মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধকে নস্যাৎ করে দেয়া। মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজমের যত প্রসার ঘটবে মুসলিম উম্মাহর ধারণা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ততই দুর্বল হবে। সুকৌশলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। ইসলামের ওপর আঘাত ও হস্তক্ষেপ (Hit and Interference against Islam) : মুসলিম কোন দেশে সেক্যুলারিজম কায়েম করাই সম্ভব হবে না ইসলামের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত ও হস্তক্ষেপ না করে, ইসলামী নীতি ও আইন-কানুনকে বাতিল বা প্রত্যাখ্যান না করে, কোন সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন অবাস্তব। তাই দেখা গেছে, যেখানেই সরাসরি সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সেখানেই ইসলামের উপর, ইসলামী শিক্ষার উপর, সংস্কৃতির উপর এমনকি ব্যক্তিগত আইনের উপরও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তুরস্কের কথা বলা যায়। তুরস্ককে সেক্যুলার রাষ্ট্র বানাতে গিয়ে শুধু যে খিলাফাত বিলুপ্ত করা হয়েছে তা নয়, বরং ইসলামকে নির্মূল করারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। মোস্তফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে আরবীতে আযান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আরবীর বদলে তুর্কি ভাষায় কুরআন পড়তে বা আবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আল্লাহ শব্দের বদলে তুর্কি তানরী শব্দ চালু করা হয়েছিল। আযানের সময় আল্লাহ আকবার এর বদলে তানরি উলুদর (সৃষ্টিকর্তা মহান) চালু করা হয়েছিল। জোর করে মহিলাদের হিজাব খুলতে, এমনকি ভিন দেশের পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নাচতে বাধ্য করা হয়েছিল। পুরুষদের ফেজ টুপি বাতিল করে পশ্চিমা হ্যাট চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। সমস্ত সূফী দরবার বা খানকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ইসলামী পারিবারিক আইন বাতিল করা হয়েছিল। শাসনতান্ত্রিকভাবে সমস্ত ইসলামী রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আজও তুরস্কে সে ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।

তিউনিশিয়ার উন্নয়ন ও সেকুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের নামে প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইবা (১৯০২) প্রকাশ্যে পবিত্র রমযান মাসের রোযা রাখতে নিরুৎসাহিত করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রকাশ্যে রমযান মাসে পানাহার করতেন এবং তা ফলাও করে প্রচার করা হত। তিনি মুসলিম মহিলাদেরকে পর্দা পরিধান করতে নিষেধ করেন। পশ্চাদপতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুবিধার্থে ১৯৬১ সালে তিনি তিউনিসিয়ানদেরকে রমযানে রোযা না রাখতে আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

সিরিয়া-ইরাকেও সেক্যুলারপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর ইসলাম এবং ইসলামপন্থীদের সাথে খুবই জঘন্য আচরণ করেছে।

বাংলাদেশেও সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার নামে ইসলামের অবমাননামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে। মোটকথা, ইসলামকে দুর্বল না করে কোন সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়।

৪। ইসলামপন্থীদের ওপর যুলম নির্যাতন (Oppression the Islamiste) : একটি মুসলিম দেশে ইসলাম অনুযায়ী দেশ গঠন ও পরিচালনা করার আন্দোলন থাকবেই। কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রবক্তা ও বাহকরা এ সুযোগ দিতে নারাজ। কোথাও আইন করে ইসলামভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হয়। যেমন : তুরস্কে হয়েছে। আবার কোথাও সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়। যেমন : আলজিরিয়া, তিউনিশিয়া, মিসর ইত্যাদি রাষ্ট্রে চলছে। বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালে সাংবিধানিকভাবে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আন্দোলন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মোটকথা, সেক্যুলার সরকার ও ইসলামপন্থীদের সংঘাত অনিবার্য। আর এর ফলশ্রুতিতে ইসলামপন্থীদের ওপর চলে অমানুষিক আচরণ ও নির্যাতন।

৫। সেক্যুলার রাষ্ট্র একটি অত্যাচারী-স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা (Secular state is an autocratic state system) : মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার সরকার মানে স্বৈরাচারী-অত্যাচারী সরকার। কেননা একটি মুসলিম দেশকে সেক্যুলার বানাতে হলে ইসলামের উপর হস্তক্ষেপ করতে হয়। ইসলামী আইনকে প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে হয়। সমাজকে অনৈসলামী ও পাশ্চাত্যকরণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। ইসলামপন্থীদের প্রতিরোধ করতে হয়, মুসলিম পরিচয়কে দুর্বল করে দিতে হয়, ইসলামী ভাবধারার প্রসার বন্ধ বা হ্রাস করতে হয়। আর এসব কাজ যুলুম, নির্যাতন ও জোরজবরদস্তি ছাড়া সম্ভব হয় না।

তদুপরি সেক্যুলার সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন আদর্শ, মতবাদ ও রাজনীতি গ্রহণ করতে হয় যা কোন না কোনভাবে ইসলামবিরোধী বা ইসলামের সাথে অসংগতিশীল হবে। তা সমাজতন্ত্র, উগ্রজাতীয়তাবাদ বা পশ্চিমা গণতন্ত্র যাই হোক না কেন। আর ইসলামবিরোধী এসব আদর্শ জনগণের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে তো নয়ই। ফলশ্রুতিতে যুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার অনিবার্য হয়ে উঠে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার সরকারগুলো পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রও অনুসরণ করে না। তারা অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের আরেক দর্শন। একনায়কত্ব, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যা অনিবার্যভাবে সরকারকে যুলুমবাজ, স্বৈরতান্ত্রিক করে তোলে। জনগণের মতামত নিয়ে দেশ পরিচালনা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি বলে স্বীকৃত হলেও মুসলিম বিশ্বের সেক্যুলার সরকারগুলো সে নীতিও মানছে না। কেননা সে নীতি মানলে কোন দেশে সরাসরি

www.pathagar.com

সেক্যুলার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই কার্যত সেক্যুলার সরকারগুলো একনায়কে পরিণত হয়েছে। আরব বিশ্বের প্রায় সবকটি বড় বড় সেক্যুলার রাষ্ট্রে একদলীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে। মিসর, তুরস্ক২৪, আলজিরিয়া, তিউনিশিয়ার সেক্যুলার সরকারগুলো তাদের পৃষ্ঠপোষক পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যূনতম অনুসরণও করছে না। কারণ জনগণকে অবাধ পছন্দ ও বাছাইয়ের সুযোগ দিলে জনগণ কখনোই সেক্যুলার গোষ্ঠীকে সমর্থন দেবে না। কাজেই সেক্যুলার সরকারকে স্বৈরাচারী, যুলমবাজ হতেই হবে। মুসলিম বিশ্বে কোন সেক্যুলার সরকার গণতান্ত্রিক হতে পারে না, হওয়ার কোন সুযোগও নেই।

৬। সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা নস্যাৎ (Destruction of cultural identity and Liberty) : মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলার ব্যবস্থা কায়েমের অর্থই হলো পশ্চিমা অনুকরণে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। মুসলিম চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যকে পরিহার করা। এর ফলে মুসলিম সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য নস্যাৎ হতে বাধ্য। সেক্যুলার রাষ্ট্রে বাস করে আমাদের পক্ষে প্রতিকূল ও ক্ষতিকর পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। বরং সেক্যুলারিজম মানেই হচ্ছে বস্তুবাদী, ভোগবাদী, ধর্মহীন সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো। কাজেই মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পথে সেকুলারিজম এক প্রচণ্ড বাধা। সেক্যুলারিজম হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পৃষ্ঠপোষক শক্তি।

৭। বিদেশনির্ভরতা (Foreign dependency) : সেক্যুলার সরকারগুলো যতই নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে দাবি করুন না কেন, তারা মূলত বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিনির্ভর। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও টিকে থাকার জন্য বিদেশি শক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য।

কোন আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করা সেকুলার সরকারগুলোর দ্বারা সম্ভব নয়। কাজেই এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মুসলিম বিশ্বে সেকুলার সরকার মানেই যুলুমবাজ, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, বিদেশী শক্তির লেজুড়, গণবিরোধী ও ধর্মবিরোধী সরকার। সেক্যুলার সরকারগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জাতির অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব নয়।

৮। শিক্ষা থেকে ধর্ম আলাদা : শুরুতে ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণের ফল হয় ভয়াবহ। পাশ্চাত্যে শিক্ষা থেকে ধর্মকে আলাদা করা হলো। এভাবে যে স্কুল ব্যবস্থা গড়ে উঠল তাতে মানুষ নিছক স্বার্থপর হয়ে উঠল। তারা ভোগবাদী হয়ে পড়ল। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। যে ধর্মের দ্বারা কোনো কাজ হয় না, তার প্রতি সম্মানও কমে গেল। নীতিবোধের যে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য তাও লোপ পেল। নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা নিয়ে মানুষ গড়ে উঠল। এ স্কুলে জেনারেলরা গড়ে উঠলেন, পলিটিশিয়ান ও চিন্তাবিদরা তৈরী হলেন। তাদের মনের গভীরে এ মনোভাব স্থায়ী হলো যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, চাই সেটা পার্লামেন্ট, মার্কেট, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক যাই হোক না কেন। এই যে ব্যক্তিগত এক ধরনের মনমানসিকতা গড়ে উঠল তার ভিত্তিতে তাদের সামাজিক আচরণ তৈরী হলো। এর ফলে সকল স্তরে তার প্রভাব কার্যকর হলো।

৪—

www.pathagar.com

৯। অর্থনীতি ক্ষেত্রে সেক্যুলারিজম গ্রহণের কুফল : অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোস্যাল ডারউইনিজম প্রবেশ করল অর্থাৎ যোগ্যতামর উধ্বর্তন নীতি (Survival of the fittest)কে মূলমন্ত্র করে নেয়া হলো। কেবল যোগ্যতমই টিকে থাকবে। এর মানে যারা যোগ্যতম নয়, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, কিছু আসে যায় না। এখানে কোন নীতিবোধ, দয়া-মায়ার প্রয়োজন নেই। এটাই বরং যুক্তিযুক্ত যে, যোগ্যতমকে এগিয়ে দেয়া হলো। এটাই ছিল সোস্যাল ডারউইনইজম, যা ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাপরাধী, ইসলাম বিরোধী। সেকুলারিজম অর্থনীতি ক্ষেত্রে গডকে বাদ দিয়ে চিন্তা করার রীতি চালু করল। পুঁজিবাদ যখন ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গী হলো, তখন ইউরোপে শ্রমিককে এমনভাবে শোষণ করা হলো, তাদের শুধু বেঁচে থাকার অবস্থায় রেখে দেয়া হলো; তাও শুধু উৎপাদনের স্বার্থে। পরে এর প্রতিক্রিয়াতেই কমিউনিজমের জন্ম হলো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির মতবাদ বা সেকুলারিজম আরোপের ফল হলো এই যে, অর্থনীতি ক্ষেত্রে অমানবিকতা ও নীতিহীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং বলা হলো, এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইন্স; অর্থনীতি একটি অবিমিশ্র বিজ্ঞান; এর মধ্যে নীতিবোধ থাকবে না, নীতি থাকবে না। অর্থনীতি নিজের গতিতে চলবে। এগুলোর পরিণাম বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট। এটা হয়েছে অতিলোভ ও অতিলোভের আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং রিবা (সুদ) তাকে সাহায্য করেছে। সুদ না থাকলে এটি কখনোই হতো না।[২৫]

সেক্যুলারিজমের কুফল থেকে উত্তরণের উপায়

সেক্যুলারিজমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এজন্য কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন–

১. মুসলিমগণকে একমাত্র আল্লাহর কাছে নিজেদের সোপর্দ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনার দিকে ফিরে যেতে হবে। দেশে দেশে সব সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে মুক্তবুদ্ধির মিথ্যা দর্শন। মুক্তবুদ্ধির অনুসারীদের কথা হচ্ছে, গডকে বাদ দাও। অথচ মহান স্রষ্টাকে সব সময় অবলম্বন করতে হবে। তাঁর উপর আস্থা রেখেই জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহর কাছে মানুষ সব দিক দিয়ে আবদ্ধ, দায়বদ্ধ। তাকে বাদ দেয়া চলবে না।

২. মানুষকে নৈতিক শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নৈতিক শিক্ষার জন্য ধর্ম ছাড়া, ইসলাম ছাড়া আর কোন ভিত্তি নেই। মুসলিম দেশে ইসলামকে ভিত্তি করতে হবে এবং অমুসলিমদের বিকল্প থাকবে। অমুসলিম দেশে তাদের ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের নৈতিকতার ভিত্তিতে শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. ইসলাম বিজ্ঞান বিরোধী এটি যে সত্য নয়, তা সকল মহলে তুলে ধরতে হবে। এ বিষয়ে ড. ইসমাইল আল রাজীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আত তাওহীদে লিখেছেন, God is not against science, God is the condition of science, not an enmy of science.[২৬]

আল্লাহ আছেন বলেই তিনি একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এটা আছে বলেই বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

সূত্র বের করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ না থাকলে কোনো শৃঙ্খলা থাকতো না, কোন বিজ্ঞানও সৃষ্টি হতো না।

৪. সেক্যুলার মনকে ইসলামী মনে পরিবর্তন করতে হবে। এজন্য তাদের কিছু মৌলিক বই পড়াতে হবে।[২৭]

উপসংহার (Conclusion)

সেক্যুলারিজম মুসলিম বিশ্বের জন্য এক ক্ষতিকর মতবাদ। এ হচ্ছে এক অভিশাপ। এ মতবাদের প্রসার মানে ইসলামের ক্ষতি, মুসলিম ঐক্য নস্যাৎ হওয়া। সেক্যুলার মতবাদ মুসলিম বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তার এমনকি স্বাধীনতার জন্যও হুমকি। সেক্যুলার ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। অতএব, সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, লড়াই করা জনগণের আশু কর্তব্য। ■

টীকা :

১. বিআইসি আয়োজিত ৩০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শীর্ষক সেমিনারে ড. মাহফুজ পারভেজ প্রদত্ত বক্তব্য। উদ্বৃত সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৮৯।

২. Encyclopaedia Americana, ২৪তম খন্ড, পৃ. ৫১০।

৩. Oxford Advanced Learners Dictionary উদ্বৃত, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বিআইসি, পৃ.২১৯।

৪. জর্জ জ্যাকব হোলিয়ক, English Secularism : A Confession of Belief, শিকাগো, ১৮৯৬; উদ্ধৃত, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বিআইসি, পৃ. ২১৯।

৫. D. E. Smith, India as a Secular State, Princeton University Press, Newyork.

৬. English Secularism, পৃ. ৩৫, উদ্ধৃত। ইসলামী রাজনীতি সংকলন, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ প্রকাশিত, জানুয়ারী ২০০৮, পৃ. ৫২-৫৩।

৭. প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অন্যান্য অনুষঙ্গ (প্রবন্ধ) ১৯-২১ আগষ্ট ১৯৭২ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা ফজলুল হক মিলনায়তনে সাহিত্য সংসদ আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে পেশকৃত, পরবর্তীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামে ১৯৭৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, পৃ. ১৫১।

৮. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, এক সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আনন্দিত বিহঙ্গের সঞ্চালিত ডানার নিস্বরণ, আবু জাফর এর 'ইসলামের শত্রু-মিত্র' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির, ২৪ জুলাই, ১৯৯৯।

৯. সৈয়দ আলী আহসান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আমি আমার সাক্ষ্য, ঝিঙে ফুল, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ৩৩।

১০. ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে ধর্মদ্রোহিতা, দৈনিক সংগ্রাম, ৫ জুন, ২০০০।

১১. ডঃ খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৯ পল্টনস্থ ভাসানী মিলনায়তনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা, দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃ. ১২।

১২. সোফিস্ট (Sophist) দার্শনিকগণ রাষ্ট্র, সরকার ও অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। সোফিস্ট দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হলো গর্জিয়াস (Gorgias), প্রোটোগোরাস (Protagoras), থ্রাসিমেকাস (Thrasimachus), হিপ্পিয়াস (Hippias), প্রোডিকাস (Prodicus) প্রমুখ।

www.pathagar.com

১৩. কার্ল মার্কস একজন ইহুদী ছিলেন। প্রুশিয়ার রাইনল্যান্ড প্রদেশে ট্রিভস নামক স্থানে এক চরমপন্থী ইহুদী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৪. ফ্রেডারিক আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত, যিনি কার্ল মার্কস-এর সঙ্গে একত্রে মার্কসবাদী রাষ্টদর্শন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের উদ্গাতা, জার্মানির বার্মেন শহরে জন্ম।

১৫. মরিয়ম জামিলা, ইসলাম এন্ড মডার্নিজম, ১৯৭৬, ঢাকা, পৃ. ৮।

১৬. মার্টিন লুথার জার্মানির আইজলবেন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যয়ন করেন কিন্তু আইন ব্যবসা তাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মানুরাগী। তিনি অসান্টিনীয় সম্প্রদায় যোগদান করেন এবং ১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে সম্প্রদায়ের কাজে রোম সফরে যান। কিন্তু সেখানে তিনি গীর্জার কর্মকর্তাদের যে জীবনযাপন প্রণালী প্রত্যক্ষ করেন তাতে তিনি বিস্মিত ও মর্মাহত হন। তিনি তখন থেকেই গীর্জার সংস্কার সাধনের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন তাঁর এই সংকল্পের চূড়ান্ত পরিণতি।

১৭. মরিয়ম জামিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৫।

১৮. দি ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপেডিয়া, খন্ড ১৩, ১৯৯২ সংস্করণ, পৃ. ৯।

১৯. সূরা ২ : আল বাকারা : ২০৮

২০. ২ : সূরা আল বাকারা : ৮৫

২১. ই.আই.জে. রোজেনথাল, Islam in the Modern National State, ক্যামব্রিজ ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ক্যামব্রিজ, ১৯৬৫, পৃ. ৮।

২২. আলী আবদ আল রাজিক, আল ইসলাম ওয়া উসুল আল হুকম, আল হায়াত লাইব্রেরী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৬৬, পৃ. ৮৩।

২৩. আলী আবদ আল রাজিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

২৪. তুরস্কে বর্তমানে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ক্ষমতাসীন হয়েছে। এ দলটি ইসলামপন্থী। এ দলের প্রধান রিসেফ তায়েফ এরেদোগান বর্তমানে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী। এ দলের ডঃ আবদুল্লাহ গুল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট।

২৫. শাহ আবদুল হান্নান, শিক্ষা, ধর্ম ও সেক্যুলারিজম (প্রবন্ধ), ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ-১৭ (২৭ জুন, ২০০৯) উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনির, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, পৃ. ২১-২২।

২৬. উদ্বৃত শাহ আবদুল হান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

২৭. শাহ আবদুল হান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

লেখক -পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম- বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ ও প্রাবন্ধিক।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

ইসলামে নারীর মর্যাদা

খোন্দকার রোকনুজ্জামান

সূচনা

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জ্ঞাত ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে নারীর অবমাননা এবং বঞ্চনার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার আত্মা আছে কি-না সে-ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছে; ফলে পুরুষের মত তাকে দেওয়া হয়নি আত্মিক উন্নতির সুযোগ। তাকে দেওয়া হয়নি সম্পত্তির উত্তরাধিকার; বরং নিতান্ত অস্থাবর সম্পত্তির মত তাকে যথেচ্ছা হস্তান্তর বা বিক্রয় করা হয়েছে। নারীর ন্যায়বিচার লাভের আশা চিরদিন রয়ে গেছে সুদূর পরাহত। কোন কোন সভ্যতায় নারী শুধু মাতা হিসাবে সন্তানদের ভক্তি লাভ করেছে। এ-ছাড়া কন্যা, স্ত্রী, ভগ্নী, সমাজের সদস্যা— কোন রূপেই সে তেমন কোন সম্মান বা অধিকার পায়নি। তাকে মনে করা হত ইতর প্রাণীর চেয়ে কিছুটা উন্নত অথচ মানুষের চেয়ে কিছুটা নিচু স্তরের জীব। এ-ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতা ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কিন্তু অজ্ঞতা বা বিদ্বেষের আধিক্য কিংবা উপলব্ধির স্বল্পতার কারণে ইসলামের অবস্থানকে বারংবার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখব, ইসলামের আশ্রয়ে নারী কতটা শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। তুলনামূলক চিত্র সব সময় যথার্থ উপলব্ধির জন্য সহায়ক হয়ে থাকে। তাই অন্যান্য সভ্যতা নারীকে কি দিয়েছে এখানে তাও তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় নারী ঃ

প্রাচীন এই সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান, তার সবচেয়ে বড় উৎস হল রাজা হাম্মুরাবীর আইন। এই আইনের বিভিন্ন ধারা থেকে আমরা তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। হাম্মুরাবীর বিধানে পুরুষ ছিল নারীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত এবং বিচারের পূর্ণ এখতিয়ার ছিল তার। এমনকি ঋণ পরিশোধের টাকা সংগ্রহের প্রয়োজনে পুরুষ তার স্ত্রীকে দাসী হিসাবে বিক্রয়ও করতে পারত। স্বামীর সম্মান এবং সন্তানের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য হাম্মুরাবী বিধান দিয়েছিলেন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী এবং তার অপকর্মের সঙ্গীকে একত্রে বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে। অথচ স্বামীর জন্য ব্যভিচারের সুযোগ ছিল অবারিত। সে পতিতা, দাসী কিংবা রক্ষিতার সাথে অবাধে মিলতে পারত। এজন্য তাকে কোন শাস্তির সম্মুখীন হতে হত না। [সূত্রঃ Traditions Encounters. Pp- 45] ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থান একজন মার্কিন ইতিহাসবেত্তা এভাবে তুলে ধরেছেনঃ "ব্যাবিলনীয় আইন স্ত্রীকে আবশ্যিকভাবে স্বামীর সম্পত্তি বিবেচনা করত। যদি কোন স্ত্রী নগরের মধ্যে তার স্বামীর বদনাম কিংবা গুজব রটাতো, তবে তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হত। তাকে একই ভাগ্য বরণ করতে হত তার প্রেমিকের সাথে যদি তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যেত। অথচ স্বামীরা আইনগতভাবে যৌন স্বাধীনতা ভোগ করত।" [সূত্রঃ Western Civilizations. Pp-54]

গ্রীক সভ্যতায় নারী

প্রাচীন গ্রীকরা ছিল যুদ্ধবাজ; যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তারা সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। টিকে থাকার জন্যও তাদেরকে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে। তাই তাদের কাছে যুদ্ধ এবং যোদ্ধার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যুদ্ধই ছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনবোধের নিয়ামক। নারীর প্রতি তাদের যে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গী— তারও কারণ ছিল এই যুদ্ধপ্রিয়তা। কোমলাঙ্গী নারীকে তারা যুদ্ধের অনুপযুক্ত মনে করত। দুর্বল শারীরিক গঠনের জন্য তাদেরকে কৃপার পাত্রী ভাবা হত। বরং বলা যায়, নারীকে নিম্নস্তরের প্রাণী বিবেচনা করা হত। যোদ্ধাপুরুষের পেশীবহুল দেহাবয়ব ছিল তাদের কাছে ঈর্ষনীয় সম্পদ। নারীদেহের প্রতি এই অবজ্ঞা এবং বলিষ্ঠ পুরুষদেহের প্রতি অনুরক্ত হবার কারণে গ্রীসের স্বামীদের মনে তাদের স্ত্রীদের প্রতি সামান্যই আসক্তি থাকত। [সূত্রঃ Western Civilizations. Pp-142] পুরুষদেহের প্রতি যেহেতু তাদের আসক্তি ছিল, সেহেতু বিত্তশালী বয়স্ক পুরুষেরা যৌনসঙ্গী হিসাবে একেকজন কিশোর বা তরুণকে বেছে নিত। গ্রীসের ঐতিহাসিক কাহিনী, কাব্যগ্রন্থ, বিচারের রায় সংক্রান্ত যে-সব দলিল ঐতিহাসিকগণ উদ্ধার করেছেন তা থেকে দেখা যায়, নারীর প্রতি অবহেলা এবং সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ পুরুষ-সমাজে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। [সূত্রঃ The West in the World. Pp-56]

নারীর প্রতি এই সাধারণ অবজ্ঞা সত্ত্বেও পুরুষ তাকে বিয়ে করত— সে শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য এবং ঘর-গেরস্থালি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। একজন নারী মৃত্যুর পূর্ব

www.pathagar.com

পর্যন্ত গড়ে প্রতি দুই-তিন বছর অন্তর অন্তর একটি করে সন্তান জন্ম দিতে থাকত। নারীর প্রতি গ্রীক পুরুষের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এথেন্সের এক বাগ্মী-পুরুষের কথায়ঃ "আমাদেরকে আনন্দ দেবার জন্য রয়েছে পতিতা, প্রতিদিনকার দৈহিক সেবাদানের জন্য রয়েছে রক্ষিতা আর বৈধ সন্তান দেবার জন্য এবং ঘরের বিশ্বস্ত রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে রয়েছে স্ত্রী।" [সূত্রঃ Western Civilizations. Pp-142] উল্লেখ্য, এখানে নারীকে যে তিনটি রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার প্রতিটিই অবমাননাকর।

প্রাচীন গ্রীসে, বিশেষ করে এথেন্সের নগর-রাষ্ট্রে, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। জীবনের প্রতিটি স্তরে কোন না কোন পুরুষের অধীন হয়ে থাকতে হত তাকে। শৈশব-কৈশোরে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং তার মৃত্যুর পরে পুত্রের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে হত তাকে।[সূত্রঃ Traditions Encounters. Pp- 257]

গ্রীক নারীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা বলেছেনঃ "বিবাহে মত দেবার অধিকার কন্যার ছিল না। কনের পিতা বরকে যৌতুক দিত যেন সেই অর্থে মেয়েটির ব্যয়-নির্বাহ করা যায়। আইনগতভাবে স্ত্রী হত তার স্বামীর সম্পত্তি।" [সূত্রঃ Western Civilizations. Pp-142]

রোমান সভ্যতায় নারী

রোমানরাও ছিল গ্রীকদের মত যোদ্ধা জাতি এবং যুদ্ধে পারদর্শিতাই ছিল তাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। এ-জন্য তারাও গ্রীকদের মত নারীকে পুরুষের তুলনায় নীচু স্তরের প্রাণী মনে করত। তাদের পরিবার ব্যবস্থা ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ হত পরিবারের প্রধান। তাকে বলা হত পরিবারের পিতা (patar familias)। পরিবারে নিরঙ্কুশ আইনগত ক্ষমতার (patria potestas) অধিকারী ছিল সে। অধীনস্তদের যে কোন শাস্তি— এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকারও তার ছিল। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক হত পরিবার প্রধান। কোন নারী কিংবা অন্য কোন সদস্যের অধিকার ছিল না সম্পত্তির মালিক হবার। বিয়ের পর এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হত। এবার স্বামী হয়ে বসত নারীর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। স্ত্রীর সম্পত্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যেত স্বামীর মালিকানায়। [সূত্রঃ "ancient Rome. "Encyclopædia Britannica] স্বামী তার প্রয়োজন মেটাতে স্ত্রীকে দাসী হিসাবে বিক্রয় করতে পারত। স্ত্রীকে হত্যা করবার অধিকারও তার ছিল। স্বামীর ক্ষমতা সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক জানাচ্ছেনঃ "আগের কালে রোমের পরিবারের ভিত্তি ছিল স্বামীর অর্থনৈতিক ও আইনগত কর্তৃত্বের উপর যা তাদেরকে প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করেছিল।"[সূত্রঃ Western Civilizations. Pp-195]

নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এই সভ্যতা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করত। পুত্র-সন্তানের জন্মকে স্বাগত জানানো হলেও অনেক সময় কন্যা-সন্তানকে সাদরে বরণ করা হত না। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে বাড়ির বাইরে ফেলে রাখা হত (expose) ধুঁকে মরার জন্য। এ-রকম লোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে এক রোমান সৈনিকের পত্র। গর্ভবতী স্ত্রীকে সে এই

www.pathagar.com

পত্র লিখেছিল যাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পুত্র-সন্তান হলে রেখে দিতে হবে, আর কন্যা সন্তান হলে মরার জন্য বাইরে ফেলে আসতে হবে। [সূত্রঃ The West in the World. Pp- 123]

নর-নারীর খাদ্যাখাদ্য বিচারেও ছিল বৈষম্য। পুরুষদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রত্যেক বেলার আহারের পর মদ পান করা ছিল সাধারণ রীতি। অথচ নারীর জন্য এটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। এই অপরাধে স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যাও করতে পারত এবং এটা ছিল আইনসিদ্ধ। প্রাচীন রোমের বিশিষ্ট পণ্ডিত প্লিনি (২৩-৭৯ খৃঃ) এক মর্মান্তিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার এক নারী মদ রাখবার কুঠুরির চাবি চুরি করেছিল, হয়ত-বা সে মদপানের আকাংখা থেকে এটা করেছিল। এই অপরাধে তার পরিবার তাকে অনাহারে রেখেছিল যতদিন সে মৃত্যুবরণ না করে। সূত্রঃ [The West in the World. Pp-125] এছাড়া, রোমান আইনে মৃতের সম্পত্তিতে পুরুষের উত্তরাধিকার থাকলেও নারী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। [সূত্রঃ Traditions Encounters. Pp- 285]

হিন্দু-ভারতে নারী

হিন্দু সমাজে নারীজন্ম ছিল বড়ই বেদনার। শুধু জননী হিসাবে সন্তানের ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রী ছিল সে। এছাড়া কন্যা, জায়া, ভগ্নী— কোন রূপেই তার ছিল না তেমন কোন সম্মান। নারীকে ইতর প্রাণীর মত মনে করা হত। শাস্ত্রে বলা হচ্ছেঃ নারী, কুকুর, কালো পাখি— এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়; নইলে আলোক ও অন্ধকার, শুভ ও অশুভ সব একাকার হয়ে যাবে।[সূত্রঃ শতপথ ব্রাহ্মণ-১৪ঃ১ঃ১ঃ৩১। উদ্ধৃতঃ ভারত-ইতিহাসে নারী। পৃ- ১৪] আরেকটি ধর্মশাস্ত্র আমাদেরকে বলছে, সর্বগুণে গুণবতী নারীও সবচেয়ে অধম পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট।[সূত্রঃ তৈত্তিরীয় সংহিতা- ৬ঃ৫ঃ৮ঃ২। উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত। পৃ- ১৪] কয়েকটি প্রাণী হত্যার জন্য মাত্র এক দিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এরা হল কালো পাখি, শকুনি, বেজি, ছুঁচো, কুকুর, শূদ্র ও নারী।[সূত্রঃ আপস্তম্ব ধর্মসূত্র-১ঃ৯ঃ২৩ঃ৪৫। উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত। পৃ- ১৪] মৃত্যুর কিছু পূর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেনঃ "নারীর চেয়ে অশুভ আর কিছু নেই, পুত্র, পুরুষের উচিত সর্বদা নারীর প্রতি আসক্তি পরিহার করা।" [সূত্রঃ মহাভারত-১৩ঃ৪৩ঃ২৫। উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত। পৃ- ১৪।

পরিবারে মেয়ে-শিশু ছিল অবাঞ্ছিত। জগতের বুকে প্রথম চোখ মেলে সে কিছু বিষণ্ন মুখ দেখতে পেত। সারাটা জীবনেও এ-সব মুখ আর তার প্রতি প্রসন্ন হত না। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্টই বলা হয়েছে, কন্যা পরিবারে দুঃখ নিয়ে আসেন, পুত্র পরিবারকে রক্ষা করেন। অথর্ববেদে কন্যার জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক বলা হয়েছে। কন্যা তার পিতার বংশধারাকে রক্ষা করতে পারেন না, তিনি তার পিতৃপুরুষকে জলও দিতে পারেন না। কন্যা যা পারেন না, পুত্র অনায়াসে তা সম্পন্ন করতে পারেন।" [সূত্রঃ ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে। পৃ-১২৯] বেদ অনুসারে উত্তম নারী হল সে, যে স্বামীকে প্রসন্ন করে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় ও স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে না। [সূত্রঃ অথর্ববেদ।১১ঃ ৫ঃ ১৮। উদ্ধৃতঃ ভারত-ইতিহাসে নারী। পৃ-১০] নারীর প্রকৃষ্ট কর্তব্য হল পুত্রোৎপাদন করা। [সূত্রঃ

www.pathagar.com

মৈত্রায়নী সংহিতা-১ঃ১০ঃ১১; তৈত্তিরীয় সংহিতা-৬ঃ৫ঃ৮ঃ২ উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত। পৃ-১০] পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে স্বামী অনায়াসেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারত।[সূত্রঃ শতপথ ব্রাহ্মণ-৫ঃ২ঃ৩ঃ১৩। উদ্ধৃত ঃ প্রাগুক্ত] এই ভেদনীতির কারণে অনেক সময় কন্যা-শিশুকে প্রাণ দিয়ে তার নারীজন্মের পাপ মোচন করতে হত। "রাজপুত সমাজে নবজাতা কন্যাকে নুন খাইয়ে কিংবা নাক-মুখের উপর ফুল বা নাড়ি রেখে তাকে হত্যা করা হত। এখনো বহু জাতির মধ্যে কন্যা-বধের প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।" [সূত্রঃ রাহুল সাংকৃত্তায়ন। মানব সমাজ। পৃ-৭০]

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ভারতে নারীর শিক্ষালাভের অধিকার ছিল না। সে-কালে শিক্ষা বলতে বুঝাতো বেদ পাঠ করতে শেখা। এই শিক্ষা শুরু হত উপনয়নের মাধ্যমে। শূদ্র এবং নারীর যেহেতু উপনয়নের অধিকার ছিল না, সেহেতু তাদেরকে নিরক্ষর থাকতে হত। [সূত্রঃ ভারত-ইতিহাসে নারী।পৃ-৩] তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে এভাবেঃ "প্রিয়ঃ সতীৎ তা উ যে পুংস আহুঃ।" [সূত্রঃ ১ঃ ১১ঃ ৪] অর্থাৎ- শিক্ষিত নারী তো পুরুষই। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে, নারীর ক্ষেত্রে বিবাহই হল উপনয়ন, স্বামীর সেবা হল বেদপাঠ আর স্বামীর ঘরে বাস করাই হল গুরুগৃহে বাস করা।[সূত্রঃ ২ঃ৬৭] এর অর্থ, স্বামী ও তার স্বজনদের সেবা হল শিক্ষার বিকল্প; সত্যিকারের শিক্ষার তার কোনই প্রয়োজন নেই।[সূত্রঃ ভারত-ইতিহাসে নারী। পৃ-৩]

হিন্দু ধর্মে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাকে কোন না কোন পুরুষের অধীনে থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে মনুর নির্দেশ হলঃ "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" অর্থাৎ- নারীর স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। [সূত্রঃ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। নারীর পথে। পৃ-১৬] । একই কথা বশিষ্ট সংহিতায় বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আরো এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে, পিতা, স্বামী বা পুত্র কেউ যার নেই, তেমন নারী তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর পুরুষদের অধীনা হবে, তবু তার স্বাধীন সত্তা কিছুতেই কাম্য নয়। [উদ্ধৃতঃ নারীর পথে। পৃ-১৬] "কিন্তু ভারতবর্ষে এই অ-স্বতন্ত্রতা যে কত উৎকট হয়ে উঠেছিল, এখন সে কথাই বলতে হয়। গুপ্তযুগ শেষ হবার পর ভারতীয় সমাজ তার স্ত্রী জাতির জন্য সহমরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল— এই প্রথানুসারে মৃত পতির শবের সঙ্গে প্রত্যেক স্ত্রীর পুড়ে মরা অনিবার্য বলে নির্দিষ্ট হয়। মাত্র শতাধিক বছর আগে ইংরেজ সরকারের সাহায্যে এই ক্রুর প্রথা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এর আগে পনর শত বছর ধরে এই হত্যা-যজ্ঞ ভারতবর্ষে বাধাহীনভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।" [সূত্রঃ রাহুল সাংকৃত্তায়ণ। মানব সমাজ। পৃ-১২৬]

হিন্দুধর্মে স্ত্রীর চোখে স্বামী হল দেবতা। তার সেবা করাই স্ত্রীর ধর্ম। এতেই তার মুক্তি, এতে স্বর্গলাভ। বিষ্ণু বলেছেন-

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।

পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে।।" [বিষ্ণু সংহিতা-২৫ঃ১৫]

অর্থ- স্ত্রীদের পৃথক যজ্ঞ বা ব্রত ইত্যাদি কিছুই নাই। পতির শুশ্রূষা দ্বারাই তারা সর্বপ্রকার সুখের অধিকারী হয়ে থাকে।[উদ্ধৃত- নারীর পথে]

www.pathagar.com

স্বামীর এই দেবত্ব হল প্রশ্নাতীত। এমনকি স্বামী যদি শয়তানও হয়, তবু তাকে ভগবানজ্ঞানে সেবা করা স্ত্রীর পরম কর্তব্য। শাস্ত্র বলে-
“স্ত্রীভিঃ ভর্তৃবচঃ কার্য্যমেব ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
আ শুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতক দূষিতঃ।।”
অর্থাৎ- স্ত্রীদের স্বামীর বাক্যই পালনীয়-- এটাই তাদের পরম ধর্ম। স্বামী মহাপাপী-দূষিত হলেও তার শুদ্ধির আশায় বহুকাল পর্যন্ত প্রতিক্ষা করা বিধেয়।[যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা- ১ঃ৭৭। উদ্ধৃত- নারীর পথে]
স্বামীকে বার বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীর সামনে তার আহার করা চলবে না।[শতপথ ব্রাহ্মণ- ১ঃ৯ঃ২ঃ২; ৩ঃ৪ঃ২২; ৫ঃ২ঃ১-১০; ১০ঃ৫ঃ২ঃ৯। উদ্ধৃত- ভারত-ইতিহাসে নারী। পৃ-১০] খাওয়া শেষ করে স্বামী কি করবে তা-ও পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছেঃ “ভুক্তা উচ্ছিষ্টং বধৈব দদ্যাৎ।” অর্থাৎ- স্বামী আহার করে উচ্ছিষ্টটা স্ত্রীকে দেবে।[সূত্রঃ খাদিরসূত্র- ১ঃ৪ঃ১১। উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত। পৃ-১০]
স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। সে স্ত্রীকে বিক্রয় করতে পারত, বন্ধক রাখতে পারত, অন্যকে উপহার দিতে পারত— তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারত। আর বন্ধু বা অতিথির সন্তুষ্টির জন্য নিজের স্ত্রীকে তাদের হাতে তুলে দেবার ঘটনা বৈদিক যুগে দুর্লভ ছিল না। এমনকি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও এটা করেছেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামতের কোনই মূল্য ছিল না। “যুবনাশ্ব তাঁর প্রিয় পত্নীকে দান করে স্বর্গলাভ করেছিলেন; মিত্রসহ বশিষ্টকে আপন পত্নী দময়ন্তীকে উপভোগ করতে দিয়ে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। সুদর্শন অতিথি সেবায় নিজপত্নী অর্পন করে অমর কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন।” [সূত্রঃ রাহুল সাংকৃত্তায়ণ। মানব সমাজ। পৃ-৭৫]

ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মে নারী

এই দুটি ধর্মের কথা একত্রে আলোচনার কারণ প্রথমেই ব্যাখ্যা করা দরকার। বণী ইসরাঈলের ইতিহাস-ঐতিহ্য এই দুই ধর্মই তাদের সম্পদ বলে দাবী করে। তাছাড়া, ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের পুরাতন নিয়মকে (The Old Testament) খৃস্টানরা তাদেরও পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাদের ধর্মীয় রচনা-আলোচনা কদাচিৎ পুরাতন নিয়মকে বাদ দিয়ে হয়ে থাকে।
যাহোক, এই দুই ধর্মে নারীকে তেমন মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং তাকে পাপের উৎস বা জননী মনে করা হয়েছে। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (The Old Testament) আমাদেরকে বলছে, বেহেশ্ত থেকে বিতাড়িত হবার পরে শয়তান সাপের রূপ ধরে আবার সেই উদ্যানে প্রবেশ করে এবং মা হাওয়াকে গন্দম ফল খেতে প্রলুব্ধ করে। মা হাওয়া পাপকর্মটা করার পর বাবা আদমকে তাতে প্ররোচিত করেন। অতএব, আদিপাপ (Original Sin) যা মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে বেড়াচ্ছে, তার জন্য দায়ী হল নারী। [সূত্রঃ পয়দায়েশঃ ৩ঃ১২] বাইবেলের নতুন নিয়মে (The New Testament) জোর দিয়ে বলা হয়েছেঃ “আদম ছলনায় ভুলে নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে ভুলেছিল এবং খোদার হুকুম অমান্য করেছিল।"[সূত্রঃ ১ তীমথিয়-২ঃ ১৪][১] বাইবেল অনুসারে, খোদা আদিপাপ করার জন্য হাওয়া এবং তার মধ্যদিয়ে নারীজাতিকে অভিশাপ দিয়েছেন, তাদেরকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে— গর্ভকালীন কষ্ট এবং প্রসবকালীন কষ্ট। [সূত্রঃ পয়দায়েশঃ ৩ঃ১৬][২]

বাইবেল সাধারণভাবে নারীর উপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। বলা হয়েছে, যীশুর উপর যেমন মহান খোদার শ্রেষ্ঠত্ব, সকল পুরুষের উপর যেমন যীশুর শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনিভাবে নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব। [সূত্রঃ ১ করিন্থীয়-১১ঃ৩] শুধু তাই নয়, দাবী করা হয়েছে, পুরুষের জন্যই নারীর সৃষ্টি। ঘোষণা করা হয়েছেঃ "পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে আসেনি কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে এসেছে। স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে।" [সূত্রঃ ১ করিন্থীয়-১১ঃ৮-৯] এই একই যুক্তি দিয়ে বাইবেল নারীর কণ্ঠরোধ করেছে। তাকে সম্পূর্ণ বাধ্য থাকতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে, কারণ তার সৃষ্টি আদমের পরে। [সূত্রঃ ১ তীমথিয়-২ঃ১১] পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য আরেকটা যুক্তি প্রদান করা হয়। নারী পুরুষের তুলনায় বেশি মাংশল। অতএব তাকে পুরুষের অধীন থাকা উচিত । কারণ দেহ হল আত্মার অধীন। [সূত্রঃ ইফিষীয়-৫ঃ২১-৩৩]

খৃস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে এক মার্কিন ঐতিহাসিক বলেনঃ "স্ত্রী হিসাবে নারীর নিকট প্রত্যাশা করা হত যে, তারা কোন পেশা অবলম্বন করবে না এবং শিক্ষিতা এমনকি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নও হবে না। ভবিষ্যতে যদিও তারা পারলৌকিক মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী ছিল, দৈনন্দিন ইহলৌকিক ব্যাপারগুলোয় তাদেরকে নিম্নতর পর্যায়ের মনে করা হত, এটা এমন আচরণ যা আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত টিকে ছিল।"[সূত্রঃ Western Civilizations. Pp-232]

বাইবেল শুধু নারীর আত্মাকেই পাপ-প্রবণ এবং নিকৃষ্টতর হিসাবে উপস্থাপন করেনি, তার দৈহিক শূচিতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ইহুদীরা নারীকে আনুষ্ঠানিক উপাসনা থেকে বাদ দিয়েছে এই কারণে যে, প্রতি মাসে কিছু দিন তারা অশূচি থাকে। তাছাড়া, সন্তান জন্মের পরও তারা অপরিস্কার থাকে। মাসিক ঋতুস্রাব চলাকালীন নারীর বিধান সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়, স্রাবরতা নারীকে অস্পৃশ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি কেউ তাকে স্পর্শ করে, সে-ও

---

১. এই একই ঘটনা কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে মা হাওয়াকে এককভাবে দায়ী করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, তাঁরা দুজনেই অপরাধ করেছিলেন, তাঁরা দুজনেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন, আর তাদের দুজনকেই ক্ষমা করা হয়েছিল। আল কুরআন- ২ঃ ৩৬-৩৭; ৭ঃ ২০-২৪।

২. আরেকবার ইসলামের শিক্ষার সাথে এটার তুলনা করুন। ইসলাম গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবকে শাস্তি বিবেচনা করে না। বরং এতে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সন্তানের মনে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসব করেছেন। [আল কুরআন- ৩১ঃ ১৪-১৫। তাছাড়া, হাদীসে গর্ভাবস্থাকে জিহাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সন্তান প্রসবকালে কোন নারী মারা গেলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে।

www.pathagar.com

নাপাক হয়ে যাবে। এমনকি তার ব্যবহৃত পোশাক, বিছানা কিংবা আসন যদি কেউ স্পর্শ করে, তাহলে সে নাপাক হয়ে যাবে। এই স্পর্শকারী ব্যক্তিকে গোসল করতে হবে, পোশাক ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপরও সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশূচি থাকবে। [সূত্রঃ লেবীয়-১৫ঃ ১৯-৩০][৩]

নারীর এই অশূচিতার ক্ষেত্রেও বাইবেল লিঙ্গবৈষম্য সৃষ্টি করেছে। সন্তান জন্মদানের পর কিছুকাল প্রসূতি অশূচি থাকে। বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই সময়কাল নিয়ে। যদি নবজাতক পুত্র হয়, তবে প্রসূতি অশুচি থাকবে চল্লিশ দিন, আর কন্যা-সন্তানের জন্ম দিলে এই অপবিত্রতা থাকবে দ্বিগুণ সময় অর্থাৎ আশি দিন।[সূত্রঃ ডঃ জামাল বাদাবী। ইসলামী শিক্ষা সিরিজ। পৃ-৩০৬। দি ইনসটিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা][৪]

ধর্ষণের শাস্তি বিধান করতে গিয়ে বাইবেল নারীত্বকে অপমান করেছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি কোন অবিবাহিতা নারীকে নির্জনে পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে, তবে মেয়েটির পিতাকে ধর্ষক আধা কেজি রূপা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেবে আর মেয়েটিকে যেহেতু নষ্ট করেছে, সেহেতু তাকে বিয়ে করবে। কোনদিন সে তাকে তালাক দিতে পারবে না। [সূত্রঃ দ্বিতীয় বিবরণ-২২ঃ২৮-২৯] এটা অনেক সময় ধর্ষকের জন্য শাস্তি না হয়ে পুরস্কারস্বরূপ হবে, বিশেষকরে সে যদি উক্ত নারীর উপযুক্ত পাত্র না হয়। এতে ধর্ষণ উৎসাহিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। রূপ, গুণ আর ঐশ্বর্যের অধিকারী নারীকে স্ত্রী হিসাবে পাবার জন্য অনেক দুর্বৃত্ত এই পাপাচারের পথ বেছে নেবে। তাছাড়া, এক অসহায় নারীকে এমন এক পাপিষ্ঠের সাথে আজীবন কাটাতে বাধ্য করা হচ্ছে, যার প্রতি তার ঘৃণা হয়ত কখনোই শেষ হবে না।

ইসলামপূর্ব আরবে নারী

ইসলামপূর্ব আরবে নারীর আক্ষরিক অর্থেই কোন মর্যাদা ছিল না। কি কন্যা, কি জায়া, কি জননী- সকল রূপেই তাকে অবমাননাকর অস্তিত্ব বয়ে বেড়াতে হত। তার জীবন, সম্মান, সম্পদ- কোন কিছুরই নিরাপত্তা ছিল না। পরিবারে কন্যা-সন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হত। এই দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচার জন্য অনেক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন লোক নিজ কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। যাদের জীবন দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেঁচে যেত, তাদের অদৃষ্টে জমা হয়ে থাকত অনেক দুঃখ, কষ্ট, অপমান। স্বামীর ঘরে দাসী-বাঁদীর চেয়ে ভাল ব্যবহার তাদের ভাগ্যে জুটত না। সম্পদে

---

৩. ঋতুস্রাব চলাকালীন নারীকে ইসলামে অস্পৃশ্য মনে করা হয় না। বরং এটা হল সাময়িক নাপাকী এবং অসুস্থতা। নাপাকী মনে করা হয় এই কারণে যে, মল-মূত্রের মত ঋতুস্রাবও শরীরের মধ্যে উৎপন্ন বর্জ্য (waste product)। আর অসুস্থতার ব্যাপারটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুপ্রমাণিত। যাহোক, এসময় নারীর জন্য নামায-রোজার বিধান নেই। তবে তাকে স্পর্শ করতে কোন বাধা নেই। মহানবী (সাঃ) তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীর গায়ে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন- এমন নজিরও রয়েছে।

৪. এতদ্‌সংক্রান্ত ইসলামী বিধানে এই বৈষম্য নেই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর- তা সে পুত্রই হোক আর কন্যাই হোক- প্রসূতিকে চল্লিশ দিন সময় দেওয়া হয়েছে সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য।

www.pathagar.com

তাদের কোন উত্তরাধিকার ছিল না। বরং সন্তানেরা পিতার মৃত্যুতে সৎমায়েদেরকে উত্তরাধিকারসূত্রে অন্যান্য সম্পত্তির সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী

পাশ্চাত্য সভ্যতা সম-অধিকারের আকর্ষণীয় মোড়কে নারীকে উপহার দিয়েছে বিরাট প্রবঞ্চনা। নারী-পুরুষের মধ্যে স্বভাব-প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য থাকতে পারে- এই ধারণাকে তারা উড়িয়ে দিয়েছে। নারী আজ পুরুষ হয়ে উঠতে ব্যাকুল। এখানেই তার প্রথম পরাজয়। পরাজিত মানসিকতা অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে। পুরুষের অনুকরণ করতে গিয়ে আজ নারী নিজেকে সহজলভ্য করে তুলেছে। স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে, বীচে-বাজারে-বারে- সর্বত্র তারা পুরুষের সংস্পর্শে আসছে, আর পুরুষ এ-সুযোগ লুফে নিচ্ছে। নারীদেহ ভোগের মহোৎসবে মেতেছে পাশ্চাত্যের চতুর পুরুষ। আধুনিক 'নারীমুক্তিকামী' হয়ত বলবেনঃ 'বিষয়টা অন্যভাবেও দেখা যায়। এ-হল লাইফকে এনজয় করা; আর মিলনের প্রক্রিয়ায় নারী বরং পুরুষের চেয়ে বেশি এনজয় করে থাকে।' এরা ভুলে যান যে, ভোগ যদিও-বা পুরুষের সাথে সাথে নারীও করে, দুর্ভোগ কিন্তু নারীকে একাই পোহাতে হয়। প্রতি বছর পাশ্চাত্যে বিপুল সংখ্যক কিশোরী-তরুণী অযাচিতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। "১৯৭০ এর দশক থেকে শুধু আমেরিকাতেই প্রতি বছর দশ লক্ষের বেশি অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের ঘটনা ঘটে থাকে।. . . এই তারুণ্যে গর্ভধারণের মহামারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য দুর্দশার এক অবিরাম উৎসে পরিণত হয়েছে।" [সূত্রঃ Social Psychology : Understanding Human Interaction. pp-328] এ-সব কুমারী মাতারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গর্ভপাত করছে। আমেরিকায় ১৯৯৬ সালে ১৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শ ৩০ টি গর্ভপাত ঘটানো হয়। [সূত্রঃ The World Almanac-2002. pp-88] ইউরোপীয় সভ্যতার মশালবাহী ইংল্যান্ডে ২০০৬ সালে ১,৯৩,৭০০ টি গর্ভপাত ঘটানো হয়। [সূত্রঃ Abortion Statistics, England and Wales: 2006]

এ-ছাড়া, পশ্চিমা নারীর ভাগ্যে রয়েছে যৌনরোগের দুর্ভোগ। চিকিৎসা-বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, পুরুষের তুলনায় নারীর যৌন রোগে আক্রান্ত হবার আশংকা বহুগুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৫ থেকে ১৯ বছরের তরুণীদের মধ্যে সমবয়সী তরুণদের তুলনায় ক্ল্যামাইডিয়া ৬ গুণ বেশি আর গনোরিয়া বেশি দ্বিগুণ। আমরা জানি, এইডস সবচেয়ে বেশি ছড়ায় যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এই মরণ-ব্যাধি নারী থেকে পুরুষে যত সংক্রমিত হয়, পুরুষ থেকে নারীতে হয় তার ১৭ গুণ। এই কারণে পৃথিবীর যে কোন দেশে পুরুষের তুলনায় নারীর এইডসে আক্রান্ত হবার সংখ্যা অনেক বেশি। যেমন, ব্রাজিলে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে নারীদের মধ্যে এইডস রোগী বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি, অথচ পুরুষদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১০ ভাগের একটু বেশি। [সূত্রঃ A New Psychology of Women. pp-297-298] অতএব দেখা যাচ্ছে, পুরুষ নারীকে লাইফ এনজয় করতে প্রলুব্ধ করছে। তারপর সে নিজে নিঃসংকোচে এনজয় করে সরে

www.pathagar.com

পড়ছে। নারীকে একা ভোগ করতে হচ্ছে যত দুর্ভোগ। তার একার জন্য যন্ত্রণাদায়ক ক্ল্যামাইডিয়া-গনোরিয়া-ওয়ার্টস ইত্যাদি যৌনরোগ, কষ্টদায়ক গর্ভধারণ। তার একার জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত, প্রাণঘাতী এইডস।

নারীদেহ ভোগের এই বাধাহীন মহোৎসবেও কিন্তু পুরুষ তৃপ্ত নয়। সে দুর্বল নারীকে সুযোগ পেলেই বলাৎকার করছে। পুরুষ বারবার নারীকে বলছে বটে, তুমি দুর্বল নও, অবলা নও, কিন্তু সে যখন বল প্রয়োগ করে, তখন এই আশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত হয়; নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার শিরোমণি আমেরিকায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। NCVS [National Crime Victimization Survey] এর দেওয়া তথ্যমতে, ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌননিপীড়ন এর ঘটনা ঘটে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার। আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ লক্ষ (অর্থাৎ গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে একটি) [সূত্রঃ "rape".The Encarta Encyclopaedia.] । সম্পর্ক বাঁচানোর জন্য বন্ধুর, চাকুরী বাঁচানোর জন্য কর্মকর্তার, আশ্রয় বাঁচানোর জন্য সৎপিতার এবং জীবন বাঁচানোর জন্য দুর্বৃত্তের যৌন নিপীড়ন তাকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়।

নারীর উপরে পাশ্চাত্যের আরেকটা বড় জুলুম হল, এই সভ্যতা নারীর শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন কেড়ে নিয়েছে। যে মাতৃত্বে নারীজন্মের সার্থকতা, যার জন্য নারীর চরম ব্যাকুলতা- তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। তার গর্ভাশয় পরবর্তী প্রজন্মকে ধারণ করতে প্রস্তুত, তার স্তনযুগল প্রস্তুত যার পুষ্টিদানে, হৃদয়ের স্নেহ-মমতা প্রস্তুত যার মনের বিকাশ সাধনে-তাকে আজ পশ্চিমা নারী কোলে ধারণ করতে আগ্রহী নয়। তার সামনে যে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ! তাকে পুরুষের মত হয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। তাকে উপার্জন করতে হবে, কেরিয়ার বিল্ডআপ করতে হবে। সন্তানের জন্ম, লালন-পালন এ-পথে বড় বাধা। অতএব, পশ্চিমা নারী আজ এ-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে চাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজ টাকা-পয়সা নামক দেবতার বেদীতে সব কিছু বলি দিতে প্রস্তুত। নারীকেও বলি দিতে তারা দ্বিধা করেনি। তারা দুর্বল নারীর উপরে পুরুষের দ্বিগুণ কাজের দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। একদিকে স্বামী-সন্তানের পরিচর্যা, গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ, অন্য দিকে অফিসে পুরুষের সমপরিমাণ কাজের বাড়তি বোঝা। পুরুষের কর্মক্ষেত্র শুধুই বাইরে; অথচ নারীকে ঘর সামলে আবার বাইরে ছুটতে হয় পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে। কী করুণ এ-সব নারীর জীবন! কানাডীয় সমাজবিজ্ঞানী রেজিনাল্ড বিবি এবং ডোনাল্ড পস্টারস্কি নারীর এই করুণ চিত্র এ-ভাবে তুলে ধরেছেন-

"এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ খুব কমই রয়েছে যে, পেশাজীবী মায়ের কাছে বহুমুখী দাবী তাকে বড় চাপের মধ্যে ফেলে দেয়। . . . যে-সব নারী দিনে দ্বিগুণ কাজ করে, তাদেরকে অসাধারণ ভারি বোঝা বহন করতে হয়, এবং যে মূল্য তাদেরকে দিতে হয় তা বিপুল। তারা দীর্ঘ সময় কাজ করে এবং আসলেই কোন অবসর পায় না। তারা উচ্চ মাত্রার চাপের শিকার হয়।" (Teen Trends. p-152)

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

ইসলামে নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে একটি কথা পরিস্কার হওয়া দরকার। কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে দিয়ে সে-ধর্মের বিচার করা সংগত নয়, বরং সেই ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ এবং তার প্রবর্তকের কর্মকাণ্ড দিয়ে তাকে বিচার করা উচিত। কাজেই ইসলামে নারীর মর্যাদা নির্ণয় করতে গিয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রচলিত রীতি বা প্রথা বিবেচ্য নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর বাণী বা বিধানকেই বিবেচনা করতে হবে। কারণ, ইসলামের মূল উৎস এই দু'টি এবং এগুলির সাথে যা সাংঘর্ষিক তা যত পবিত্র উৎস থেকেই আসুক, মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা দেখব, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীকে কতটা মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম।

নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা

ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ১৭/১৮ বছরের তরুণ, তখনো খৃস্টান সমাজে বিতর্ক চলছিল নারীর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে। তার কি আত্মা আছে? তাকে কি মানুষ বলা চলে? এসব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক চলছিল পাদ্রীদের মধ্যে। এ-দিকে প্রাচ্যে ভারতীয় সভ্যতা নারীর পারলৌকিক মুক্তির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল- তাকে ধর্মশাস্ত্র পাঠ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছিল।

এ রকম সময়ে ইসলাম এগিয়ে এসেছিল নারীকে মুক্তির পথ দেখাতে, তার আত্মিক উন্নতির উপায় বাৎলে দিতে। দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরে চলে আসা কলঙ্কের কালিমা প্রথমেই ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়া হল যেন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস আসে, হীনমন্যতা দূর হয়। তাকে বলা হল, হে নারী! আদি পাপ বলে কিছু নেই। ভুল যা হয়েছে, তা প্রথম নারী এবং প্রথম পুরুষ দুজনেরই হয়েছে। তাঁরা দুজনই এজন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের দুজনকেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল।[সূত্রঃ আল কুরআন- ২ঃ ৩৬-৩৭; ৭ঃ ২০-২৪] তাঁদের ভুলের জন্য আর কাউকে দায়ী করা হবে না। আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেনঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে।" [সূত্রঃ আল কুরআন-৭৪ঃ ৩৮] এভাবে ইসলাম নারীর আত্মার কালিমা প্রথমেই দূর করে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নারীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার আত্মিক উন্নতির সুযোগ পুরুষের সমান। আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ "নারী হোক আর পুরুষ হোক, তিনি কারো আমল বিনষ্ট করেন না। তোমরা একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"[সূত্রঃ সূরা আলে ইমরান। আয়াত- ১৯৫] এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কর্মফল প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ নারীর প্রতি কোনরূপ বৈষম্য করবেন না।

এরপর আসে পারলৌকিক মুক্তির প্রসঙ্গ। যেসব পুণ্যকর্ম করলে পরকালে মুক্তি অর্জন করা যাবে, আল্লাহ্ সেসবের তালিকা পেশ করেছেন। এখানেও আমরা সমতার সুস্পষ্ট চিত্র দেখতে পাই। যেসব কাজে পুরুষের মুক্তি, নারীর মুক্তিও ঠিক সেসব কাজেই। আল কুরআন ঘোষণা করছে-

আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পনকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, দৃঢ় পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী,

www.pathagar.com

সৎ পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী- এদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রদান করবেন।[সূত্রঃ আল কুরআন-৩৩ঃ ৩৫]

আত্মিক উন্নতির জন্য যেসব আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, তার নিয়ম-নীতিও নর-নারীর জন্য একই রকম। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ যথা ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ- এগুলি একই নিয়মে নর-নারীকে পালন করতে হয়।

নারীর ইমামতি সংক্রান্ত অভিযোগের পর্যালোচনা

কখনো বা প্রশ্ন করা হয়, সালাতে নারী ইমামতি করতে পারে না কেন? কেনই-বা তাকে পিছনের কাতারে স্থান দেওয়া হয়? এর কারণ অনুধাবন করা খুব কঠিন নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'সালাত হল বিশ্বাসীদের জন্য মিরাজ তথা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়া।' তিনি আরো বলেছেনঃ 'এমনভাবে সালাত আদায় কর যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখছ। যদি তা নাও পারো, তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।' কাজেই সালাতে পূর্ণ একাগ্রতা ও ভক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি নিশ্চিত করার জন্য নারীকে ইমামতি, পুরুষের সামনে বা পাশে দাঁড়ানোর অনুমতি প্রদান করা হয়নি। সালাতে রুকু-সিজদার মত কিছু কাজ আছে যা সামনের নারী যদি করে, তাহলে পেছনের পুরুষের পক্ষে একাগ্রতা বজায় রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। 'উপাসনা করতে এসে আবার মনে কু-চিন্তা কেন আসবে'— এই ধরণের স্বভাব-প্রকৃতি বিরুদ্ধ দাবী ইসলাম কখনো করে না। বরং প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই সকল ইসলামী বিধান প্রণীত হয়েছে। যারা ঐ ধরণের উচ্চ আদর্শের কথা বলেন, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হবার কারণে সেই আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন না। ফলে তাদের উপাসনালয়ে যৌন অনাচার অনুপ্রবেশ করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নারীর ইমাম হতে বাধা থাকলেও ধর্মীয় শিক্ষক হতে কোন বাধা নেই। নবীপত্নী হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর কাছ থেকে অনেক লোক হাদীস শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেছেন।

নারীর নবুওয়াত সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসা

প্রশ্ন করা হয়, আধ্যাত্মিকভাবে নারী যদি পুরুষের সমান হয়, তবে নারীদের মধ্য থেকে কোন নবী বা রাসূল কেন প্রেরণ করা হয়নি? এটিও অনুধাবন করতে খুব কষ্ট হবার কথা নয়। যাহোক, এখানে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

নবী-রাসূলদেরকে সত্যের দাওয়াত নিয়ে পথে, ঘাটে, হাটে সবখানে দিনে রাতে সব সময় ছুটে বেড়াতে হত। মানুষকে বুঝানোর জন্য একাকী তাদের সাথে সাক্ষাত করতে হত দিনের পর দিন। এভাবে পুরুষ-সমাজে অবাধ বিচরণের এবং নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ ইসলাম নারীকে দেয়নি। কারণ, এটা অসংখ্য সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়। (পর্দা সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

নবুওয়াতের দায়িত্ব মোটেই সহজ-সাধ্য ছিল না। বরং এ ছিল খুব বিপদ-সংকুল এক পথ যার প্রতিটি বাঁকে থাকত প্রাণঘাতী বিপদের আশংকা। প্রায় সকল নবী-রাসূলকে অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। পলাতক হিসাবে অনেকে খোলা আকাশের নিচে,

www.pathagar.com

জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় রাত্রি যাপন করেছেন। বহুসংখ্যক নবী-রাসূলকে হত্যা করা হয়েছে। ইসলাম মনে করে, ইজ্জত ও জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে এভাবে কাজ করা নারীর জন্য কাম্য নয়।

নবুওয়াতের দায়িত্ব ছিল বিশাল এবং সার্বক্ষণিক ব্যস্ততাপূর্ণ। আল্লাহ্ সেই সব জাতির নিকট নবী পাঠাতেন, যারা পথভ্রষ্ট হত, অধঃপতিত হত। আপন জাতিকে অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উঠিয়ে আনাই ছিল নবী-রাসূলের কাজ। এ-জন্য তাঁদেরকে সর্বক্ষণ ছুটে বেড়াতে হত মানুষের দ্বারে দ্বারে। দিনের পর দিন তাদেরকে বুঝাতে হত, সংগঠিত করতে হত। এটি ছিল সার্বক্ষণিক কাজ (full-time duty)। নারীকে এ দায়িত্ব দিলে বড় জোর খণ্ডকালীন দায়িত্ব (part-time duty)হিসাবে দিতে হত। কারণ, পরিবার ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব ইসলাম নারীর উপর অর্পন করেছে। এমতাবস্থায় তার পক্ষে কি পরিবারের দায়িত্ব, কি নবুওয়াতের মিশন- কোনটিই সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হত না। তাছাড়া, ঋতুস্রাবকালীন প্রতি মাসে চার-পাঁচ দিন নারীর পক্ষে আনুষ্ঠানিক ইবাদাত পরিচালনা সম্ভব হত না। সর্বোপরি, গর্ভসঞ্চার এবং সন্তান প্রসবের কারণে দীর্ঘকাল নারীর পক্ষে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন সম্ভব হত না। সন্তান জন্মের পরও একই সাথে মায়ের এবং নবীর দায়িত্ব পালন করা নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে, একজন পুরুষের পক্ষে নবুওয়াতের চরম ঝুঁকিপূর্ণ গুরুদায়িত্ব নারীকে না দিলেও ইসলাম তাকে অতীব উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে কসুর করেনি। কুরআনে ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া (রা)-এর আল্লাহ্-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট আল্লাহ্ জিব্রাঈল ফেরেশতাকে পাঠিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মারইয়াম (আ)-কে জান্নাতী খাবার দেওয়া হত, যে সৌভাগ্য খুব কম নবী-রাসূলেরই হয়েছিল। এছাড়া আমরা হাদীস শরিফের মাধ্যমে জানতে পারি, হযরত খাদিজা (রা)-কে স্বয়ং আল্লাহ্ সালাম প্রদান করেছেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট থেকে অনেক সাহাবী কুরআন-হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও অনেক মহীয়সী নারী সমসাময়িক অনেক পুরুষ তাপসের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। আসলে আত্মিক উন্নতির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে নারী হওয়াটা কোন বাধা নয়।

পারিবারিক জীবনে নারী

পরিবারে আমরা নারীকে মূলতঃ তিনটি রূপে দেখি- কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং জননী হিসাবে। এখানে আমরা দেখব, ইসলাম নারীকে কোন্ রূপে কতটা মর্যাদা দিয়েছে।

ক) কন্যা হিসাবে নারী

আমরা দেখেছি, শত শত বছর ধরে নানা সভ্যতায় কন্যা সন্তানের প্রতি কত অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। এই অমানবিকতার অবসান ঘটাতে সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছে ইসলাম। মানুষের অন্তরপট থেকে এই ঘৃণ্য মনোবৃত্তি মুছে ফেলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার বিশ্বাসের সংস্কার সাধনের জন্য আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন-

৫—

www.pathagar.com

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুখবর দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোকষ্টে ভুগতে থাকে। তাকে যে খবর দেওয়া হয় তার গ্লানির জন্য সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! সে যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট।" [সূত্রঃ আল কুরআন- ১৬ঃ ৫৭-৫৯]

লক্ষ্যনীয়, কুরআনের এই আয়াতে কন্যা সন্তানের জন্মের খবরকে 'সুখবর' এবং তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্তকে খুবই 'নিকৃষ্ট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, কুরআনের এই প্রভাব বিশ্বাসীদের উপরে ছিল অপরিসীম।

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "(শেষ বিচারের দিন) জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে প্রশ্ন করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।" [সূরা আত্ তাকভীর ঃ আয়াত-৯]

শত শত বছরের লাঞ্ছনার স্তুপ সরিয়ে মেয়ে-শিশুকে মানবতার পুণ্যালোকে প্রতিষ্ঠা করতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও অনেক উৎসাহ-ব্যঞ্জক বাণী দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যার প্রথম সন্তান কন্যা।" [সূত্রঃ সম্পাদনা পরিষদ। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম। পৃ-১৩২]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ "যার তত্ত্বাবধানে কোন শিশু কন্যা থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং পুত্রদেরকে তার উপর প্রাধান্য না দেয়, আল্লাহ্ তালা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"[সূত্রঃ সহীহ্ আবু দাউদ]

আমরা দেখলাম, কন্যা-সন্তানের জন্মকে অপমানজনক মনে করার প্রবণতাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঠিক বিপরীত ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন। তিনি এটিকে সৌভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি নির্দেশ দেন, পুত্রকে কন্যার উপর প্রাধান্য দেওয়া চলবে না।

হযরত আনাস (রা) এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার এক ব্যক্তি রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসা ছিল। এ সময় তার পুত্র সন্তান তার কাছে এলো। সে তাকে চুমু দিল এবং কোলে তুলে নিল। এরপর তার কন্যা সন্তান এলো এবং সে তাকে সামনে বসিয়ে দিল। কন্যার প্রতি লোকটার এই অবহেলা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরকে ব্যথিত করল। তিনি বললেন, 'তুমি এদের উভয়ের সাথে একই রকম ব্যবহার করলে না কেন?' [সূত্রঃ দৈনন্দি জীবনে ইসলাম। পৃ-১৩০]

কন্যা প্রতিপালনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামাতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এ রকম একত্র থাকব।" তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। [সূত্রঃ রিয়াদুস সালেহীন]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে কখনো এমনটি হয়নি যে, তিনি যা বলেছেন নিজে তা করেননি; কন্যার গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে সত্য।

www.pathagar.com

আপন কন্যাদেরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেনঃ "কথা-বার্তায়, চলনে-বলনে হযরত ফাতিমার চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বেশি সাদৃশ্য আমি আর কারো দেখিনি। যখন তিনি (ফাতিমা) তাঁর কাছে আসতেন, তখন তিনি তাঁর দিকে ছুটে যেতেন। তাঁকে খোশ আমদেদ জানাতেন, তাকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের বসার স্থানে বসিয়ে দিতেন।"[সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হল কন্যা-সন্তানের মতামতের গুরুত্ব প্রদান। ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, আধুনিক কালের আগে কোন সভ্যতাই কনের মতামতকে বিয়ের জন্য প্রয়োজন মনে করেনি। বরং বিয়েটা ছিল কর্তৃত্ব বদল— পিতা তার কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করে স্বামীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধীনে অর্পন করত তার মেয়েকে। অথচ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কনের মতামত শুধু প্রয়োজনই না, অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। তার সম্মতি ছাড়া বিয়ের কোন বৈধতা থাকে না। তিনি বলেনঃ

"বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে দেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তার মত নেওয়া হবে। আর কুমারীকেও বিয়ে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না তার অনুমতি নেওয়া হয়। আর তার নীরবতাই অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে।" [সূত্রঃ সহীহ্ ইবনে মাজাহ্]

বুরাইদা (রা) এক দিনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। জনৈকা মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'আমার পিতা আমাকে তার ভাতিজার কাছে বিয়ে দিয়েছে যাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।' তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টি মেয়ের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। মেয়েটি বলেন, 'আমার পিতা যা করেছেন তা আমি মেনে নিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা যেন জেনে নেয় যে, বিয়ের ব্যাপারে পিতাদের (চূড়ান্ত) মত দেবার অধিকার নেই।' [সূত্রঃ ইবনে মাজাহ্]

খ) স্ত্রী হিসাবে নারী

বিভিন্ন সভ্যতার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, সকল কালেই— এমনকি গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মত গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতাতেও— স্ত্রীকে মানবিক মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। সে ছিল নিতান্তই স্বামীর সম্পত্তি যা স্বামী অন্যের সাথে বিনিময় করতে পারত, বন্ধক রাখতে পারত, অন্যকে উপহার দিতে পারত, এমনকি আর্থিক সংকট কাটাতে তাকে দাসী হিসাবে বিক্রিও করতে পারত। স্বামী তাকে যে কোন শাস্তি— এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারত। এরকম মানবেতর অবস্থা থেকে নারীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে কালজয়ী আদর্শ ইসলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেনঃ "তাদেরও (স্ত্রীদের) তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষের)।" [সূত্রঃ আল কুরআন-২ঃ ২২৮] কুরআন-পাকের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ 'তারা তোমাদের পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ।' [সূত্রঃ আল কুরআন-২ঃ১৮৭]

স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নারীমুক্তির প্রথম এবং প্রকৃত প্রবক্তা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ

www.pathagar.com

"কোন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয় ও ভক্তির (তাকওয়া) পর পুণ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কিছু লাভ করে না।" [সূত্রঃ ইবনে মাজাহ্‌]

অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ "দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। এখানে যে যত সুবিধাই গ্রহণ করুক না কেন, সেটা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। তবে এই পার্থিব জগতে ধার্মিক স্ত্রী ব্যতীত উত্তম আর কোন জিনিস হতে পারে না।" [সূত্রঃ ইবনে মাজাহ্‌]

কুরআন পাকে যখন সোনা-রূপা জমা করতে নিষেধ করা হল, তখন হযরত উমার (রা) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কোন্ সম্পদ সঞ্চয় করব?' তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 'তোমাদের সকলেই যেন সঞ্চয় করে কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, আর ঈমানদার স্ত্রী, যে তোমাদের আখিরাতের কাজে সহায়তা করবে।' [সূত্রঃ ইবনে মাজাহ্‌]

অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলাম নারীকে 'সম্পত্তি'র অবমাননাকর অবস্থান থেকে 'সম্পদ' এর গৌরবজনক অবস্থানে উন্নীত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী তার স্ত্রীর মালিক-মোক্তার নয়, বরং জীবন সাথী। অতএব সাথীর প্রতি যে আচরণ শোভন, তেমনটি করতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ "তাদের সাথে মিলে মিশে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ্ যে বিষয়ে অশেষ কল্যাণ রেখেছেন সেটাকেই তোমরা অপছন্দ করছ।" [আল কুরআন- ৪ঃ১৯]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'যে আচার-আচরণে নিষ্ঠাবান, যে তার স্ত্রীর প্রতি সদয়, সে-ই প্রকৃত মুমিন।' [সূত্রঃ তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফ]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেনঃ "স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় এবং নামায হচ্ছে আমার চক্ষুশীতলকারী।" [সূত্রঃ নাসাঈ শরীফ]

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জীবনে স্ত্রীর মর্যাদা প্রদানের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, নতুন এক জীবন-ব্যবস্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র আর একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনার মত বিরাট দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে দারুণ ব্যস্ত থাকতে হত। এরপরও তিনি গৃহকর্মে স্ত্রীদেরকে সাহায্য করেছেন। একবার নবীপত্নী আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন। জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ 'তোমাদের কোন এক ব্যক্তি নিজ ঘরে যা করে থাকো, তিনিও তাই করতেন— জুতা সেলাই করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং সেলাই করতেন।' [সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ] একই সংকলণের পরবর্তী হাদীসে আমরা দেখতে পাই, তিনি কাপড় পরিস্কার করতেন, ছাগলের দুধ দোহাতেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল স্ত্রী-প্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি এমন কিছু কাজ করতেন যা ছিল খুব আন্তরিকতাপূর্ণ এবং তাঁর স্ত্রীরা তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করতে পারতেন। যেমন তিনি তাঁদের সাথে একই পাত্রে খাবার

www.pathagar.com

খেতেন এবং এক পেয়ালায় পানি পান করতেন। নবীপত্নী উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, 'একই পাত্রে আমার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতের মধ্যে ছোঁয়া লাগতে থাকত' (অর্থাৎ একই পাত্রে তাঁরা আহার করতেন)।[সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ] তাঁর হৃদয়ের এই উষ্ণতা ছিল নিখাদ। স্ত্রীদের ঋতুস্রাবের সময়ও তিনি তাঁদের সাথে একই রকম আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেনঃ "আমি হায়েয অবস্থায় হাড়ের গোশ্ত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেয়ে তা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দিতাম। তিনি সে জায়গায় মুখ লাগিয়ে খেতেন যে জায়গায় আমার মুখ লেগেছিল। আমি বাটি থেকে পানি পান করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দিলে তিনি সে স্থানে মুখ রেখে পান করতেন, যেখানে আমি মুখ রেখে পান করেছিলাম।" [সূত্রঃ আবু দাউদ, নাসাঈ, আল আদাবুল মুফরাদ]

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের বিনোদনের প্রতিও সজাগ ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেনঃ "আমার কয়েকজন বান্ধবী ছিল, তাদের সঙ্গে আমি খেলা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে আসলে আমার বান্ধবীরা দৌড়ে পালাতো। তিনি তাদের খোঁজ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন; আমরা পুনরায় খেলা আরম্ভ করতাম।" [সূত্রঃ সহীহ বুখারী]

আয়িশা (রা) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার ঈদের দিনে কিছু হাবশী লোক মসজিদে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে খেলা করছিল। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তলোয়ার চালনার খেলা দেখতে চাও কি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি আমার গন্ডদেশ হযরতের গন্ডদেশে লাগিয়ে হাবশীদের অস্ত্রচালনা দেখছিলাম। . . . আমি যখন নিজেই অবসাদ অনুভব করলাম তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন ভরেছে কি?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'তবে যাও।' [সহীহ্ আল বুখারী]

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং স্ত্রীদের সাথে বন্ধুর মত খেলা-ধূলা করতেন। আয়িশা (রা) বলেনঃ 'আমি একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ভ্রমণ করছিলাম; তখন তাঁর সাথে আমার দৌড় প্রতিযোগিতা হল। আমি দৌড়ে তাঁকে পরাজিত করলাম। যখন আমি স্থূলকায় হয়ে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর সাথে আরেকবার দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এবার তিনি দৌড়ে আমাকে পরাজিত করলেন এবং বললেন, 'আয়িশা, এ হল তোমার পূর্ববিজয়ের প্রতিশোধ।'

খৃস্টবাদের মত ইসলাম বলে না যে, স্ত্রীদের চুপ থাকা উচিত এবং শুধু আনুগত্য করে যাওয়া উচিত। বরং পারস্পরিক আলোচনা-পরামর্শের ওপর ইসলামে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন শিশু-সন্তানকে বুকের দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিচ্ছেনঃ "স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।" [সূত্রঃ আল কুরআন-২ঃ ২৩৩]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য দিতেন।

www.pathagar.com

জীবনের বড় এক সংকটকালে তিনি তাঁর এক স্ত্রীর পরামর্শমত কাজ করে সংকট নিরসণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ের ঘটনা। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদলে উমরা করতে কা'বা ঘরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সকল রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে কুরাইশরা তাঁদেরকে বাধা প্রদান করল। অনেক আলোচনার পর অবশেষে এক সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এর শর্তগুলো ছিল আপাত দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য খুব অবমাননাকর (যদিও কুরআনে এটাকে প্রকাশ্য বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা প্রমাণিতও হয়েছে)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ এতে দারুণ ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে তিনি যখন তাঁদেরকে হুদায়বিয়ার প্রান্তরেই পশু কুরবানী করতে বললেন, তখন তাঁরা মুখ ভার করে বসে রইলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথায় যাঁরা হাসতে হাসতে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাঁদের এই নির্লিপ্ততায় তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সেখান থেকে উঠে তিনি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন। নবীপত্নী উম্মে সালমা (রা) সবকিছু শুনে বললেনঃ 'হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনার কি এ যুক্তি পছন্দ হয়? আপনি নিজে বের হোন, কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজের পশু জবাই করুন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে নিজের মাথা মুণ্ডন করুন।' মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবনের এই বিব্রতকর অবস্থায় স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন। এতে সুফল পাওয়া গেল। সাহাবীরা সবাই নিজি নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং মাথা মুণ্ডন করলেন। [সূত্রঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৪র্থ খণ্ড। পৃ-৩২৪]

ইসলাম স্ত্রীকে দিয়েছে তালাকের অধিকার। নারীর তালাক গ্রহনের প্রক্রিয়াকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় খুলা। ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, ছাবিত বিন কায়সের স্ত্রী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে তার স্বামী থেকে খুলা তালাক গ্রহণ করেছিলেন। [সূত্রঃ তিরমিযী শরীফ] ইমাম মালিক (রঃ) অভিমত পোষণ করেছেন যে, স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামীর বিরুদ্ধে অসম্প্রীতি ও উপেক্ষার অভিযোগ থাকলে স্ত্রীর জন্য তা কাযীর আদালতে উত্থাপনের অধিকার রয়েছে। প্রথমতঃ কাযী স্বামীকে মৌখিক উপদেশ দেবেন। স্বামী উপদেশ মেনে চললে বিষয়টি নিস্পত্তি হয়ে যাবে। উপদেশ কার্যকর না হলে স্ত্রীর জন্য খোরপোষ প্রদানের আদেশ এবং স্ত্রীকে আনুগত্য (বিশেষ অর্থে) না করার নির্দেশ দেওয়া হবে এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সাময়িক বর্জন করার ও তার ঘরে না যাওয়ার বৈধতা দেওয়া হবে। এতে স্বামী সরল পথে আসলে এভাবে নিস্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু এতে স্বামী সম্মত না হলে কাযী তাকে প্রহারের শাস্তি দেবেন। তাতেও ফলোদয় না হলে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। [সূত্রঃ মিনহাজুস সালেহীন। পৃ-৪০৮]

পুরুষের কর্তৃত্ব সংক্রান্ত অভিযোগের পর্যালোচনা

বলা হয়, ইসলাম নারীর উপরে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। আসুন, এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটি দেখি। ঘোষণা করা হয়েছেঃ

"পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, কারণ আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের উপর

www.pathagar.com

বিশেষত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে।" [সূত্রঃ আল কুরআন- ৪ঃ ৩৪] উল্লেখিত আয়াতে পুরুষের প্রাধান্যসূচক যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হল 'কাওয়াম'। এই শব্দ দিয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব বুঝায় না। এই ধরণের ক্ষমতা বুঝানোর জন্য আরবীতে পৃথক দুটি শব্দ রয়েছে, সে-গুলি হল 'মুহাইমিনুন' এবং 'মুছাইতিরুন'। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী বলেনঃ "স্বামী কাওয়াম এর অর্থ হল স্বামী তার স্ত্রীর আমানতদার, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তার যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল, কর্তা এবং তার অবস্থার সংশোধনকারী ও কল্যাণ বিধানকারী।" [সূত্রঃ মাওলানা আব্দুর রহীম। পরিবার ও পারিবারিক জীবন। পৃ-২০৫]

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর প্রভু বানিয়ে দেয়নি বরং তাকে করেছে দায়িত্বশীল যার অনিবার্য দাবী হল স্ত্রীর যাবতীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং নিরাপত্তা বিধান। এখন প্রশ্ন হল, এই যে আমৃত্যু গুরুদায়িত্ব— এ কি কোন উপভোগ্য ব্যাপার? বরং এ তো স্বামীর কাঁধে ভারী এক বোঝা যা তাকে বহন করতে বাধ্য করা হয়েছে। স্ত্রীর কাঁধে এই বোঝা চাপানো কোন বিবেচনাতেই সংগত হত না। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব অর্পনের যৌক্তিকতা কি? প্রশ্নটা মূলতঃ পাশ্চাত্যের। এই সভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ব্যক্তির রুচি-অভিরুচিকে মূল্য দিতে গিয়ে আর সব কিছুকে তারা অবলীলায় অবহেলা করতে পারে। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেবতাকে তুষ্ট করতে তারা সামষ্টিক স্বার্থকে সহজেই বলি দিতে পারে। তাই তারা পরিবারে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। তারা এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারে না যে, কোন প্রতিষ্ঠানই একজন কর্তার অনুপস্থিতিতে ঠিকমত চলতে পারে না; আর পরিবার হল সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পাশ্চাত্যে পারিবারিক জীবনে বিশৃংখলা আর অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হল কর্তাবিহীন পরিবার। এর থেকে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, হানাহানি, বিবাহ-বিচ্ছেদ। পশ্চিমা বিশ্বে এ সব সমস্যা ব্যাপক।

আরেকটি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার, তা হলঃ স্ত্রী হিসাবে নারী পুরুষের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও জীবনের আরেক পর্যায়ে তাকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। মা হিসাবে নারীকে পুরুষের তিন গুণ সম্মান প্রদান করেছে ইসলাম। এ-প্রসঙ্গে হাদীসগ্রন্থগুলিতে খুব নির্ভরযোগ্য এক বর্ণনা রয়েছে। একবার এক লোক মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কাছে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার পাবার যোগ্য কে?' জবাবে তিনি বললেন, 'তোমার মাতা।' লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মাতা।' লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মাতা।' চতুর্থবারও লোকটি একই প্রশ্ন করল। এবার মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তোমার পিতা।' [সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ] অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, জীবনের এক পর্যায়ে নারী তুলনামূলকভাবে কম পাচ্ছে (যা পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে সফল করার জন্য অপরিহার্য), আরেক পর্যায়ে পাচ্ছে বেশি। এভাবে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। প্রসিদ্ধ

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক এ-প্রসঙ্গে এক সুন্দর উদাহরণ দিয়ে থাকেন। দু'জন ছাত্র 'ক' এবং 'খ' কোন এক পরীক্ষায় সমান নম্বর পেয়েছে, ধরা যাক ৮০% নম্বর পেয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, প্রতিটি প্রশ্নে তারা সমান নম্বর পেয়েছে। 'ক' প্রথম প্রশ্নে পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৯, 'খ' এখানে পেয়েছে ৭। দ্বিতীয় প্রশ্নে 'ক' পেয়েছে ৭ আর 'খ' পেয়েছে ৯। অন্যান্য প্রশ্নে তারা দুজনেই ৮ করে পেয়েছে। এভাবে তারা সামগ্রিকভাবে সমান হলেও একটি প্রশ্নে 'ক' এর অবস্থান ভাল, আরেকটিতে ভাল অবস্থান 'খ' এর। তেমনিভাবে, নারী-পুরুষ সমান হলেও স্বামী হিসাবে পুরুষ ভাল অবস্থানে আছে, আর মা হিসাবে নারীর অবস্থান উন্নততর।

স্ত্রীকে প্রহারের অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগের পর্যালোচনা

অভিযোগ করা হয়, কুরআন স্বামীকে অধিকার দিয়েছে, সে স্ত্রীকে প্রহার করতে পারে। বিষয়টি এসেছে সূরা আন্ নিসার ৩৩ নং আয়াতে। এই আয়াতে বলা হয়েছেঃ "স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, পরবর্তীতে তাদের শয্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। শেষে তাদেরকে প্রহার কর। এর ফলে তারা যদি তোমাদের বাধ্য হয়ে যায়, তাহলে তাদের ব্যাপারে অন্য কোন পথ তালাশ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ই হচ্ছেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এটাও পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত অভিযোগ যারা বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি না করেই সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করার নৈতিক অধিকার কি পশ্চিমা বিশ্বের আছে? প্রায় শত ভাগ শিক্ষিত জনসংখ্যা অধ্যুষিত এসব দেশে বিপুল সংখ্যক নারীকে স্বামীর হাতে কিংবা (লিভ টুগেদারের ক্ষেত্রে) যৌনসঙ্গীর হাতে নির্যাতিত হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কলম্বিয়াসহ ১০টি পশ্চিমা দেশের উপর জাতিসংঘ এক ব্যাপক জরিপ পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, গড়ে প্রতি তিন জন নারীর মধ্যে একজন স্বামী বা সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় [সূত্রঃ Social Problems. Annual Edition-02/03. pp-92.] পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে গড়া প্রাচ্যের দেশ জাপান। এখানেও স্ত্রী-নির্যাতনের হার এক তৃতীয়াংশ। [সূত্রঃ A New Psychology of Women. Pp-426]

স্ত্রীকে প্রহার করা, এমনকি তার সাথে দুর্ব্যবহার করা ইসলামের দৃষ্টিতে খুব অপছন্দনীয় কাজ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বার বার এটা নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'তোমরা আল্লাহ্র দাসীদেরকে মারধোর করো না।' [সূত্রঃ সহীহ্ আবু দাউদ] এখানে স্ত্রীদেরকে 'আল্লাহ্র দাসী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে; বিষয়টি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক প্রতিবেশীর চাকর-খাদেমকে মারধোর করতে পারে না। আর নিজের পরম সাফল্য কি চরম শাস্তি যাঁর হাতে, সেই সত্তার যে দাসী, তার উপর যুলম-নির্যাতন কতইনা স্পর্ধার কাজ! স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, এটাকে স্বামীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রী-পরিজনের নিকট উত্তম।" [সূত্রঃ জামে আত তিরমিযী] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যত্র বলেছেনঃ "মর্যাদাবানই (স্ত্রীদের)

www.pathagar.com

মর্যাদা দেয় এবং ইতর লোকই তাদের মর্যাদাহানি করে।" [সূত্রঃ মিনহাজুস সালেহীন] বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিজ-জীবনে স্ত্রীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি কোন দিন তাঁর কোন স্ত্রীকে প্রহার করেননি। এমনকি তাঁদের সাথে কখনো কোন দুর্ব্যবহারও করেননি। বিশ্বাসীদের মাতা আয়িশা (রা) বলেনঃ "রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোন স্ত্রীকে কিংবা কোন চাকর-খাদেমকে কখনো মারধোর করেননি— না তাঁর নিজের হাত দিয়ে, না আল্লাহ্‌র পথে।" [সূত্রঃ সুনান আন নাসাঈ] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাম্পত্য জীবনের যে বিবরণ হাদীস শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁর স্ত্রীরা কখনো কখনো কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন, অথচ তিনি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। একবার হযরত উমার (রা)-এর স্ত্রী তাঁকে বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র কসম! নবীর বেগমরা পর্যন্ত তাঁর কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকেন। এমনকি তাঁদের এক-একজন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দিনের বেলা ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত অভিমান করে থাকেন।' একথা শুনে উমার (রা) দ্রুত তাঁর কন্যা এবং নবীপত্নী হাফসা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এধরণের আচরণ না করার উপদেশ দিলেন। [সূত্রঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন। পৃ-১৮২] অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্ত্রী-নির্যাতন ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কাজ।

ইসলাম সংশোধন ও প্রত্যাবর্তনের সব পথ খোলা রাখতে চায়। কারো মুখের উপর ঝট করে কপাট বন্ধ করে দেওয়া এই মহান ধর্মের রীতি নয়। তাই কখনো কখনো অপছন্দনীয় কোন বিষয়েরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এটি এই জন্য যে, চরম অনাকাঙ্খিত কোন ঘটনা যেন না ঘটে যায়। এই ধরণের আরেকটা উদাহরণ হল তালাক। ইসলামে এটা অতি অপছন্দের কাজ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক অপছন্দনীয় বৈধ বিষয় হচ্ছে তালাক। [সুনান আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ]। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেনঃ বিয়ে কর, তালাক দিয়ো না; কেননা, তালাকের কারণে পরম দয়ালুর আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। [সূত্রঃ মিনহাজুস সালেহীন] এরকম একটা কাজকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। কারণ, কখনো কখনো এটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। যাহোক, চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার তালাক প্রতিরোধের সর্বশেষ প্রয়াস হিসাবে মৃদু প্রহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর আগে আরো দু'টি পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপের কথা কুরআনের ঐ একই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে; প্রথমটি হল উপদেশ প্রদান এবং দ্বিতীয়টি শয্যা পৃথককরণ। ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করলে অধিকাংশ স্ত্রীর জন্য প্রথম পদক্ষেপই যথেষ্ট; দ্বিতীয়টিরও প্রয়োজন পড়ে না। আর শয্যা পৃথক করার পরও সংশোধন হবে না, এরকম স্ত্রী নিঃসন্দেহে দুর্লভ।

স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে ধৈর্যশীল হওয়া সুখময় দাম্পত্য জীবনের পূর্বশর্ত। মানুষ হিসাবে তাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকতেই পারে। তবে ধৈর্য্য ও সদুপদেশের সাহায্যে তা দূর

www.pathagar.com

করা সম্ভব। ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটা অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা, একটা অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশিও হয়ে যেতে পারে।" [সূত্রঃ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ] অন্যত্র তিনি বলেনঃ "মেয়েলোক পাঁজরের হাড়ের মত। তাকে সোজা করতে চাইবে তো ভেঙ্গে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করবে।" এই হাদীসে নারীর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, জোর করে তার প্রকৃতি পরিবর্তন করতে চাইলে দাম্পত্য সম্পর্কই ভেঙ্গে যেতে পারে। অতএব, কল্যাণকর পন্থা হল, তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা। এভাবেই মধুর পারিবারিক জীবন গঠন করা সম্ভব। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আশ্ শাওকানী (রঃ) বলেনঃ "এ হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে যে, নারীদের সাথে সব সময়ই ভাল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। তাদের স্বভাব-চরিত্রে বক্রতা থাকলে অসীম ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে।"[উদ্ধৃতঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃ-১৭২] ইবনে হাজার আল আসকালানী (রঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ "নারীদের এই বাঁকা স্বভাব দেখে তাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; বরং ভাল ব্যবহার ও অনুকূল পরিবেশ দিয়ে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা পাওয়াই পুরুষের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা সব সময়ই প্রয়োজন,তাহলেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে। সেই সঙ্গে মেয়েদের অনেক দোষ ক্ষমা করে দেওয়ার গুণও অর্জন করতে হবে স্বামীদের। খুঁটিনাটি ও ছোটখাটো দোষ দেখেই চটে যাওয়া কোন স্বামীরই উচিত নয়।" [প্রাগুক্ত, পৃ-১৭২] এভাবে স্বামী যদি নিজেকে স্ত্রীর প্রকৃত বন্ধু এবং অভিভাবক হিসাবে প্রমাণ করতে পারে, তার মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখলে ধৈর্য্য সহকারে উপদেশ দিতে থাকে, তাহলে আশা করা যায় এতেই সুফল পাওয়া যাবে। অধিকাংশ স্ত্রী এই পর্যায়েই নিজেকে সংশোধন করে নেবে। সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু নারী এই পর্যায়ে সংশোধিত না-ও হতে পারে, আনুগত্য স্বীকার নাও করতে পারে। তাদের জন্য কুরআনের পরবর্তী ব্যবস্থাপত্র হল শয্যা পৃথক করে দেওয়া। কিছুদিন এভাবে সঙ্গ বর্জন করার পরও সংশোধিত হবে না কিংবা আনুগত্য স্বীকার করবে না— এরকম নারী সমাজে দুর্লভ। যে নগণ্য সংখ্যক নারী স্বামীর শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরও নিজেকে শুধরে নেবে না, তাদেরকে সংশোধনের শেষ প্রয়াস হল মৃদু প্রহার। কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকারগণ আয়াতটি থেকে এই অর্থই বুঝেছেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ "উপদেশ প্রদান এবং শয্যা পরিত্যাগ অবস্থায় ফলোদয় না ঘটিলে এবং উহাতেও স্ত্রী তাহার অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া না আসিলে তোমরা তাহাদিগকে সামান্য প্রহার করিতে পার।" [সূত্রঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-৭২] "হযরত ইবনে আব্বাস (রা)সহ একাধিক তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যখ্যায় বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামী কর্তৃক প্রযোজ্য প্রহার হইতেছে সামান্য প্রহার। হাসান বসরী (রঃ) বলিয়াছেন, উহা হইতেছে এইরূপ প্রহার যাহা প্রহারের স্থানে দাগ সৃষ্টি না করে।"

www.pathagar.com

[প্রাগুক্ত, পৃ-৭৩] মৃদু প্রহারের যে অনুমতি এখানে দেওয়া হয়েছে, তার লক্ষ্য হল স্ত্রীর আনুগত্য অর্জন যা পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে সফল করবার জন্য অপরিহার্য। স্ত্রীর প্রতি অবমাননা এর লক্ষ্য নয়। এ-জন্য পর্যায়ক্রমে তিনটি পন্থা বাৎলে দেওয়া হয়েছে। এগুলো একের পর এক প্রয়োগ করতে হবে এবং ফলাফল লক্ষ্য করতে হবে। প্রথমটা সফল হলে দ্বিতীয়টা নিষ্প্রোয়জন, আর দ্বিতীয়টার সাফল্যে তৃতীয়টা বর্জনীয়। আর এ-ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করে চলা উচিত। আল্লাহ্র দাসীদের প্রতি অত্যাচারী শাসকের মত আচরণ করার ব্যাপারে ঐ একই আয়াতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছেঃ "এতে যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যাপারে অন্য কোন পথ তালাশ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।" ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ)-এর মতে এর তাৎপর্য হলঃ "এ-কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া যে, অপেক্ষাকৃত হালকা শাসনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে পরে তাতেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত এবং তারপরও অধিকতর কঠোর নীতি অবলম্বনে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই জায়েয নয়।" [উদ্ধৃত- পরিবার ও পারিবারিক জীবন। পৃ-১৭৮] এখানে আল্লাহ্ ইঙ্গিত করছেন, স্ত্রীর উপরে কর্তৃত্ব দেবার কারণে যদি তুমি তাদের সাথে নির্দয় আচরণ কর, তাহলে একথাও ভুলে যেও না যে, আল্লাহ্ তোমার উপর অসীম ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি তোমার প্রতি নাখোশ হলে তোমার চরম সর্বনাশ।

বহু-বিবাহ সংক্রান্ত অভিযোগের পর্যালোচনা

ইহুদী-খৃস্টান ধর্মসহ কোন ধর্মই বহু-বিবাহকে নিষিদ্ধ করেনি, এমনকি সীমিতও করেনি; অথচ এ-ব্যাপারে ইসলামকেই শুধু আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। বলা হয়, ইসলাম বহু-বিবাহ সমর্থনের মাধ্যমে নারীর মর্যাদাহানি করেছে। আসুন বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করি।

ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু সব ধর্মেই বহু-বিবাহের বিধান আছে। এ-সব ধর্মের অনুসারী কোন পুরুষ যত খুশি তত বিয়ে করতে পারে; এ-ব্যাপারে তাদের ধর্মে কোন বাধা নেই। বাধা যা আছে তা সমাজের বা রাষ্ট্রের। জে হেস্টিংস সম্পাদিত The Dictionary of the Bible এ বলা হয়েছে, "বহুবিবাহ একটি বাস্তবতা, কারণ আব্রাহাম, দাউদ, জেকব, সলোমন এ চর্চা করেছেন।" [উদ্ধৃতঃ ড: জামাল বাদাবী। ইসলামের সামাজিক বিধান। পৃ-১১৯] হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয় ১৯৫৪ সালে এসে। এর আগে কয়েক হাজার বছর ব্যাপী ভারতবর্ষে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

ইসলাম বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন করেনি, বরং পূর্ব থেকে অতিপ্রচলিত এই ব্যবস্থাকে সংস্কার করেছে, সীমিত করেছে। স্ত্রীর সংখ্যাকে সর্বোচ্চ চার জনে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে কঠোর এক শর্তের অধীন করে দিয়েছে। আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন, "যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে একটি বিয়ে কর।" [সূত্রঃ সূরা আন্ নিসা, আয়াত-৩] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, "যে ব্যক্তির দুইজন স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামাতের ময়দানে সে

www.pathagar.com

এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের একপার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে।[সূত্রঃ তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফ। উদ্ধৃত- তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন] অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কোন সুযোগ নয় বরং নিজেকে অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করার শামিল। কোন ভাল মুসলিম নিতান্ত সখের বশে এতবড় ঝুঁকি নিতে চাইবে না। আর এ-জন্যই কোন কালে মুসলিম সমাজে একাধিক বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, জন্মের পর থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নারীর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষের তুলনায় বেশি। নারীর গড় আয়ুষ্কালও পুরুষের তুলনায় বেশি। এতে করে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। তাছাড়া, নানা রকম দুর্ঘটনা যেমন আগুনে পুড়ে, পানিতে ডুবে, উঁচু স্থান থেকে পড়ে, সড়ক দুর্ঘটনায়, খনি-দুর্ঘটনায়, নির্মাণ কাজের সময় সংঘটিত দুর্ঘটনায়, আক্রমণের শিকার হয়ে— এরকম অনেক অস্বাভাবিক পন্থায় পুরুষের মৃত্যুর হার নারীর তুলনায় অনেক বেশি। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর সকল দেশে বিপত্নীকের তুলনায় বিধবার সংখ্যা অনেক বেশি। নারীর এই সংখ্যাধিক্যের একমাত্র যৌক্তিক সমাধান হল পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান।

কোন দেশে পুরুষের সংখ্যাহ্রাসের সবচেয়ে বড় কারণ হল যুদ্ধ-বিগ্রহ। আর এটা দাবী করার কোন উপায় নেই যে, বর্তমানের 'সুসভ্য' মানুষ অতীতের চেয়ে কম যুদ্ধবাজ। যাহোক, কোন দেশে যুদ্ধ শুরু হলে তাতে লক্ষ লক্ষ পুরুষ নিহত হয়। ফলে পুরুষের সংখ্যা এত হ্রাস পায় যে, প্রত্যেক পুরুষের জন্য একজন স্ত্রীর বিধান বলবৎ থাকলে অনেক নারীর পক্ষে স্বামী জোটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সমাজকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করবার কোন উপায় থাকে না। এ-ধরণের এক জটিল অথচ বাস্তব সমস্যার সমাধান ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থা দিতে পারেনি। যারা ইসলামের এই অসাধারণ বিধানটির সমালোচনা করে, সেই খৃস্টান-জগতও কখনো কখনো এই নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৬৫০ সালে যখন ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধ শেষ হয়, তখন নুরেমবার্গে আইন পাশ হয় যে, প্রত্যেক পুরুষ দুজন নারীকে বিয়ে করতে পারবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল সংখ্যক পুরুষ নিহত হওয়ায় নারীর সংখ্যাধিক্য সমস্যা মুকাবিলার জন্য ১৯৪৮ সালে মিউনিখে এক বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইসলামের বহু-বিবাহ প্রথা প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়।[সূত্রঃ ইসলামের সামাজিক বিধান। পৃ-১১৮, ১২৫]

বহুবিবাহের সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার পাশ্চাত্য জগতের নেই। তারা আইন করে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে বটে, তবে একজন স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে পারেনি। কাজেই আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার যে সহজ সুযোগ রয়েছে, পাশ্চাত্যবাসীরা এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার সচরাচর করে থাকে। এটা হল একের পর এক স্ত্রী পরিবর্তন। সমাজবিজ্ঞানী ড: রম ল্যানডাউ বলেন-

"একজন পুরুষ একই সাথে দু'জন স্ত্রী রাখতে পারে না, কিন্তু কেউ তাকে কয়েক বছরের মধ্যে দশজন স্ত্রী রাখতে বাধা দিতে পারে না।" [সূত্রঃ Sex, Life and Faith: A Modern Philosophy of Sex. pp-136. Quoted in: Islam

www.pathagar.com

an Introduction. pp- 103] একজন মার্কিন সমাজ-বিজ্ঞানীর দেওয়া তথ্য এই মন্তব্যের সত্যতা প্রতিপাদন করছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০ লক্ষেরও বেশি লোক তিন-চার বার বিয়ে করেছে এবং এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।[সূত্রঃ Social Psychology: Understanding Human Interaction. Pp-344]

পশ্চিমা সমাজের আরেকটি সংকট হল, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ তাদের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হলেও অসংখ্য উপপত্নীতে কোন বাধা নেই। এ এক বিরাট ভণ্ডামী। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স নরডান লিখেছেন-

"আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একক বিবাহ চালু থাকলেও সভ্য দেশগুলিতে মানুষ এক ধরণের বহুবিবাহের মধ্যে বাস করে; শত-সহস্র পুরুষের মধ্যে একজনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে বলবে, তার জীবনকালে একজনের বেশি নারীর সংস্পর্শে আসেনি।" [সূত্রঃ Conventional Lies of Our Civilization. pp-301. Quoted in: Islam an Introduction. pp-106]

অন্য পুরুষের জীবনে শুধু সাময়িক আনন্দের সঙ্গিনী হওয়া নারীর জন্য চরম অবমাননাকর। কারো দ্বিতীয় স্ত্রী হলে নারী অন্ততঃ একটা ঘর পায়, মর্যাদা পায়, সন্তানের বৈধ পিতৃত্ব পায়, সর্বোপরি আত্মিক প্রশান্তি পায়। অথচ উপপত্নী হলে তার কপালে বঞ্চনা ছাড়া কিছুই জোটে না। অবৈধ সন্তান কোলে পথে পথে ঘোরাই হয় তার নিয়তি। ডঃ এ্যানি বেসান্ত চমৎকার বলেছেন-

"পাশ্চাত্য জগত একক-বিবাহের ভান করে, আসলে কিন্তু সেখানে বহুবিবাহ চালু রয়েছে তবে দায়-দায়িত্ব ছাড়া; পুরুষটা যখন ক্লান্তিকর মনে করে, তখন সে রক্ষিতাকে ছুঁড়ে ফেলে আর সে ক্রমশঃ পথের মেয়েতে পরিণত হয়। কারণ, তার ভবিষ্যত নিয়ে প্রথম প্রেমিকের কোন মাথা ব্যথা নেই। তার অবস্থা তখন বহুবিবাহ-ভুক্ত পরিবারে আশ্রিত স্ত্রী বা মা-এর তুলনায় শতগুণ খারাপ হয়ে পড়ে। যখন আমরা পশ্চিমা শহরগুলির রাস্তায় রাত্রিকালে হাজার হাজার দুর্দশাগ্রস্ত নারীকে ভিড় করতে দেখি, তখন আমাদেরকে উপলব্ধি করতেই হয় যে, ইসলামকে বহুবিবাহের জন্য নিন্দা করা পাশ্চাত্যের পক্ষে শোভা পায় না।" [The Life and Teachings of Muhammad. pp-3. Quoted in: Islam an Introduction. pp-13]

গ) জননী হিসাবে নারী

ইসলাম নারীকে জননী রূপে যে মর্যাদা দিয়েছে, তা পুরুষের জন্য ঈর্ষণীয়। আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেনঃ "আমি মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের সঙ্গে গর্ভে ধারণ করে এবং বেদনার সঙ্গে প্রসব করে।"[সূত্রঃ সূরা আহকাফঃ১৫] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মাতাদের অবাধ্যতা, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া, দানের ব্যাপারে নিজের হাত গুটিয়ে রাখা এবং অন্যের কাছে পাওয়ার মনোবৃত্তি পোষণ করাকে।" [সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ] রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ "জান্নাত জননীর

www.pathagar.com

পদতলে।"[সূত্রঃ মিশকাত, আন্ নাসাঈ, বাইহাকী] এই একটি হাদীসে সন্তানের কাছে মাতার গুরুত্ব পিতার তুলনায় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। মায়ের এই তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখি এক যুবকের প্রশ্নের জবাবে মহানবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর পর তিন বার মায়ের অধিকারের কথা বলেন আর চতুর্থবার বলেন পিতার অধিকারের কথা। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ডাঃ জাকির নায়েক চমৎকার বলেছেনঃ "মা পাচ্ছেন স্বর্ণপদক, মা পাচ্ছেন রৌপ্যপদক, মা পাচ্ছেন ব্রোঞ্জপদক। পিতাকে শুধু সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।"

ইসলাম মাকে এতটা সম্মানিত করেছে যে, তার সেবাকে পাপমুক্তির উপায় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একবার এক ব্যক্তি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দ্বারা একটা জঘন্য পাপ সংঘটিত হয়ে গেছে। এখন আমার তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি?' জবাবে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তোমার মা কি এখনও জীবিত আছেন?' সে ব্যক্তি বলল, 'জ্বী না, তবে আমার খালা এখনো বেঁচে আছেন।' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তবে তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।' [সূত্রঃ জামে আত তিরমিযী]

সন্তানের জীবনে মায়ের যে অবদান, তাকে ইসলাম অসীম গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ-গুরুত্ব যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে একটি হাদীসে। হযরত ইবন্ উমার (রা) একদা জনৈক ইয়ামানী যুবককে তার মাকে পিঠে নিয়ে তওয়াফরত (কা'বাঘর প্রদক্ষিণরত) অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে তখন নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করছিলঃ 'আমি তার অনুগত উটের মত। যদি তার রেকাব (পা-দানী) আমাকে আঘাত করে, তবুও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করে যাই।' তারপর সে বলল, 'আমি কি আমার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন?' তিনি বললেন, 'না, তাঁর একটা দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তো হয়নি।' [সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ]

ইবন আবু আওফা (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, এক যুবক মৃত্যুকালে কোন মতেই তার মুখ থেকে কালেমা উচ্চারণ করতে পারছিল না। কেননা তার মা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুপারিশে তার মা তাকে ক্ষমা করে দিলেন, আর তখনই তার মুখে কালেমা উচ্চারিত হল।[সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ]

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিজের মায়ের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেননি; তাঁর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর তখন তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁর দুধমাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তিনি অনুপম নজির স্থাপন করেছেন। হযরত আবুত তুফাইল (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জুরানা নামক স্থানে গোশ্ত বিতরণ করতে দেখতে পাই। আমি তখন ছেলে মানুষ; আমি উটের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধরে উঠাতেছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে জনৈকা মহিলা এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য নিজের

www.pathagar.com

চাদরখানি বিছিয়ে দিলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহিলাটি কে?' জবাবে একজন বলে উঠল, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেই মাতা যিনি তাঁকে শৈশবে দুগ্ধদান করেছেন।'[সূত্রঃ আল আদাবুল মুফরাদ]

নারীর সামাজিক মর্যাদা

সমাজের বৃহত্তর পরিসরে পুরুষের যেসব অধিকার, নারীকেও ইসলাম তা প্রদান করেছে। শিক্ষাগ্রহণের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা লাভের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার, অর্থ উপার্জনের অধিকার— এরকম আরো অনেক বৈধ অধিকার ইসলাম নারীকে প্রদান করেছে। তবে এ-ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বরদাশত করে না। এর ফলে ব্যভিচার, পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌনরোগ প্রভৃতি সমাজে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পরিবারই হল নারীর মূল কর্মক্ষেত্র। পরিবার ব্যবস্থাপনাই হল তার প্রকৃত ও প্রাকৃতিক দায়িত্ব। সে আর যা-ই করুক, পারিবারিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালনের পরই কেবল তার সুযোগ পাবে; পরিবারকে অবহেলা করে নয়।

ক) শিক্ষালাভের অধিকার

ইসলামপূর্ব এবং তার সমসাময়িক কোন সভ্যতা নারীর শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকার করেনি। এপ্রসঙ্গে আমরা গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। ইসলাম এক্ষেত্রে চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষাগ্রহণকে নর-নারী উভয়ের জন্য বাধতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেনঃ "বিদ্যা-শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক।"[সূত্রঃ মিশকাতুল মাসাবীহ]

ইসলামে নারীশিক্ষাকে এতটা গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, অধীনস্থ দাসীদেরকেও শিক্ষা প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "কারো অধীনে কোন দাসী থাকলে সে যদি তাকে ভালভাবে লেখা-পড়া ও শিষ্টাচার শিখিয়ে স্বাধীন করে দেয় এবং বিয়ে করে, তবে সে দুটি প্রতিদান লাভ করবে।"

বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং তাঁর কর্মকাণ্ডের দ্বারা নারীশিক্ষার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ঈদের নামায শেষে তিনি ভাষণ (খুত্‌বা) প্রদান করতেন। কখনো যদি তাঁর মনে হত, পেছনের কাতার থেকে মেয়েরা তাঁর কথা শুনতে পায়নি, তখন তিনি তাদের দিকে এগিয়ে যেতেন এবং পুনরায় তাদেরকে নসিহত করতেন।[সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই সংস্কার কর্মসূচীর সুফল খুব দ্রুত ফলেছিল। নারীরা জ্ঞানার্জনে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। মসজিদে নববীতে তারাও শিক্ষালাভ করতেন। এরপরও তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুরোধ করেন, তাদের শিক্ষার জন্য একটি দিন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য।

www.pathagar.com

তিনি এই আগ্রহী ছাত্রীদেরকে নিরাশ করেননি। সপ্তাহের একটি দিনে বিশেষভাবে নারীদেরকে শিক্ষা দিতেন তিনি।[সূত্রঃ সহীহ্ আল বুখারী]

খ) মত প্রকাশের অধিকার

বাইবেলের মত কুরআন নারীকে এ কথা বলে না যে, পুরুষের জন্যই তাদের সৃষ্টি; অতএব, তাদের চুপ থাকা উচিত। বরং কোন ব্যাপারে নিজের মতামত প্রকাশ করা, বৈধ কোন ব্যাপারে জোরালো দাবী পেশ করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা— এসবের পূর্ণ অধিকার ইসলাম নারীকে প্রদান করেছে। ইসলামের সোনালী যুগের নারীরা এ অধিকার প্রয়োগ করতেও কসুর করেননি। এমনকি স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একজন নারী বাদানুবাদ করেছেন— এ-রকম ঘটনাও কুরআন পাকে উল্লেখিত হয়েছে। একবার হযরত আউস ইবনে সামিত (রা) তাঁর স্ত্রী খাওলা (রা)-কে বললেন, "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মত অর্থাৎ হারাম।" ইসলামপূর্ব আরবে এ-ধরণের কথা উচ্চারণ করলে স্ত্রী সত্যিই হারাম হয়ে যেত অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে তালাক হয়ে যেত। এবার খাওলা (রা) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গেলেন ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলে তা জানবার জন্য। তখনো এ ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসেনি। ফলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রায় দিলেনঃ "আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ।" খাওলা (রা) এই রায়ে খুশি হতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল! আমি কোথায় যাবো? আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে?" মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় বললেন, "আমি মনে করি, তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ।" খাওলা (রা) বললেন, "আমার স্বামী তো 'তালাক' কথাটা উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল?" এরপর তিনি উচ্চতর আদালতে আপিল করার মত করে বললেন, "আল্লাহ্, আমি তোমার দরবারে অভিযোগ পেশ করছি।" এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তাঁর বিধান অবতীর্ণ করলেনঃ "যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করছে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন. . .।"

যে খালিফা উমার (রা)-এর কোন কথার একবার প্রতিবাদ করতে একজন সাহসী পুরুষকেও কয়েকবার ভাবতে হত, কারণ তিনি ছিলেন মেজাজী লোক, নারী-সমাজ থেকে তাঁর কথারও প্রতিবাদ এসেছে। ঘটনাটি ছিল দেনমোহর নিয়ে। একবার মসজিদে খুৎবা দানকালে উমার (রা) লোকদেরকে নিরুৎসাহিত করছিলেন খুব বেশি দেনমোহর না ধার্য করতে। তাঁর এ-ভাষণ শুনে মহিলাদের মধ্য থেকে একজন প্রতিবাদ করে বললেন, "আল্লাহ্ তো আমাদেরকে দিচ্ছেন, আর আপনি হারাম করে দিচ্ছেন? . . . আপনি কি শোনেননি, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের একেকজন স্ত্রীকে মোহরানা দিচ্ছ বিপুল পরিমাণে?' তখন উমার (রা) বললেন, "একজন নারী ঠিক বলতে পারল; কিন্তু ভুল করল একজন রাষ্ট্রনেতা।"

www.pathagar.com

মুসলিম নারীর এই তেজোদীপ্ত প্রতিবাদী রূপ খুলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগেও লক্ষ্য করা গেছে। বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রা)কে হত্যা করার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবু বাকর (রা)-এর কন্যা আসমা (রা)-এর সাথে দেখা করে। সে বলে, "আমি আল্লাহ্র শত্রুর সাথে যে আচরণ করেছি, সে-সম্পর্কে আপনি কি বলেন?" আসমা (রা) নির্ভীকভাবে এই খুনীর মুখের উপর উচিত জবাব দেন। তিনি বলেন, "আমি মনে করি, তুমি তার পার্থিব জীবন নষ্ট করেছ, আর সে তোমার পরকালীন জীবন নষ্ট করেছে।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, 'সাকিফ গোত্রে একজন চরম মিথ্যাবাদী আর একজন ঘাতক রয়েছে।' মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখেছি, ঘাতক হিসাবে তোকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না।" এরপর অত্যাচারী হাজ্জাজ মাথা নীচু করে এই প্রতিবাদী নারীর সামনে থেকে চলে যায়। [সূত্রঃ সহীহ মুসলিম]

গ) রাজনৈতিক অধিকার

মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ হল, কল্যাণকর সকল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং অন্যায় কাজের বিরোধিতাও তারা সম্মিলিতভাবে করবে। ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, মুসলিম নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ-দায়িত্ব পালন করেছেন। এক্ষেত্রে মু'মিনদের মাতা আয়িশা (রা)-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফাতকালে তাঁর অনেক পদক্ষেপের সমালোচনা করতেন। হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কার্যক্রমে অংশ নেন।

ইসলামে যে বাইয়াতের ব্যবস্থা, তার পরিধি ব্যাপক; রাজনীতিও এর বাইরে নয়। বাইয়াত অর্থ ইসলামী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের শপথ। এটি আধুনিক কালের ভোটাধিকার প্রয়োগের সাথে তুলনীয়। এ-কালে নিজের পছন্দের নেতাকে ভোট দেবার মাধ্যমে সমর্থন জানানো হয়। সে-যুগে এই ব্যবস্থা ছিল না। তখন বাইয়াত করে সমর্থন জানানো হত; আর বাইয়াত না করলে বুঝা যেত, সমর্থন নেই। বাইয়াতকে শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আনুগত্য ভাববার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা; রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি— সব বিষয়েই ইসলামের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আনুগত্যের শপথ তথা বাইয়াতও পূর্ণাঙ্গ। যাহোক, কুরআন সুন্নাহ্ থেকে আমরা জানতে পারি, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের শপথ বা বাইয়াত গ্রহণ (যা ছিল সেই সময়ের ভোট গ্রহণ) করেছেন। নারীরাও তাঁর নিকট বাইয়াত করতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরাত করার আগে আকাবা নামক স্থানে কিছু মদীনাবাসীর নিকট থেকে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সে-সময় কিছু নারীও তাঁর নিকট বাইয়াত করেছিলেন। এরপর কুরআনে আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে সংঘটিত বাইয়াতের উল্লেখ পাই। এখানেও নারীদের আনুগত্যের শপথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[সূত্রঃ আল কুরআন- সূরা মুমতাহিনাঃ১৬] "হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল

৬—

www.pathagar.com

হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয়, বরং বারবার হয়েছে। এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ সমাপ্ত করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাক্যাবলী নিচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছে দিতেন।" [সূত্রঃ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন। ৮ম খণ্ড। পৃ-৪১৭] অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলাম নারীকে ভোটাধিকার দান করেছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পর খালীফা নির্বাচনকালে মহিলাদেরও মতামত নেওয়া হয়েছে।

নারীর নেতৃত্ব সম্পর্কিত অভিযোগের পর্যালোচনা

নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়, ইসলাম নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান হবার অনুমতি প্রদান করেনি। এর কারণ সমূহ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব কোন লোভনীয় ব্যাপার নয় যেখানে আয়েশে কর্তৃত্বের স্বাদ নেওয়া যাবে এবং অন্যদের আনুগত্য উপভোগ করা যাবে। বরং এটি দায়িত্বের দারুণ ভারী এক বোঝা। তাই তো দেখা যায়, খালিফা উমার (রা) দারুণ দুর্ভাবনার সাথে বলেছেনঃ "ফোরাতের তীরে একটা কুকুরও যদি অনাহারে মারা যায়, সে-জন্যও উমারকে (শেষ বিচারে) পাকড়াও করা হবে।" এই উপলব্ধি থেকেই খালিফাগণ গভীর রাতে জনগণের খোঁজ-খবর নিয়ে বেড়াতেন, দুঃখীদের দুঃখ ঘোচাতে চেষ্টা করতেন। ইসলামী শাসকরা ছিলেন মূলতঃ জনগণের সেবক। আপন পরিবার ব্যবস্থাপনার পর (আগেই বলা হয়েছে, এটিই নারীর প্রকৃত দায়িত্ব) নারীর পক্ষে ঐ রকম নিষ্ঠার সাথে জনগণের খেদমত করা সম্ভব নয়।

একজন রাষ্ট্রনেতাকে সকল পর্যায়ের মানুষের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করতে হয়। তাকে সভা-সমাবেশ করতে হয়, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সাথে সম্মেলন করতে হয়, মন্ত্রণাপরিষদের সাথে বৈঠক করতে হয়, সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়, দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেড়াতে হয়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে হয়, এমনকি রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করতে হয়। ইসলাম নারী-পুরুষের এরকম অবাধ মেলামেশা বরদাশত করে না (পর্দা বিষয়ক অধ্যায়ে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। আর যার সাথে বিবাহ করা বৈধ, তার সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক তো ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, নারীর মাসিক ঋতুস্রাবের সময় তার শরীর ও মনে নেক পরিবর্তন সাধিত হয়। মানসিকভাবে সে তখন স্বাভাবিক থাকে না। "ঋতুস্রাবের আগের লক্ষণগুলো অনেক নারীকে তাদের স্রাব শুরু হবার ৩-১০ দিন আগে থেকে প্রভাবিত করে। অসুস্থতার এই লক্ষণগুলো বিভিন্ন রকম যার মধ্যে আছে উৎকণ্ঠা, বিমর্ষতা, আকস্মিক মেজাজ পরিবর্তন, সহজেই কান্না পাওয়া, রাগ বা বিরক্তিবোধ, মাথাব্যথা, শরীর ফুলে যাওয়া, স্তনে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং ক্লান্তি।" [The Worldbook Encyclopedia. আরো দেখুন- The Grolier Encyclopedia] নারীর এই ৫/৬ দিনের অসুস্থতা প্রতি মাসে চলতে থাকে তার মধ্য বয়স পর্যন্ত। এরপর

www.pathagar.com

৪৫-৫০ বছর বয়সে ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এটাকে বলে মেনোপজ। এ সময়েও শুরু হয় বেশ কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন। "ঋতুস্রাব স্থায়ীভাবে বন্ধ হবার মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলো হল উৎকণ্ঠা, বিমর্ষতা, রুক্ষ মেজাজ, কর্মস্পৃহা কমে যাওয়া, মনোযোগে ঘাটতি এবং দুশ্চিন্তা।"[The Worldbook Encyclopedia. আরো দেখুন-The Grolier Encyclopedia] নারী রাষ্ট্র-প্রধান বা সরকার প্রধান হলেও প্রকৃতি তাকে ঋতুস্রাব বা স্থায়ী ঋতুবিরতি জনিত অসুস্থতা থেকে নিষ্কৃতি দেবে না। এ ধরণের মনস্তাত্ত্বিক সংকটকালে তার গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

বিষয়টি যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে, সেহেতু সামগ্রিকভাবে ইসলামী শাসকের প্রকৃতি এখানে বিবেচ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক শুধুই রাষ্ট্র-প্রধান হবেন না, তিনি দেশের প্রধান ইমাম এবং সামরিক প্রধান। জাতীয় মসজিদে জুম্মার নামায এবং জাতীয় ঈদগাহে ঈদের নামাযে তাকেই ইমামতি করতে হবে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নারীর পক্ষে পুরুষের সামনে থেকে রুকু-সিজদা করা শালীনতার পরিপন্থী এবং ইবাদতে পুরুষের মনযোগ নষ্ট করতে সহায়ক। তাছাড়া, নারীর সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়াটা প্রকৃতির দাবীকে অগ্রাহ্য করার শামিল। তাইতো দেখা যায়, পাশ্চাত্যের কোন দেশেও নারীকে আজ পর্যন্ত এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

নারীর মাতৃত্ব এক অনিবার্য বাস্তবতা। একজন নারী যখন গর্ভবতী হন, তখন দীর্ঘ সময় তার পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরপর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্তান প্রসব। ইসলাম বলে, মাতৃদুগ্ধ হল সন্তানের অধিকার। এই অধিকার থেকে শিশুকে বঞ্চিত করার এখতিয়ার কারো নেই। এরপর আসে সদাচার ও সততা শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব। অতএব, নারীর পক্ষে মা ও রাষ্ট্র-প্রধান উভয় দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। পক্ষান্তরে, পুরুষের পক্ষে পিতা ও দেশনেতার দায়িত্ব একই সাথে পালন করা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, নারীকে কখনো সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার দেওয়া হয়নি; বরং তাকে অস্থাবর সম্পত্তির মত ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতায় তাদেরকে বিক্রয় করা হত; আরবে অন্যান্য সম্পত্তির মত সৎমায়েদেরকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেওয়া হত। মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে ইউরোপীয় নারী উত্তরাধিকার, সম্পদের মালিকানা, হস্তান্তর— প্রভৃতির অধিকার লাভ করে। অথচ আরো ১৩শ' বছর আগে ইসলাম নারীকে এই অধিকার প্রদান করেছিল।

ক) উপার্জন ও সম্পদের মালিকানা

আল্লাহ্ ঘোষণা করেনঃ "পুরুষ যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ।"[সূত্রঃ আল কুরআন- ৪ঃ৩২] দেখা যাচ্ছে, নারীর উপার্জিত সম্পদ একান্তই তার। সে-সম্পদ ভোগ-দখল বা হস্তান্তর করার অধিকার তার স্বামী, পিতা, ভাই কিংবা আর কারো নেই। নারী যে উপার্জন করতে পারে, সে-ইঙ্গিতও ঐ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। হাদীস শাস্ত্র পাঠে আমরা জানতে পারি, ইসলামের সোনালী

www.pathagar.com

যুগে কিছু নারী ব্যবসায়-বাণিজ্য, কুটিরশিল্প এবং কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেছেন। তবে তারা তাদের প্রকৃত এবং প্রাকৃতিক কাজ তথা সন্তান প্রতিপালন ও পরিবার ব্যবস্থাপনাকে অবহেলা করে এ-সব করেননি।

খ) দেনমোহর

বিয়ের সময় বর তার নববধুকে নগদ অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান করে। একেই বলে দেনমোহর। এটি দয়ার দান নয়, বরং স্ত্রীর অধিকার যা প্রদান করতে স্বয়ং আল্লাহ স্বামীদের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই দেনমোহর প্রদান করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। এটি প্রদান না করলে বিয়ে বৈধ হয় না। আল্লাহ তা'লা নির্দেশ দেন-
"স্ত্রীদের প্রাপ্য মোহরানা তাদেরকে প্রদান কর আন্তরিক খুশির সাথে এবং তাদের অধিকার মনে করে।" [সূত্রঃআল কুরআন - ৪ ঃ ৪]
মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-"যে লোক কোন মেয়েকে কম বেশি পরিমাণের মোহরানা দেবার ওয়াদায় বিয়ে করে অথচ তার মনে স্ত্রীর সে হক আদায় করবার ইচ্ছা থাকে না, সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সম্মুখে ব্যভিচারী রূপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।"
দেনমোহরের পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ হওয়া উচিত নয়। বরের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আকর্ষণীয় পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা উচিত। স্বয়ং আল্লাহ বেশি মোহর প্রদানকে উৎসাহিত করে বলেছেন- 'তোমরা তোমাদের এক এক স্ত্রীকে মোহরানা দিচ্ছ বিপুল পরিমাণে' [সূত্রঃ আল কুরআন-৪ঃ২০]

গ) সম্পত্তির উত্তরাধিকার

কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পর পুরুষের মত নারীও উত্তরাধিারসূত্রে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি লাভ করবে। আল কুরআনে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেনঃ "পুরুষদের অধিকার রয়েছে সে-সম্পদে যা রেখে গেছেন মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়গণ। নারীদেরও অধিকার রয়েছে সে সম্পদে যা রেখে যান মাতা-পিতা এবং নিকটাত্মীয়গণ। এ সম্পদ অল্প হোক বা বেশি। অংশ নির্ধারিত রয়েছে।"[সূত্রঃ সূরা আন্ নিসাঃ রুকু ১১] এই অংশ ঠিকমত হস্তান্তর করার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "আমি নির্দিষ্টভাবে তোমাদেরকে দুই দুর্বলের সম্পত্তি থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। এদের একজন হল নারী আর অপরজন ইয়াতিম।"[ইবনে কাসীর। প্রথম খণ্ড। পৃ-৪৫৬]

নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অভিযোগের পর্যালোচনা

বলা হয়ে থাকে, ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে; উত্তরাধিকারের নীতি কি এই দাবীকে অসার প্রমান করে না? কন্যাকে পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি দেওয়া কি সুস্পষ্ট বৈষম্য নয়? এই তথাকথিত বৈষম্যের কারণ এখানে উল্লেখ করা হলঃ
আপাতদৃষ্টিতে কন্যার তুলনায় পুত্রের দ্বিগুণ উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টিকে আপত্তিকর মনে হচ্ছে বটে। তবে ইসলাম নারী-পুরুষের উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেগুলি বিবেচনায় রাখলে এই ব্যবস্থাকে সুবিচার এবং সুবিবেচনাপ্রসূত বলে স্বীকার করতেই

www.pathagar.com

হবে। প্রথমেই একটি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা হল, দায়িত্বের প্রকৃতি অনুসারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাই ইনসাফের দাবী। প্রতিটি দেশের গণকর্মচারীদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তাদের কাজের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে। পার্বত্য অঞ্চলে কর্মরত ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়, ঝুঁকিবহুল পেশায় যারা নিয়োজিত তাদেরকে ঝুঁকি-ভাতা দেওয়া হয়, বড় বড় নগরীতে কর্মরত লোকদেরকে তুলনামূলকভাবে বেশি বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়- এসব সুযোগ মর্যাদার মাপকাঠি নয়, বরং প্রয়োজন অনুসারে সুযোগের ভিন্নতা সৃষ্টির বাস্তব নমুনা।

তেমনিভাবে, ইসলাম নারী-পুরুষকে পৃথক পৃথক দায়িত্ব প্রদান করেছে আর এই পার্থক্যকে বিবেচনায় রেখে উপায়-উপকরণের ভিন্নতা এনেছে। যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব ইসলাম অর্পন করেছে পুরুষের উপর। মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তানাদির খাওয়া-পরার ব্যবস্থা গ্রহণ, বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামত, শিক্ষা খাতে ব্যয়, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন, পরিজনদের উপর ধার্যকৃত ফিৎরা প্রদান, নবজাতকের আকিকা প্রদান, ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবের ব্যয় নির্বাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ভার বহন— সকল দায়িত্ব ইসলাম অর্পণ করেছে পুরুষের উপর। এ হল দারুণ ব্যয়বহুল একটি দায়িত্বের বোঝা ।

নারীর উপর ইসলাম কোন আর্থিক দায়িত্ব অর্পণ করেনি। নিজের পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তানের দেখাশোনা, খোর-পোষের কোন দায়িত্ব ইসলাম নারীকে দেয়নি। স্ত্রীর যত সম্পদই থাক, সংসার চালানোর জন্য স্বামী তা দাবী করতে পারে না। এ সম্পদ একান্তই তার। তার বিনাঅনুমতিতে এর এক কপর্দকও ব্যবহার করার অধিকার স্বামীর নেই। পক্ষান্তরে, স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে কোন প্রকার কার্পণ্য করে, তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই স্ত্রী নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, নারী উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পেলেও তা অটুট থাকছে। পক্ষান্তরে, পুরুষের সম্পত্তি থেকে ব্যয়িত হচ্ছে নানা খাতে। এখন প্রশ্ন, যার উপর যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব চাপানো হল, আর যাকে তা দেওয়া হল না, তাদেরকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া কি সুবিচার হতে পারে?

ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে যেটি ভাল কাজ, তা নর-নারী উভয়ের জন্য ভাল; যা মন্দ, তা-ও উভয়ের জন্যই। কুরআন-সুন্নাহ্য় নারী-পুরুষ উভয়কে যেমন একই রকম পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া, তেমনি পাপকর্মের শাস্তিতেও কোন বৈষম্য নেই। যেমন, আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেনঃ "চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক, তার হাত কেটে দাও।" [সূত্রঃ সূরা আল মায়িদা ঃ ৩৮]

ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, ভারতীয়- সব সভ্যতায় আমরা দেখেছি, নারীর ব্যভিচার ছিল চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ পুরুষের জন্য এটা কোন অপরাধই ছিল না। ইসলাম এ-ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা বিধান করেছে। আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেনঃ "ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়কে একশ কষাঘাত করবে।" [সূত্র ঃ সূরা আন্ নূর ঃ আয়াত-২] বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করলে তার শাস্তি হল পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা, বিবাহিতা নারীর শাস্তিও তাই।

www.pathagar.com

নারীর সম্মানকে ইসলাম এতটা মূল্যবান মনে করে যে, তার প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আঘাত বরদাশত করে না। কেউ যদি কোন সচ্চরিত্রা নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তবে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ঘোষণা করছেনঃ "যারা কোন সতী-সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তবে তাদেরকে আশিটা কষাঘাত করবে, আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।"[সূত্রঃ সূরা আন্ নূরঃ ৪]

কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে, সে-ক্ষেত্রে বাইবেল নারীকে অগ্নিপরীক্ষার মত কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে; কুরআন দিয়েছে খুবই যুক্তিসঙ্গত এক বিধান। বাইবেল স্বামীর অভিযোগ সত্য ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়। নারীর উপরে দায়িত্ব পড়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করার। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ধর্মযাজক তাকে ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত, তিক্ত পানি পান করাতে থাকবেন যতক্ষণ না তার পেট ফুলে যায়। কুরআন শুধু স্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে না। বরং প্রথমে স্বামীকে নির্দেশ দেয় তার অভিযোগের সপক্ষে আরো তিনজন সাক্ষী হাজির করতে। এটা করতে যদি সে অপারগ হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে লেয়ান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা হল, নিজের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ ডেকে আনা। প্রথমে স্বামী চারবার আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে যে, তার অভিযোগ সত্য। পঞ্চমবার বলবে, তার দাবী মিথ্যা হলে তার উপরে যেন আল্লাহ্র অভিশাপ নেমে আসে। স্ত্রীও চারবার আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করবে। পঞ্চমবার সে একই ভাবে বলবে, তার দাবী যদি মিথ্যা হয়, তাহলে যেন তার উপরে আল্লাহ্র অভিশাপ নেমে আসে। এরপর স্ত্রীকে নির্দোষ ঘোষণা করা হবে। তাদের মধ্যে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ইহকালে অথবা পরকালে তাঁর ইচ্ছামত শাস্তি দেবেন। তবে বিচারক তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।

নারীর সাক্ষ্য সম্পর্কিত অভিযোগের পর্যালোচনা

এই পর্যায়ে একটা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তা হল- আইনের দৃষ্টিতে যদি নারী-পুরুষ সমান হয়, তবে দু'জন নারীর সাক্ষ্য কেন একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান? এখানে সম্ভাব্য কারণগুলি তুলে ধরছি।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করাটা মর্যাদার মাপকাঠি নয়। বরং জেরার সময় উকিল সাহেবরা অনেক কটু কথা, মিথ্যাচারের অভিযোগ, ব্যক্তিত্বের দুর্বল দিক, অপ্রিয় অতীত ইত্যাদি টেনে আনেন। এতে বরং সম্মানীয় ব্যক্তিরা অপমাণিত বোধ করে থাকেন, জনসমক্ষে তাদের মাথা হেট হয়ে যায়। তাই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন কোন লোকই কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পছন্দ করবেন না।

আর্থিক লেনদেন, চুক্তি ইত্যাদির সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দু'জন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমান বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইসলামি সমাজে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। নারীকে পরিবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। অতএব, ইসলামী সমাজে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারগুলি পুরুষের কিছুটা বেশি বুঝা স্বাভাবিক। বিশ্বখ্যাত ইসলাম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক এ-প্রসঙ্গে সুন্দর এক উদাহরণ দিয়ে থাকেন। ধরা যাক, কোন রোগীর অপারেশনের জন্য দু'জন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ প্রয়োজন। যদি দক্ষ সার্জন পাওয়া যায় একজন, তাহলে অপরজনের বিকল্প হিসাবে দু'জন সাধারণ এম,বি,বি,এস, ডিগ্রীধারী ডাক্তারের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পরে। তেমনিভাবে, আর্থিক লেন-দেনের ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু'জন পুরুষ সাক্ষী কাম্য। তাদের কোন একজনের বিকল্প হিসাবে দু'জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করাটা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

সাক্ষী সম্পর্কে কুরআনে সাত জায়গায় কথা বলা হয়েছে। আর্থিক লেনদেন বিষয়ক দু'টি আয়াত ছাড়া অন্য পাঁচটিতে বলা হয়নি সাক্ষী পুরুষ হবে কি নারী। এ-থেকে অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদ্ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। অনেকে আবার সূরা সূরা আল বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াতকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে দাবী করেন, সবক্ষেত্রেই দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। কিন্তু কুরআনের অন্য একটি আয়াত তাঁদের এই দাবীর অসারতা প্রমান করছে। সূরা আন্ নূর এর ৬ষ্ঠ আয়াতে বলা হচ্ছেঃ "যদি স্বামী অথবা স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং কোন সাক্ষী না পায়, তবে তাদের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।" এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন অনেক বিচারকার্য সমাধা করেছেন, যেখানে তিনি শপথের ভিত্তিতে মাত্র একজন পুরুষ বা একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে রায় দিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে নারীই কেবল সাক্ষ্য দিতে পারে; পুরুষের সাক্ষ্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। নারীর যেসব বিষয় পর-পুরুষের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেসব ব্যাপারে আদালতে সাক্ষ্য কেবল নারীই দিতে পারে; এক্ষেত্রে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

পর্দা সংক্রান্ত অভিযোগের পর্যালোচনা

অনেকে মনে করেন, ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা নারীর অমর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনটি মনে করার মূল কারণ হল পর্দা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা না থাকা। এরা মনে করেন, পর্দা শুধু নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথচ পুরুষও পর্দার আওতার বাইরে নয়। বরং নারীর আগে পুরুষকেই পর্দা পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল কুরআনের সূরা আন্ নূর-এ প্রথমে পুরুষকে বলা হয়েছে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে (দ্রঃ আয়াত-৩০), এরপর নারীকে দেওয়া হয়েছে এই একই নির্দেশ (দ্রঃ আয়াত-৩১)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, কোন নারীর প্রতি সহসা দৃষ্টি পড়লে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করতে। [সূত্রঃ মিশকাত শরীফ। ৬ষ্ঠ খন্ড। হাদীস নং-২৯৭৬] অনুমতি না নিয়ে কারো বাড়িতে বা ঘরে প্রবেশ করতে কিংবা উঁকি দিতে পুরুষকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। [সূত্রঃ আল-

www.pathagar.com

আদাবুল মুফরাদ] এমনকি বিশ্রামের সময়, যখন পোশাক সংযত থাকে না, অনুমতি না নিয়ে নিজের মায়ের ঘরে প্রবেশ করাও পুরুষের জন্য জায়েয নয়। [সূত্রঃ আল-আদাবুল মুফরাদ] বিবাহে বাধা নেই এমন কোন নারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত করতে পুরুষকে নিষেধ করা হয়েছে। [সূত্রঃ সহীহ আল বুখারী, নং-৪৮৫৬] এসব হল পর্দার আচরণগত দিক। পোশাকী পর্দা থেকেও পুরুষকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত রাখা পুরুষের জন্য ফরজ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষকে তার উরু অন্য কোন পুরুষের সামনেও প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। [সূত্রঃ মিশকাত শরীফ। ৬ষ্ঠ খণ্ড। হাদীস নং-২৯৮০] সঙ্গত কারণেই পোশাকী পর্দায় নারীর প্রতি বেশি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নারীর গোটা দেহেই রয়েছে দুর্বার আকর্ষণী শক্তি। তাছাড়া, সে শারীরিকভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বল। অতএব, তার সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনও বেশি।

অনেকে মনে করেন, নারীকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখাই পর্দার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটাও বহুল প্রচলিত এক ভুল ধারণা। নারী ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদে, ঈদগাহে, এমনকি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হজ্জ বা উমরা করতে যেতে পারে। সামাজিক প্রয়োজনে বিবাহে, রোগীর সেবায় বা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। নারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করতে পারে। জাতীয় প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রার সুযোগও ইসলাম তাকে প্রদান করেছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে নারীরা এ সকল সুযোগ ভোগ করেছেন। এক্ষেত্রে একটি বিষয় তাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, পর-পুরুষের সান্নিধ্য তার জন্য বর্জনীয়। ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, পুরুষকেও নারীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে যেটা নিষিদ্ধ সেটা নারীর বাইরে চলাফেরা নয়, বরং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। কারণ, এটা থেকে অসংখ্য সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। নর-নারীর অবাধ মেলামেশা থেকে ক্রমশঃ ব্যভিচারের বিস্তার ঘটে। আজ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এমন একজন মানুষ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, যে কখনো ব্যভিচার করেনি। ব্যভিচারের এই ব্যাপকতার কারণে পাশ্চাত্যে হাইস্কুলে পড়ুয়া কিশোরীরা পর্যন্ত গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। এটার ব্যাপকতা বুঝাতে সমাজবিজ্ঞানীরা "teen age pregnancy epidemic" বলে থাকেন। জন্মনিরোধক সামগ্রী সরবরাহ করেও সরকার তারুণ্যে গর্ভধারণের মহামারী রোধ করতে পারছে না। এটার কারণে এক দিকে যেমন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গর্ভপাত তথা ভ্রূণহত্যা করা হচ্ছে, অন্য দিকে জারজ সন্তানের জন্ম হচ্ছে ব্যাপক হারে। তাছাড়া, ধর্ষণ, সমকামিতাসহ নানা রকম যৌনবিকৃতি, এইডসসহ নানা রকম প্রাণঘাতী যৌনরোগ মহামারী আকার ধারণ করে। পর্দাহীনতার পথ ধরে সমাজে বিস্তার ঘটে পরকীয় প্রেম, পারিবারিক দ্বন্দ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি পারিবারিক সমস্যার। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে উল্লেখিত প্রত্যেকটা সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

www.pathagar.com

পর্দা নারীর জন্য অমর্যাদাকর নয়, বরং তার মর্যাদার রক্ষাকবচ। কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিচ্ছেন-

হে নবী, তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন লোকদের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের উপরে তাদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটি উত্তম ব্যবস্থা, যেন তাদেরকে (পবিত্রা নারী হিসাবে) চিনতে পারা যায় এবং উত্যক্ত করা না হয়। [সূত্রঃ সূরা আল আহ্যাব। আয়াত-৫৯]

পর্দাহীন নারীর সম্মান কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা কোন মুসলিম সমাজে বসে ধারণাও করা সম্ভব নয়। ইউরোপ-আমেরিকার একেকটা দেশে ধর্ষণের হিসাব কষা হয় দিন বা ঘণ্টায় নয়, বরং মিনিটে বা সেকেন্ডে। তাছাড়া, পর্দা-ব্যবস্থা নারীর সহজলভ্য হবার পথে এক বড় অন্তরায়; আর এ-কথা ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না যে, জগতে যে জিনিস যত সহজলভ্য তার গুরুত্ব বা মর্যাদা দেওয়া হয় তত কম। আরেকটা লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, পর্দাহীন নারীকে শিল্পে-সাহিত্যে, সিনেমা-নাটকে, ফ্যাশানে-বিজ্ঞাপনে যৌন-আবেদনময়ী হিসাবে উপস্থাপন করা হতে থাকে। এর ফলে পুরুষের অবচেতন মনে নারীর যৌন-আকর্ষণ মুখ্য অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পর্দাহীন সমাজে পুরুষেরা নারীকে ভোগের সামগ্রী (sex object) ছাড়া আর কিছু ভাবতে শেখে না। এটা নারীর জন্য সম্মানজনক নয়; বরং চরম অবমাননাকর।

শেষকথা

সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইসলাম ব্যতীত অপর কোন সভ্যতা নারীকে দেয়নি তার উপযুক্ত প্রাপ্য। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে অনেক কিছু দিতে চেয়েছে; কিন্তু তার স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় সংকটের শুধু মাত্রাবৃদ্ধিই হয়েছে। অন্যান্য সভ্যতা নারীকে তেমন কিছুই দিতে চায়নি। তাকে দেওয়া হয়নি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের নিরাপত্তা। তাকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, দেওয়া হয়নি সম্পদের মালিক হবার অধিকার। ন্যায় বিচার লাভের কোন সুযোগ তাকে দেওয়া হয়নি। মত-প্রকাশের স্বাধীনতা তার জন্য ছিল অকল্পনীয়। অনেক সভ্যতায় নারীর আত্মা আছে কি-না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ইসলাম নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করেছে তার জন্মের সাথে সাথেই। কন্যা-সন্তানের জন্মকে সৌভাগ্যসূচক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কন্যার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পিতা-মাতাকে নিষেধ করা হয়েছে। স্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে, স্বামীর উপরে তার ততটা অধিকার রয়েছে, যতটা রয়েছে তার উপরে স্বামীর। তাছাড়া, স্ত্রীর প্রতি আচরণকে স্বামীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড বলে ঘোষণা করা হয়েছেঃ যে ভাল আচরণ করে সে উত্তম, আর যে দুর্ব্যবহার করে সে অধম। মাতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার পদতলেই জান্নাত। সন্তানের সদ্ব্যবহার পাবার অধিকার মাতাকে দেওয়া হয়েছে পিতার তুলনায় তিন গুণ। এছাড়া, পাপ-পুণ্যে পুরুষের সমান প্রতিফল নির্ধারিত রয়েছে নারীর জন্য। ইসলামী আইনে একই ধরণের অপরাধে নারী-পুরুষের সমান শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। নারীকে দেওয়া হয়েছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, উপার্জন ও সম্পদের মালিকানা লাভের

www.pathagar.com

অধিকার। নারীর রয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকার। ইসলাম নারীর শিক্ষা গ্রহণকে পুরুষের মতই বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। সর্বোপরি, ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূল ঝুঁকি ও ঝামেলামুক্ত, আবেগঘন, শান্তিময় জীবনের নিশ্চয়তা। তাইতো দেখি, ইসলাম নারীকে তেমন কোন মর্যাদা দেয়নি— এই মর্মে ব্যাপক অপপ্রচার সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্বে পুরুষের তুলনায় নারীর ইসলাম গ্রহণের হার অনেক বেশি। ■

সহায়ক-গ্রন্থাবলী

ইমাম ইবনে জরীর তাবারী (রঃ)। তাফসীরে তাবারী শরীফ। ৭ম খণ্ড। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (রঃ)। তাফসীরে ইবনে কাসীর। ২য় খণ্ড। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (রঃ)। তাফসীরে ইবনে কাসীর। ৩য় খণ্ড। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রঃ)। তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন। ২য় খন্ড ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রঃ)। তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন। ৮ম খন্ড ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

ইমাম মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল বুখারী (রঃ)। আল আদাবুল মুফরাদ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

ইমাম আবু আবদির রহমান আন-নাসাঈ (রঃ)। সুনানু নাসাঈ শরীফ। ৪র্থ খণ্ড। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাজাহ্ (রঃ)। সহীহ্ ইবনে মাজাহ্। ২য় খণ্ড। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

ইমাম ইয়াহইয়া নববী (রঃ)। রিয়াদুস সালেহীন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

আল্লামা ইযযুদ্দিন বালীক (রঃ)। মিনহাজুস সালেহীন। ১ম খণ্ড। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ)। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৪র্থ খণ্ড। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

সম্পাদনা পরিষদ। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন। ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ। অনুঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন জালালাবাদী। ৩য় সংস্করণ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।।

মাওলানা আব্দুর রহীম। পরিবার ও পারিবারিক জীবন। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা।

তৌরাত শরীফ (বাংলা অনুবাদ)। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা।

ইঞ্জিল শরীফ (বাংলা অনুবাদ)। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা।

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। নারীর পথে। ১২শ সংস্করণ। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস। ঝাড়খণ্ড, ভারত।

রাহুল সাংকৃত্যায়ণ। মানব সমাজ। অনুঃ মহিদুল ইসলাম। সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা।

দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে। সাহিত্যলোক। কোলকাতা, ভারত।

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত)। ভারত-ইতিহাসে নারী। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ। কোলকাতা, ভারত।

The World Almanac-2002

"ancient Rome." Encyclopaedia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 2009.

"menstruation." "menopause." The World Book Encyclopaedia.

"menstruation." "menopause." Year 2000 Grolier Multimedia Encyclopedia. Deluxe Version 12.00

"rape" The Encarta Encyclopaedia. Microsoft Corporation, U.S.A.

Jerry H. Bentley & Herbert F. Ziegler. Traditions Encounters. 2nd edition. Vol-1. McGraw-Hill Co. Newyork, U.S.A.

www.pathagar.com

Dennis Sherman & Joyce Salisbury. The West in the World. McGraw-Hill Company. Newyork, U.S.A.
Judith G. Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Lerner & Standish Meacham. Western Civilizations. 14th edition. W.W. Norton & Company. Newyork. U.S.A.
Social Problems. Annual Edition-02/03. McGraw-Hill Company. Newyork, U.S.A.
Hilary M. Lips. A New Psychology of Women. 2nd ed. McGraw-Hill Company. Newyork. U.S.A.
Reginald Bibby, Donald Postersky. Teen Trends. Stoddart. Canada.
Robert A. Baron and Donn Byrne. Social Psychology: Understanding Human Interaction. 7th edition. Prentice Hall. U.S.A.
Abortion Statistics, England and Wales: 2006. Department of Health. U.K.

লেখক-পরিচিতি : জনাব খোন্দকার রোকনুজ্জামান - বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২০ মার্চ, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার অবসান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ

ড. মাহফুজ পারভেজ

এক.

শুধু বাংলাদেশেই নয়, কিছু সাম্প্রদায়িক ও উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাসকার ব্যতিত সকল সৎ, যোগ্য এবং প্রজ্ঞাবান ঐতিহাসিক একবাক্যে বলেছেন যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সকল ষড়যন্ত্র আর বিদ্বেষের জাল জগৎশেঠের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছিল। রবার্ট ক্লাইভ স্বয়ং লিখেছেন, "কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি চক্রান্তের পেছনে থাকলেও আসল নেতৃত্ব দিয়েছিল জগৎশেঠ নিজে।" (শিকদার, ২০০৬: ৪০) মঁশিয়ে জা ল প্রমুখ সমকালীন-নিরপেক্ষ ইতিহাসকার লিখেছেন, অনেক দিন ধরে বাংলায় যে সব রাজনৈতিক বিপ্লব হয়েছে তার প্রধান হোতা ছিল জগৎশেঠ। ... ইংরেজরা যা করছে (পলাশীর কথিত যুদ্ধবিজয় এবং বাংলা-ভারতে উপনিবেশ স্থাপন) তা জগৎশেঠের সমর্থন ছাড়া কখনো করতে পারত না।" (প্রাগুক্ত)

কে বা কারা এই জগৎশেঠ, সেটা জানা দরকার। শেঠরা বাংলাভাষী এবং বাংলাদেশের লোক নয়। তারা উত্তর ভারতের যোধপুরের নাগোর এলাকার মানুষ। জৈন ধর্মের অনুসারী, হীরানন্দ তাদের পূর্ব পুরুষ। প্রথমে তারা ভাগ্যান্বেষণে বিহারের পাটনায় আসে। হীরানন্দের পুত্র মানিক চাঁদ ঢাকায় তার গদি স্থাপন করে।

এ পর্যায়ে তৎকালীন শাসক মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে তাদের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। মুর্শিদকুলী খানের অনুগমন করে তারা নতুন শহর মুর্শিদাবাদে এসে জেঁকে বসে। বাদশাহ্ ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে তারা শেঠ উপাধি লাভ করে মুর্শিদকুলী খানেরই বদৌলতে। ইতিমধ্যে সারা ভারতের প্রধান প্রধান নগরীতে শেঠদের গদি স্থাপিত হয় এবং চলতে থাকে অর্থলগ্নী ও সুদের ব্যবসা। বলা বাহুল্য, সে যুগে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলিত না থাকায় জগৎশেঠরা অলিখিত ব্যাংকার হিসাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চালাতে সচেষ্ট হয়। ১৭২২ সালে মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে ভাগিনা ফতেচাঁদ প্রথম 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং তার মৃত্যু হলে তদীয় পৌত্র মাহতাব চাঁদ জগৎশেঠ খেতাব পায়। অপর শেঠ স্বরূপচাঁদ লাভ করে মহারাজ খেতাব। শেঠদের গদিতে তৎকালীন সময়ের বাজার মূল্যে ১০ কোটি টাকার লেনদেন হত। এহেন জগৎশেঠরা পলাশী বিপর্যয়ের নেপথ্য কারিগর-ষড়যন্ত্রের হোতা।

মূলত নবাব সুজাউদ্দিনের সময় থেকেই এরা নানা অপকর্মে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীতে নবাব আলীবর্দী তাদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখেন বটে, কিন্তু শেঠরা ঘাপটি মেরে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চলাতে থাকে এবং রাষ্ট্রের সংহতির শিকড় কাটতে থাকে। শেঠরা নবাব পরিবারের মধ্যে অর্থ, ঘুষ ও কুমন্ত্রণা দিয়ে নানা উপদল তৈরি করে এবং একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। যে বিভক্তির কারণে তারা ইংরেজদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। বিশেষ করে তরুণ নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে এরা প্রথম থেকেই ছিল খাপ্পা। যে কারণে তারা সিরাজের জন্য দিল্লি থেকে সনদ আনানোর ব্যাপারে চরম উদাসীনতা ও গড়িমসি প্রদর্শন করে। এরা প্রথমে শওকতজঙ্গ, পরে ইয়ার লতিফ ও সর্বশেষ মীর জাফরকে বাংলার নবাব বানানোর প্রজেক্ট গ্রহণ করে। কারণ নবাব সিরাজ ছিলেন লুটেরা-শোষক শেঠদের সীমাহীন নির্যাতন, কায়েমী স্বার্থ ও নীচুতার প্রতিবন্ধক। ফলে তারা নবাব পদে সিরাজকে সহ্য করতে পারেনি এবং নিজেদের বশংবদ একজনকে নবাব বানাতে বদ্ধ পরিকর হয়। এরাই পুরো ষড়যন্ত্রটি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে এবং ইংরেজ ও প্রাসাদের ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে দূতিয়ালী ও সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। এবং অবশেষে ঔপনিবেশিক ইংরেজ ও স্থানীয় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সম্পাদিত হয় বাংলার স্বাধীনতা-বিনাশী গোপন চুক্তি। আর এভাবেই পদদলিত হয় বাংলার স্বাধীনতা। (উইকিপিডিয়া)

দুই.

১৭৫৭ সালের ষড়যন্ত্রমূলক পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজদ্দৌলাহর পতন, বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়া এবং ইংরেজ উপনিবেশিক অপশক্তি কর্তৃক আমাদের দীর্ঘমেয়াদী আক্রান্ত ও পরাধীন হওয়া সর্ম্পকে প্রধানত তিনটি গ্রন্থের সূত্রে ইতিহাস চর্চিত হয়। গ্রন্থত্রয় প্রচণ্ডভাবে সিরাজ-বিদ্বেষ পোষণ করে তৎকালীন চিত্র জানিয়েছে। ফলে ইতিহাসের বিকৃতি ও পক্ষপাত গোড়া থেকেই পুরো পরিস্থিতিকে আচ্ছন্ন করেছে। এ

www.pathagar.com

কারণে, মূল ঐতিহাসিক সত্যের কাছে পৌছার পূর্বে গ্রন্থ তিনটি সম্পর্কে আলোকপাত করা সঙ্গত হবে।

গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে সবচেয়ে নবীন হলো অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত নাটক সিরাজউদ্দৌলা' যা সাহিত্যের অংশ, ইতিহাসের বিষয় নয়। সাহিত্যের সত্য বা বাস্তবতা আর ইতিহাসের সত্য বা বাস্তবতা একই বিষয় নয়। ফলে বঙ্কিম বা সুনীল উপন্যাস বা নাটকের নামে বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিষয় চর্চা করেছেন, যেগুলো ঐতিহাসিক সত্য নয়। লেখকের কল্পনা, ধর্ম-বর্ণ অঞ্চলগত মনোভাবের প্রকাশ, ক্ষেত্র বিশেষে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। অক্ষয় বাবুর নাটকটি ইংরেজ আমলে লিখিত এবং ইতিহাস হিসাবে গবেষণাপ্রসূত বিবরণ নয়। ফলে এতে লেখকের নিজস্ব বিলাস, কল্পনা, বিশ্লেষণ বহুলাংশেই ঐতিহাসিক সত্যের পরোয়া না করেই লিখিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, শহরে-গ্রামে এ নাটক বহুলভাবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক সত্যের উপরে আসন লাভ করেছে।

অন্য দুটি গ্রন্থের রচয়িতাগণ প্রায় সমসাময়িক এবং সেগুলো লিখিতও হয়েছে ঘটনার পর পরেই। একটির নাম "রিয়াজ-উস-সালাতিন", লেখক গোলাম হুসেন সলীম। অপরটি "সিয়ার-ই- মুতাখখিরিন", লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন। রিয়াজ-রচয়িতা গোলাম হুসেন মুতাখখিরিন-রচয়িতা গোলাম হোসেন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও উভয়েই প্রায় এক সময়েই আপনাপন ইতিহাস সমাপ্ত করেন। রিয়াজ-রচয়িতা গোলাম হুসেন দরিদ্র গৃহস্থ। মুতাখখিরিন-রচয়িতা গোলাম হোসেন নবাব আলীবর্দীর আত্মীয় এবং সম্ভ্রান্ত ওমরাহের মধ্যে পরিগণিত।

আত্ম পরিচয় দান কালে রিয়াজ-রচয়িতা স্বয়ং লিখেন (সলীম ২০০৫ : ১৯),

"আমরা দীনদাস, মোহাম্মদের মধ্যস্থতার প্রার্থী, নাম গোলাম হুসেন, উপাধি সলীম ফকির, জৈদপুর, আমরা উচ্চপদাভিষিক্ত সম্মানভাজন সচ্চরিত্র, দয়ালু, ধীর স্বভাব, মহত্ত্ব ও ব্যবহারে প্রশংসনীয়, হাতেমের ন্যায় দানশীল, নওশেরওঁয়ার ন্যায় সদ্বিচারক এবং লোকপ্রিয়তা ও প্রশংসা সম্বন্ধে উদাসীন মিস্টার জর্জ উডনি মহোদয়ের নিকট কিছুকাল যাবৎ কর্মে নিযুক্ত হয়েছি।"

ইতিহাস-লেখকের এইরূপ বর্ণনা পাঠ করে গোলাম হুসেনকে অতিবাদপরায়ণ চাটুকার বলে অনেকেই অবজ্ঞা করেন। মিস্টার জর্জ উডনি কেবল অন্নবস্ত্রদানের জন্যই হুসেনের নিকট হতে এতদূর প্রশংসা লাভ করেননি। সিরাজউদ্দৌলা নাটকের রচয়িতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জানাচ্ছেন যে, "উডনির ইতিহাসনুরাগ প্রবল ছিল, এবং তাহার উত্তেজনাক্রমেই রিয়াজ-উস-সালাতিন রচিত হইয়াছিল।" (মৈত্রেয় ১৮৯৮)।

পলাশী যুদ্ধের ২৭ বছর পর উডনি সাহের ১৭৮৪ সালে নীলকুঠি অধ্যক্ষ হয়ে মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন মালদহ আগমন করেন। তখন তার বয়স ২৪ এবং ক্ষমতা ও তেজ বিপুল। গোলাম হুসেন জানাচ্ছেনঃ "সহৃদয় মিস্টার জর্জ উডনি পুরাতত্ত্ব ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত

www.pathagar.com

বিষয়ক গ্রন্থ সর্বদা পাঠ করতেন এবং সর্বপ্রকার জ্ঞান ও শিক্ষালাভে উৎসাহী ছিলেন। হিজরি ১২০০ সালে (ইংরেজি ১৭৮৬) তিনি বঙ্গদেশের স্বাধীন নরপতি ও শাসক কর্তৃপক্ষের জীবন বৃত্তান্ত ও কার্যক্রম জানার জন্য উৎসুক হন। এজন্য তিনি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ হতে তথ্য সংকলন করে জনসাধারণের বোধগম্য পারস্য ভাষায় বিবৃত করতে আদেশ দেন। আমরা বিদ্যাবুদ্ধিহীন, তথাপি প্রভুর নিয়োগ পালন করা কর্তব্য বলে এমন দুঃসাধ্য কার্য সম্পন্ন করতে স্বীকার করি। আমরা গ্রন্থ সংকলনে প্রবৃত্ত হয়ে নানা স্থান হতে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে দুই বৎসরকাল এ কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। হিজরি ১২০২ মোতাবেক ইংরেজি ১৭৮৮ (পলাশীর ৩১ বছর পর) সালে গ্রন্থ সমাপ্ত করে উহা রিয়াজ-উস-সালাতিন নামে অভিহিত করি।" (সালীম ২০০৫:২০)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোলাম হুসেন মিস্টার জর্জ উডনির অধীনে কি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, কোন স্থানে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। তদুপরি তিনি অযোধ্যা এদেশের লোক এবং নিজেকে কখনো বাঙালি মনে করতেন না। রিয়াজ উস সালাতিনে দেখতে পাওয়া যায়, গোলাম হুসেন মিস্টার জর্জ উডনি মহোদয়ের নিকট কালক্রমে কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর মাত্র দুই বছরের মধ্যেই কোন পূর্ব-প্রস্তুতি, পূর্ব-অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে এবং বহিরাগত ভিন্ন অঞ্চল-সমাজ-ভাষার লোক হয়েও পলাশী কেন্দ্রিক একটি জটিল ইতিহাস গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করা অস্বাভাবিক বিষয়।

এরূপ বহু অস্বাভাবিক বিষয়ই বাংলার ইতিহাস, বিশেষত পলাশী ও সিরাজদ্দৌলাকে আবর্তিত করে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা মূলত সিরাজ-পরবর্তী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিরাজকে কালিমালিপ্ত করার ইতিহাস বিকৃতি মাত্র। এহেন গ্রন্থ হতেই পরবর্তী ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ড সাহেব ইতিহাস সংকলন প্রণালীর আভাস প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক বেভারিজ এবং ব্লকম্যান রিয়াজ উস সালাতিনের যথাযোগ্য প্রশংসা করতে ত্রুটি করেননি। রিয়াজের ভূমিকাংশ থেকে তাদের প্রশংসা বাণী উদ্ধৃত করা হলে তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে:

মিস্টার বেভারিজ লিখেন: The publication by our society of the Riyaz-us-Salatin is a valuable contribution to the history of Bengal.

ব্লকম্যান তার Geography and History of Bengal গ্রন্থে লিখেন: The latest writer of Bengal History is Ghulam Hussain of Zaidpur poetically styled Salim, who compsoed his Riyaz us Salatin, the Garden of Kings at the request of Mr. George Udny of Maldha. This work, the title of which contains in the numerical value of the letter the date of its completion (A.B. 1202 or A.D 1787-88) is rare, but is much prized as being the fullest account in Perisian of the Mohamedan History of Bengal, which the author brings down to his own time.

www.pathagar.com

অতএব, বাংলার ক্ষেত্রে ইতিহাস বিকৃতির সূচনা ১৭৫৭ সালের পলাশীর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মতো লেখকও অন্যভাবে যে সত্যটি স্বীকার করেছেন (মৈত্রেয়):

'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যাহা কিছু বাঙ্গালার ইতিহাস নামে পরিচিত, তাহার অধিকাংশই বাঙ্গালীর লেখনী প্রসূত নহে। যাহা বা বাঙ্গালীর লেখনী প্রসূত তাহাও বিদেশীয় লেখকবর্গের চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র।'

ইতিহাস বিকৃতির ধারাবাহিকতায় কবি নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে ইংরেজের জয়গান এতই কুরুচিপূর্ণভাবে গেয়েছেন যে, প্রসঙ্গটির উল্লেখপূর্বক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেন:

'সেকালে ইংরেজ ও বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সিরাজের নামে কত অলীক কলংক রটনা করিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিচিত নহে। অবসর পাইলে একালের প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবকগণ এখনো কত নূতন নূতন রচনা কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, পলাশীর যুদ্ধ উহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহা সেকালের লোকেও জানিত না, যাহা সিরাজউদ্দৌলার শত্রুদলও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না- এ কালের লোকে তাহারও অভাব পূরণ করিতে ইতস্তত করিতেছে না।'

তিন.

নবাব আলীবর্দী খান মহবত জং যখন মারা যান তখন জয়েন উদ-দীন আহমদ খানের পুত্র, আলীবর্দীর দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নিজামতের মসনদে বসেন। আলীবর্দী জীবিতকালেই সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেছিলেন এবং সিরাজকে নিজামতের মসনদে বসিয়ে আলীবর্দী নিজে এবং দরবারের অন্য আমিরগণ আনুগত্য দেখিয়েছিলেন ও উপহার দিয়েছিলেন। রিয়াজে লিখা হয়েছে (সালীম ২০০৮ : ১৮৫) : সিরাজ ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা দেখাতেন। এ অভিযোগের ব্যাপারে সমকালীন অন্যান্য ঐতিহাসিক (যারা সিরাজ পরবর্তী ইংরেজ শাসকদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন) একই মত পোষণ করেছেন। যেমন, 'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর গ্রন্থে সিরাজকে লঘুচিত্ত, একগুঁয়ে, বদ-মেজাজী, অধীর ও বদ-জবান এবং কাউকে রেহাই দিয়ে কথা বলতেন না' বলা হয়েছে।

সিয়ার উল মুতাখখিরিন এ (২য় খন্ড, ৬২০ পৃ.) বলা হয়েছে : "সিরাজ কর্কশ ও অভদ্র কথাবার্তা এবং সরকারি কর্মচারিদের ঠাট্টা ও উপহাস করায় সকলের মনে ক্ষোভ ছিল।"

কেবল এগুলোই যদি সিরাজের অপরাধ হয় এবং তাঁর পাপের তালিকা যদি এতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এত লঘু পাপে বাংলার সিংহাসন বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া, এত বড় দণ্ড দেওয়া হল কেন, এমন জিজ্ঞাসার উদ্বেগ হওয়া সমীচীন। আসলে সিরাজ উত্তরাধিকার সূত্রে ষড়যন্ত্র ও দুর্ভাগ্যের ভাগীদার ছিলেন। সে সময় আলীবর্দীর অপর

www.pathagar.com

কন্যা নওয়াজেশ আহমদ খান সাহামত জং এর বিধবা ঘসেটি বেগম কতগুলো কারণে সিরাজের বিরোধিতা করেন। জগৎশেঠ ঘসেটি বেগমের নিকট গিয়ে তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন।

ক্ষমতা আরোহণের পর সিরাজ অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও সামগ্রিক পরিস্থিতি আঁচ করে নিজের সুবিধা অনুযায়ী কিছু প্রশাসনিক ও সামরিক পরিবর্তন করেন। কিন্তু মহবত জং-এর ভগ্নিপতি ও সামরিক বাহিনীর প্রধান মীর মুহম্মদ জাফর আলী খান তা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এমনকি, তিনি নবাব সিরাজকে পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শনে বিরত থাকেন। (সালীম ২০০৮ : ১৮৬)। এ প্রসঙ্গে সিয়ার-ই-মুতাখখিরিনে লিখা হয়েছে যে: মীর জাফরের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি মরহুম মহবত জং এর অন্যান্য কর্মচারিদের সঙ্গে নিয়ে সিরাজের পতনের এবং নিজে মসনদ দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। (২য় খন্ড, ৬২১ পৃ:)। ইব্রাত-ই-আরবার-ই-বসর-এর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে যে, সিরাজের অধীনতা ছিন্ন করার জন্য দরবারের পুরাতন আমিরগণ ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।"

যদিও রিয়াজে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তথাপি সিয়ার এবং ইব্রাত এ উল্লেখিত হয়েছে যে, সিরাজ ক্ষমতা গ্রহণের পর সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিম্নোক্ত কার্যগুলোর দ্বারা রাজত্ব আরম্ভ করেছিলেন:

১. ঘসেটি বেগমকে দমন এবং সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ;

২. মীর জাফরের অবাধ্যতার কারণে বিশ্বস্ত মোহনলালকে প্রধান উজির পদে নিয়োগ;

৩. ষড়যন্ত্রকারী রাজবল্লভকে বন্দিকরণ;

৪. ইংরেজদের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের ঘাটি কলকাতা জয়; এবং

৫. পূর্ণিয়া জয়।

নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত কাজগুলো অন্যায় হয়নি, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে অবিবেচনাপ্রসূত হয়নি। কারণ, আলীবর্দীর দেওয়ান সাহামত জং-এর নিকট আমানত রাজকীয় সম্পদ ঘসেটি বেগম কর্তৃক দখল করার ও নিয়ে যাওয়ার কোনই অধিকার ছিল না। সিরাজ আইনসঙ্গতভাবে আলীবর্দীর উত্তরাধিকার হওয়ায় উক্ত সম্পদ পুনরাধিকার করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়ত: মীরজাফরকে কোণঠাসা করারও প্রয়োজন ছিল। কেননা, আলীবর্দীর জীবিকতকালেও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মীর জার অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকরূপে প্রমাণিত হয়েছিল। সুতরাং সিরাজের পক্ষে তাকে সন্দেহ করা ও তাকে সৈন্যবাহিনীর ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাখাও অযৌক্তিক হয়নি। তৃতীয়ত: রাজবল্লভকে প্রহরাধীন রাখা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল। কেননা, সাহামত জং এর (ঢাকার প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর) জাহাঙ্গীরনগরের (বা ঢাকার) এই ধূর্ত ডেপুটি দেওয়ান বা পেশকার যথাযথভাবে হিসাব নিকাশ পেশ করতে পারেনি এবং এই ব্যক্তি বিপুল

৭—

www.pathagar.com

পরিমাণ সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে। চতুর্থঃ বিশিষ্ট আমাত্য কৃষ্ণদাশ সমস্ত অর্থ ও সম্পদসহ কলকাতা পালিয়ে যায়। সুতরাং সরকারি অর্থ সম্পদ উদ্ধার ও বিদ্রোহী কৃষ্ণদাশ ও তার আশ্রয়দাতা ইংরেজদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে সিরাজকে কলকাতা আক্রমণ করতে হয়েছিল। পঞ্চমত:, পূর্ণিয়া বিজয়েরও বিশেষ রাজনৈকি প্রয়োজন ছিল। কারণ, মীর জাফরের প্ররোচনায় পূর্ণিয়া হতে শওকত জং বাংলার গদি দাবি করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মীর জাফর বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করে এবং এহেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাংলার নবাব হওয়ার আশা দিয়ে বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য শওকত জংকে পত্র পাঠায়। উক্ত পত্র পাওয়ার পর শওকত জং বিহারের পূর্ণিয়ায় যে ষড়যন্ত্র শুরু করে, তা নির্মূল করা সিরাজের জন্য অপরিহার্য ছিল। শওকত জং-এর সঙ্গে যুদ্ধের কারণ সিরাজ নন, সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লব সৃষ্টির ষড়যন্ত্রই এর অন্তর্নিহিত কারণ। ফলে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ব্যতিত সিরাজের সামনে অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না।

চার.

বিদ্রোহী শওকত জং এবং ষড়যন্ত্রের ইন্ধনদাতা ইংরেজদের পতন সাধন করে কলকাতা বিজয় শেষে সিরাজ যখন রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন, তখন চক্রান্তের নতুন ছকের খেলা শুরু হয়। পতিত ও পরাজিত শওকত জং-এর অস্তিত্বহীন অবস্থায় সিরাজ নিধনে ইংরেজদেরকে একমাত্র শক্তিধররূপে দৃশ্যপট পাওয়া যায়। জগৎশেঠ মীর জাফরকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ইংরেজদের সাহায্য ছাড়া সিরাজকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করা যাবে না। অতএব জগৎশেঠের দুতিয়ালীতে মীর জাফর ও ইংরেজদের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি পায় এবং ষড়যন্ত্রের গভীর জাল বিস্তৃতি লাভ করে।

উল্লেখ্য, সিরাজ কর্তৃক কলকাতা হতে ইংরেজগণ ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর অধিকাংশই নদীপথে পালিয়ে যায়। কলকাতার ইংরেজ কুঠির প্রধান ড্রেক অন্য কয়েকজন ইংরেজসহ দক্ষিণ দিকে মাদ্রাজে পলায়ন করে। তখন ক্লাইভ দক্ষিণ অঞ্চলের শাসক নাজিম সালামত জং-এর পক্ষে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে ফিরছিল। ড্রেক ও কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা অন্য ইংরেজগণ মাদ্রাজের কুঠির ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরামর্শপূর্বক সাব্যস্ত করে যে, ক্লাইভ বাংলা থেকে পলায়িত ইংরেজদের সঙ্গে কলকাতা যাবে। বাংলার আমিরদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সংবাদ পেয়ে ক্লাইভ নবাব সিরাজের কলকাতাস্থ গভর্নর মানিকচাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাকে পরাজিত ও পলায়নে বাধ্য করে কলকাতা পুনর্দখল করে। ইংরেজরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত স্বজাতির সৈন্যদের একত্রিত করে ব্যাপক শক্তি সঞ্চয় ও শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করে। বাংলার শাসকদের মধ্য থেকে উস্কানি এবং গোপনে সাহায্য পাওয়ার আশ্বাসে ইংরেজগণ নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে আরো যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এক্ষেত্রে জগৎশেঠের মাধ্যমে মীর জাফর ও ইংরেজের

www.pathagar.com

মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হওয়ায় ইংরেজরা বাংলার রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের সাহস, সুযোগ ও পথ পায়।

ইংরেজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নবাব সিরাজ সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। কলকাতা পতনের সংবাদ পেয়ে নবাব রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে সসৈন্যে কলকাতার উপকণ্ঠে কারহাটির বাগানে শিবির স্থাপন করেন। ইংরেজরা বিপুল বিক্রমে শক্তিশালী কামান, গোলা ইত্যাদির সাহায্যে নৈশ আক্রমণ করে। এক্ষণে নবাব প্রতিপক্ষ ইংরেজ পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি এবং নিজের বাহিনীর বিশৃঙ্খলা টের পান। নিজের অবস্থা সুসংহতকরণার্থে উদ্বিগ্ন নবাব আপাতত যুদ্ধ না করে রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। মুর্শিদাবাদে নবাব অদ্ভুত অবস্থা দেখতে পান- জগৎশেঠ ছিলেন অত্যন্ত তৎপর আর অন্যান্যরা নিরুদ্বিগ্ন যেন দেশে কোন বিদেশি আক্রমণই করেনি। রিয়াজে উল্লেখিত বিবরণে জানা যায় (সালীম ২০০৮:১৮৮-৮৯): সিরাজ কতিপয় আমির ও সেনাপতিকে অসন্তুষ্ট দেখেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন মীর মুহম্মদ জাফর খান বাহাদুর। তিনি পূর্বে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু নানা অযোগ্যতার জন্য তার পরিবর্তে খাজা হাদী আলী খানকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রধান সেনাপতি খাজা নিজেও বাড়িতে দুয়ার বন্ধ করে বসে ছিলেন। মীর জাফরের প্রাসাদের সামনে বড় বড় কামান সাজিয়ে সিরাজ তার অট্টালিকা ভূমিস্মাৎ করার উদ্যোগ নেন এবং তাকে নগর ত্যাগ করতে আদেশ দেন।

এই পর্যায়ে এসে নবাব সিরাজ কালবিলম্ব করেন এবং গুপ্ত শত্রুদের ফাঁদে ধরা দেন। দেশ যখন শত্রু পরিবেষ্টিত এবং শত্রু আক্রমণের মুখে তখন ভেতরে শত্রুদের দমনে সিরাজ কিছুটা ব্যতিব্যস্ত ও বিভ্রান্তও হন বটে। মীর জাফর মূল ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠের ইঙ্গিতে দৃশ্যত নবাবের কাছে নতি স্বীকার করেন এবং নানা রকমের কৈফিয়ত দিয়ে ক্ষমা চান ও নবাবের পক্ষে লড়াই করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সিরাজ সরলভাবে পুরো বিষয়টিকে দেখে আশ্বস্ত হন এবং মীর জাফরকে নিষ্কৃতি দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযাত্রী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

এই সুযোগে জগৎশেঠ পারস্পরিক প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা চূড়ান্তভাবে ষড়যন্ত্র নকশা অনুমোদন করিয়ে নেয় এবং আরো সেনাপতিদের দলভুক্ত কিংবা হীনবল করতে চেষ্টা চালায়। ইব্রাত-ই-আরবার-ই-বসর গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৬) উল্লেখিত হয়েছে যে, এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক জগৎশেঠ সেনাপতি মীর জাফর, দুলাব রাম (জানকী রামের পুত্র), ঘসেটি বেগম (আলীবর্দীর জামাতা নওয়াজেশ মুহম্মদ খানের বিধবা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ করে। চক্রান্ত সফল করতে ঘসেটি বেগমকে এতোটাই প্রলুব্ধ করে যে, জগৎশেঠের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেগম তার লুক্কায়িত ও তছরূপকৃত সরকারি অর্থ দিয়ে মীর জাফরকে অকাতরে সাহায্য করে। এবং জগৎশেঠ অতি দ্রুততার সঙ্গে ইংরেজ ও মীর জাফরের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে দেয়। ফলে মীর জাফর তার অন্যতম বিশ্বস্ত আমির

www.pathagar.com

বেগকে পত্র দিয়ে কলকাতায় পাঠায় এবং ইংরেজদের সাহায্য চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবাব সিরাজ কলকাতা দখলের পর এই আমির বেগ কয়েকজন ইংরেজ মহিলাকে ড্রেকের জাহাজে তুলে দেয়। সেইজন্য আমির বেগ ইংরেজদের আস্থাভাজন ছিল। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে আমির বেগ মীর জাফরের পক্ষে ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং সিরাজের বিরুদ্ধে কতিপয় কাল্পনিক অভিযোগের বর্ণনা দিয়ে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারি স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি/দরখাস্ত/পত্র মীর জাফরের পক্ষে ক্লাইভের কাছে হস্তান্তর করে- যাতে সিরাজের কবল থেকে তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। জগৎশেঠ তার কলকাতাস্থ প্রতিনিধি উমিচাঁদ এবং দুলাব রামও তার প্রতিনিধিকে উক্ত ষড়যন্ত্র সফল করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের প্ররোচিত করতে নির্দেশ দেয়। মীর জাফর ক্লাইভকে লিখে যে, ক্লাইভ কেবল ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হলেই মীর জাফর ও তার সহযোগীরা সর্বাত্মক সাহায্য করবে এবং এজন্য ক্লাইভকে তিন কোটি টাকা উপহার দেওয়া হবে। ক্লাইভ সমগ্র পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে দেখতে পেয়ে নিঃসঙ্গ ও একাকী নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পলাশীর প্রান্তরে উপস্থিত হয়। (মুতাখখিরিন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৩৭)। এই ষড়যন্ত্রের নানা দিক সম্পর্কে তারিখ-ই- মনসুরীতেও বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ব্লকম্যান তারিখ-ই-মনসুরী থেকে কয়েকটি মন্তব্য Journal of the Asiatic Society তে (part 1, No. 11, 1867) প্রকাশ করে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চন্দননগরের ফরাসি গভর্নর এম. রেনল্টের প্রতি বিরাগভাজন টেরানিউ নামক জনৈক ফরাসি কর্মচারি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তার সাহায্যে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর ক্লাইভ ও ওয়াটসনের হস্তগত হয়। চন্দননগরের পতনের পর মঁসিয়ে ল' নামক জনৈক ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষ নবাব সিরাজের দরবারে আসে এবং তেলিঙ্গা নামক একটি সৈন্যদল সজ্জিত করে। ইংরজগণ ষড়যন্ত্র কারীদের ইঙ্গিতে নবাবের উপর চাপ প্রয়োগ করে যে, ইংরেজদের শত্রুকে দরবারে রাখা যাবে না। কিছু পত্র আদান প্রদান করার পর সিরাজ তার দরবারে ঘাপটি মারা ইংরেজ বন্ধুদের পুনঃ পুনঃ চাপে এবং ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে মঁসিয়ে ল'কে রাজধানী থেকে বিদায় দেন। এই সময় ক্লাইভ নবাবের অনুমতি না নিয়েই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম ও একটি টাকশাল তৈরি করে। ইত্যবসরে সিরাজ কর্তৃক দক্ষিণাঞ্চলের ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষ এম. বসির নিকট লিখিত কয়েকটি পত্র দরবারের গুপ্ত মিত্রদের তথ্যের ভিত্তিতে ইংরেজরা হস্তগত করতে সক্ষম হয় এবং ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে নবাব শক্তি সঞ্চয় করছে মর্মে ধারণা লাভ করে। ইংরেজরা এ কারণে নবাবকে যুদ্ধের মাধ্যমে দমন করার কথাও জানাতে থাকে। সামগ্রিকভাবে ইংরেজ ও নবাবের মধ্যে একটি বৈরি ও যুদ্ধংদেহী পরিবেশ সৃষ্টিতে ষড়যন্ত্রকারীরা যে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছিল, তা ক্রমেই সফল হতে থাকে। দুঃখজনক সত্য এটাই যে, চারপাশ থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা যে নবাবকে কোণঠাসা করছে তা জগৎশেঠ, মীর জাফরের তীব্র

www.pathagar.com

তোষামোদ ও সাজানো আচরণের জন্য নবাব স্পষ্টত বুঝতে পারছিলেন না এবং বণিক ইংরেজরাও যে কোন্ শক্তির বলে এতোটুকু মাথাচাড়া দিচ্ছে, সেটা সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। উপরন্তু বিদেশী ইংরেজদের কৌশলী সরল ব্যবহার এবং ধীর অথচ নিশ্চিত শক্তি সঞ্চয়পূর্বক অগ্রসর হওয়ার ঘটনা বিশ্লেষণের বদলে ষড়যন্ত্রকারীদের উস্কানিতে নবাব উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং তাঁর ক্রোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে নবাব রাজধানী মুর্শিদাবাদে ইংরেজ রেসিডেন্টকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং ক্লাইভের পাঠানো একটি চিঠি ছিঁড়ে ফেলেন। এ পর্যায়ে নবাবের দরবারে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নবাব যে একটি পুতুলের মতো দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের খপ্পড়ে পড়ে গেছেন, তখন পর্যন্ত সেটা বুঝতে তো পারেনইনি বরং ষড়যন্ত্রকারীদের দিকেই ভরসার জন্য তাকিয়ে ছিলেন। ফলে নবাব সভাসদদের ভয়ে ও সামরিক বাহিনীকে হাতে রাখার স্বার্থে ইংরেজ রেসিডেন্টকে খেলাত দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং ক্লাইভের নিকট কৈফিয়ত দিয়ে পত্র পাঠান। কিন্তু সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ক্লাইভ এবং জগৎশেঠ-মীর জাফর যে চক্র গড়ে তোলে, নবাবের কৈফিয়তমূলক পত্র সেই চক্র ভাঙতে পারেনি। বরং নবাবকে প্রহসন ও তোশামুদির মধ্যে রেখে গোপনে বিস্তৃত ষড়যন্ত্রের গভীরতা অনুভব করতে পর্যন্ত নবাব ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেও কোন কোন ইতিহাসকার মনে করেছেন। তারিখ-ই-মনসুরী অনুযায়ী, নবাবের চারপাশে অবস্থান করেই জগৎশেঠ, ওয়াটস, মীরজাফর, উমিচাঁদ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে সেটা বাস্তবায়ন করে। সিয়ার উল মুতাখখিরিনের মতে, (ষড়যন্ত্রকারীরা) চোখের সামনেই সকল কাজ করেছে। কলকাতায় এদের প্রত্যেকেরই এজেন্ট বা প্রতিনিধি ছিল। ক্লাইভ এ সকল এজেন্টের মাধ্যমে দরবারের সকল তথ্য অবগত হত এবং রেসিডেন্ট ওয়াটসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিত। মূলত একটি সাজানো নাটকের অংশ হিসাবে পুরো ঘটনা-প্রবাহ সিরাজের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং নবাব সেটা টেরও পাননি।

পাঁচ.

আমির বেগ কর্তৃক মীর জাফরের পত্র, জগৎশেঠ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের এজেন্টদের প্ররোচনা এবং অর্থ ও ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি ক্লাইভকে মুর্শিদাবাদের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ক্লাইভের পক্ষে অনুধাবন করতে অসুবিধা হয়নি যে, তার সামনে বিরাট সুযোগ অপেক্ষমান এবং সুযোগটি হাসিল করার উপযুক্ত ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়ে আছে। অতএব, পুরো পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে দেখতে পেয়ে ক্লাইভ কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে পলাশীর প্রান্তরে এসে উপস্থিত হয়। রিয়াজের বিবরণ অনুযায়ী (২০০৮:১৮৯): কর্মের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অর্থাৎ যখন কাজ করা উচিত ছিল তখন না করে সিরাজ ইংরেজ বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অগ্রসর হন। তিনি মীর জাফরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তোষামোদ করতে থাকেন। মীর জাফর কপট আনুগত্য প্রদর্শন করে। সিরাজ যখন চুনাখালি

www.pathagar.com

থেকে অগ্রসর হন তখন মীর জাফরও অগ্রসর হয়ে সিরাজের সৈন্যবাহিনী থেকে অর্ধ ফারসাখ দূরে শিবির স্থাপন করে। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর মদন এই সময় নবাব সিরাজকে বলেন যে, ইংরেজরা মীর মুহাম্মদ জাফরের প্ররোচনায় আসছে; সুতরাং মীর মুহাম্মদ জাফরকে প্রথমে শেষ করা উচিত এবং তাকে হত্যা করার সংবাদ পেলে ইংরেজরা আর অগ্রসর হতে সাহস করবে না। এই পরামর্শ সিরাজ গ্রহণ করেননি, তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজ বিতাড়ণে আগ্রহী ছিলেন। এহেন পরামর্শ গ্রহণ না করায় রিয়াজের লেখক কাব্যচ্ছলে লিখেন: সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শের প্রতি/এই তরল-হৃদয় ব্যক্তি (সিরাজ) বধির হয়ে রইল।

চুনাখালী থেকে সিরাজ দাউদপুর পৌঁছে সংবাদ পান যে, ইংরেজরা কাটোয়া পুড়িয়ে দিয়েছে। রিয়াজের ভাষ্যমতে: সেইসময় মোহনলাল তিরস্কার করে সিরাজকে বলেন, আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন; আমার সন্তানদের পিতৃমাতৃহীন করলেন। মোটের ওপর পরদিন সকালে মুতাবিক ৫ শাওয়াল দিল্লিতে বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে একদিকে ইংরেজ সৈন্যরা পলাশী থেকে এবং অন্যদিকে সিরাজের বাহিনী দাউদপুর থেকে কামানের গোলাবর্ষণ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করে। মীর জাফর তার বাহিনীসহ বামদিকে দূরে দাঁড়িয়েছিল। সিরাজ তাকে নিকটে আসবার জন্য তলব করা সত্ত্বেও মীর জাফর নিজ স্থান ত্যাগ করেনি। ঘোরতর যুদ্ধের সময় যখন রক্তারক্তি চলছে এবং নবাব বাহিনীর বিজয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে, সেই সময় অকস্মাৎ একটি কামানের গোলার আঘাতে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর মদনের পতন হয়। এই দৃশ্য দেখে সিরাজের সৈন্যদের মনোভাব পরিবর্তিত হয় ও গোলন্দাজরা মীর মদনের লাশ নিয়ে শিবিরে চলে যায়। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। শিবিরের লোকেরা পলায়ন আরম্ভ করে। নবাব তখনো যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সূর্যাস্তের দু'ঘন্টা পূর্বে সিরাজের সৈন্যরাও পলায়ন করে। কোন গত্যন্তর না দেখে নবাবও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে নিজের প্রতিষ্ঠিত মনসুরগঞ্জে পৌঁছে কোষাগারের দ্বার খুলে সমস্ত অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। কিন্তু অত্যধিক উদ্বেগে সেখানে না থাকতে পেরে সন্ধ্যার পর সিরাজ তার বেগম, সন্তান এবং মালমাত্তা, মূল্যবান মণিমুক্তা ও প্রচুর মুদ্রাসহ এক নৌকায় উঠে পূর্ণিয়া ও আজিমাবাদের দিকে রওয়ানা হন। সিরাজের পরাজয়ের পর মীর জাফর নবাব-শিবিরে প্রবেশ করেন এবং রাত্রিতে ইংরেজ প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং পরদিন সকালে সিরাজের পশ্চাদ্ধাবন করে মুর্শিদাবাদ পৌঁছেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূল দেখে মীর জাফর দুর্গে প্রবেশ করে বাংলার মসনদে আরোহণের বিজয়বাদ্য বাজাবার আদেশ দেন। নগরে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘোষণা করে তিনি সুবাদারির পতাকা উত্তোলন করেন। তদীয় জামাতা মীর কাশেমকে একদল সৈন্যসহ সিরাজকে বন্দি করার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সিরাজ নৌকাযোগে রাত্রিকালে দ্রুত মালদহ অতিক্রম করে বাবিয়াল পৌঁছেন। এখানে এসে তিনি জানতে পারেন যে, নাজিমপুরের মুখে নদীতে নৌকা চলাচল করতে পারে না। তখন তিনি বাধ্য হয়ে নৌকা থেকে নেমে

www.pathagar.com

সেখানকার অধিবাসী দানশাহ পীরজাদার বাড়ি যান। দানশাহ ইতিপূর্বে সিরাজের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। সিরাজকে নিজের আয়ত্তে পেয়ে সুযোগ বুঝে দানশাহ তাকে প্রতিশ্রুতি এবং সান্ত্বনা দেন এবং বাহ্যত খাদ্য প্রস্তুতের আয়োজন করেন। এদিকে দানশাহ মীর জাফরের ভ্রাতা আকবরনগরের (রাজমহল) ফৌজদার মীর দাউদ আলী খানকে সিরাজ সংক্রান্ত সংবাদ পাঠান। দাউদ আলী খানের গোয়েন্দারা সিরাজের সন্ধান করছিল এবং চরম বিজয় মনে করে দ্রুত পৌঁছে সিরাজকে বন্দি করে দানশাহ (সিয়ারে দানাশাহ নামে বর্ণিত)-এর বাড়ি থেকে আকবরনগরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে মীর কাশিম তাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান। মীর জাফর তাকে কারারুদ্ধ করে। পরদিন ইংরেজদের পরামর্শে এবং জগৎশেঠের জেদাজেদিতে তাকে হত্যা করা হয় এবং লাশ হাতির পিঠের হাওদায় করে নগর পরিক্রম করানো হয়। (রিয়াজ ২০০৮ : ১৯০) পরে নবাব মহবত জং-এর সমাধি সৌধ খোশবাগে সিরাজের লাশ দাফন করা হয়। কিছুদিন পরে সিরাজের ছোটভাই মীর্জা মেহদি আলী খানকেও অত্যাচার করে হত্যা করা হয় এবং সিরাজের কবরের পাশে তার লাশ দাফন করা হয়। নবাব সিরাজের নিজামত ছিল মাত্র এক বছর চার মাস।

ছয়.

তৎকালীন ইতিহাসের নানা সূত্রমতে, ১৭৫৭ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে ক্লাইভ কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে ১৭ তারিখে পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত কাটোয়া শহরে পৌঁছেন ও সেখানকার দুর্গ অধিকার করেন। ২১ জুন অপরাহ্ন ৪ টার সময় ক্লাইভ কাটোয়া থেকে রওয়ানা হয়ে হুগলি নদী পার হন এবং ২৩ জুন সকালে পলাশীর প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। নগরের সৈন্যবাহিনীকে তখন দেখা যাচ্ছিল। কামানের গোলা থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরেজগণ নবাব শিবির আক্রমণ করে কিন্তু আমির মীর মদন (থনটন তাকে মুদুম খান বলে অভিহিত করেছেন) বীর বিক্রমে বাধা দেন। বেলা প্রায় ১২টার সময় মীর মদনকে কামানের গোলায় আহত অবস্থায় নবাবের শিবিরে আনার কিছুক্ষণ পর তাঁর মৃত্যু হয়। মোহনলাল সে সময় মীর মদনের স্থান গ্রহণ করে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ষড়যন্ত্রের আশংকায় নবাব এ সময় মীর জাফরকে শিবিরে ডেকে পাঠান। মীর জাফর যুদ্ধে কোনই অংশগ্রহণ করেনি। নবাবের ঐকান্তিক অনুরোধে অবশেষে নবাব কর্তৃক মোহনলালকে অবিলম্বে যুদ্ধ থেকে বিরত করার শর্তে মীর জাফর পরদিন সকালে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সিরাজ সম্মত হন। মোহনলাল শিবিরে ফিরে আসেন। সেনাপতি মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা নিরাশ হয়ে পলায়ন করতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্বেই নবাবের সৈন্যরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই প্রকার যুদ্ধে ইসলাম ভারত হারিয়েছিল। ব্লকম্যানের তারিখ-ই-মনসুরীতে উপরিউক্ত মন্তব্য রয়েছে।

সিয়ার-উল-মুতাখখিরিনে (২য় খন্ড, ৬৩৮ পৃ.) বলা হয়েছে, ইংরেজরা মীর জাফর-জগৎশেঠের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু যুদ্ধ সমাসন্ন, তাই ক্লাইভের

www.pathagar.com

গতিবিধি লক্ষ্য করে নবাব অসন্তুষ্ট সেনাপতিদের সঙ্গে বিরোধ দূর করার চেষ্টা করেন। এরা বাহ্যত আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নবাবের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। প্রতিরোধ-প্রাকার ও ঘাঁটি তৈরি তত্ত্বাবধানের জন্য সিরাজ আগেই বিশ্বাসঘাতক দুলাব রামকে (রায়দূর্লভ) প্রেরণ করেন এবং স্বল্পকাল পরে সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় মীর মদন ও মোহনলাল এবং বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরকে নিয়ে নবাব নিজে পলাশী যান। ক্লাইভও আন্দাজ দু'হাজার সৈন্যসহ পলাশী ছিল। ক্লাইভ কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে যুদ্ধ আরম্ভ করে। মীর জাফর দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অপরাহ্ন প্রায় তিনটা পর্যন্ত মীর মদন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। মোহনলালও ক্লাইভের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এদের বীরত্ব ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করে ক্লাইভ নিরাশ হয়ে উমিচাঁদকে ভর্ৎসনা করে। কারণ এরা ক্লাইভকে বলেছিল, সকলেই নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং কেউই তার পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় কামানের গোলার আঘাতে মীর মদন আহত হন এবং তাকে নবাবের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মীর মদনের মৃত্যু হয়। এই সময় সিরাজ উৎকণ্ঠিত হয়ে মীর জাফরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে যুদ্ধ করার জন্য মিনতি করেন। এমনকি, মীর জাফরের সামনে পাগড়ি রেখে নবাব সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই করুণ আবেদনেও মীর জাফরের মন বিগলিত হয়নি। বরং মীর জাফর বন্ধুত্বের মুখোশে তার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ মতলব ঢেকে রেখে এই মিথ্যা উত্তর দেয় যে, আজ দিন অবসানপ্রায়। আর যুদ্ধের সময় নাই। আজ যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিন। আগামীকাল আমি সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করব। সিরাজ মীর জাফরের ফাঁদে পা দিয়ে যুদ্ধরত মোহনলালকে ফিরে আসতে সংবাদ দেন। মীর মদনের মৃত্যুর পর মোহনলাল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মোহনলাল বলে পাঠান যে, তিনি এখন ঘোরতর যুদ্ধে ব্যস্ত, এতেই ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সুতরাং এখন তার ফিরবার সময় নেই। সিরাজ আবার মীর জাফরের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মীর জাফর ধূর্তের মতো পূর্বের পরামর্শ পুনরুক্তি করে। তখন মোহনলালকে ফিরে আসার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। মোহনলালের প্রত্যাবর্তনে সিরাজের সৈন্যবাহিনীর ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সৈন্যরা চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সিরাজ তখন দ্রুত মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন এবং কিছুক্ষণ মনসুরাবাদে অবস্থানের পর নিজেকে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক সভাসদগণ দ্বারা পরিবৃত্ত দেখে বেগম পরিবার ও সভাসদসহ ভগবানগোলা যাত্রা করেন। সেখান থেকে নৌকাযোগে আজিমাবাদ রওয়ানা হন এবং ফরাসি সেনাপতি মঁসিয়ে ল'কে তার সঙ্গে যোগদানের জন্য এক পত্র প্রেরণ করেন। ল' পৌঁছবার পূর্বেই তিনি পাটনা অভিমুখে রওয়ানা হন। বেগম ও পরিবারবর্গ কয়েকদিন যাবত অনাহারে থাকায় তিনি রাজমহলে নেমে দানশাহ নামক এক ফকিরের বাড়ি যান। ফকির বাহ্যত খিচুড়ি তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পূর্বের অসদ্ব্যবহারের জন্য নবাবের প্রতি তার ক্রোধ ছিল। ফকির সিরাজের উপস্থিতির সংবাদ

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ রাজমহলে মীর জাফরের ভ্রাতা মীর দাউদের নিকট পাঠান। মীর জাফরের জামাতা মীর কালিম এসে সিরাজকে বন্দি করে রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে যায়, সেখানে মীর জাফর ও তার পুত্র মীরন সিরাজকে হত্যা করে। সিরাজের মৃতদেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে শহরে প্রদর্শন করা হয়।

সাত.

কোনরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে না গিয়ে তৎকালীন ইতিহাসকার সালীম প্রণীত রিয়াজের একটি ভাষ্য দিয়ে উপসংহার টানা যেতে পারে। যাতে ১৭৫৭ সালের পুরো বিষয়টিই কিরূপ হিংসাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ণ ছিল তা আঁচ করা যাবে।

বাংলার ইতিহাসের এই বিপ্লবের ফলে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনের স্থানে ইরেজরা এদেশের সর্বময় কর্তা হয়েছিল। এই পরিণতিকে জনসাধারণের কল্যাণার্থে বিধাতার কল্যাণময় দানরূপে গণ্য করা যেতে পারে। তৎকালে বাংলার জনসাধারণ নৈতিক অধঃপতের চরম সীমায় পৌঁছে ছিল। কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষ সর্বত্র প্রবেশ করেছিল। মিথ্যাচার ও অর্থগৃধ্রুতা তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বাসা বেঁধেছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অর্থলোভের মোহে তারা তাদের রাজার যৌবনসুলভ ত্রুটি ও পারিবারিক ঈর্ষার সুযোগ নিয়েছিল। তারা সর্বপ্রকার কৃতজ্ঞতার ও সম্মানের মনোভাব ত্যাগ করে। এই কারণে তাদের নৈতিক অধঃপতন রোধের জন্য মুসা পয়গম্বরের মতো একজন রক্ষাকর্তার প্রয়োজন হয়েছিল। দেশের পাপ দূর করে জনসাধারণকে উদ্ধার ও সংস্কারের জন্য বিধাতা তাই সাগর পার থেকে ইংরেজদের মাধ্যমে উদ্ধার কর্তা প্রেরণ করেছিলেন। (সালীম ২০৮ : ৩৭৬)

দেশের সংস্কৃতি, ঐক্য, নেতৃত্ব ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের সুস্পষ্ট দিকগুলোতে চিহ্নিত না করে তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ পরবর্তী শাসক ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় অদৃষ্টের উপর সকল দোষ চাপিয়ে যে ভুল করেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কি করছি সেটা আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে ১৭৫৭ সালের পলাশীতে স্বাধীনতার অবসান এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনা পরম্পরা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিদেশি ষড়যন্ত্র ও অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত থেকে রক্ষা করারও।

এই বাস্তবতার সূত্র ধরে প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলছেন (আহমদ ২০০৯: ৩২):
আমি ১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয়কে স্মরণ করি আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মনে রেখে, কিভাবে একটি স্বাধীন জনপদ তার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করতে পারে তা ফিরে দেখার জন্য। এর প্রয়োজন অনুভব করি এই জন্যে যে, আঠারো শতকের প্রথম দিক থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা যেমন ছিল আজকের বাংলাদেশের অবস্থা প্রকৃতিগত দিক থেকে তার প্রায় কাছাকাছি।

www.pathagar.com

খুবই সঙ্গত কারণে একইভাবে অনেকেই আশংকা প্রকাশ করে থাকেন, আজকের বাংলাদেশের অবস্থা ১৭৫৭-এর বাংলা থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। শীর্ষ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের অপরিণামদর্শী নীতির দিকে তাকিয়ে, অদক্ষ এবং দলীয় আনুগত্যের প্রকরণে বিভক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে, দেশের অর্থনীতিকে ক্রমবর্ধমান হারে বিদেশ নির্ভর করার ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নকারীদের আগ্রহকে স্মরণে রেখে, দেশের অসংখ্য বিদেশ-নির্ভর এনজিওদের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমকে মনে করে এবং অপরিণত নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে যেভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে, তা পর্যালোচনা করলে তাদের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক তা বলা যাবে না। অনেকে বলেন, যে বটবৃক্ষটি পলাশীর ষড়যন্ত্রের সাক্ষীরূপে এখনও টিকে রয়েছে, আড়ইশো বছরেরও বেশি সময় পরেও কোন পরিব্রাজকের চোখে পড়বে সেই বটবৃক্ষে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক শকুন। তখনো তারা ছিল। এখনো রয়েছে। কোনটির রং সাদা, কোনটির ধুসর বা বাদামী। সিরাজদ্দৌলার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মীর জাফর- জগৎশেঠের রয়েছে অসংখ্য উত্তরপুরুষ। শকুনের মতো এদেরও বংশবিস্তার ঘটেছে। তাই আশঙ্কা। ■

সহায়ক-গ্রন্থ

শিকদার আবদুল হাই, ভ্রমণ সমগ্র (পলাশী ভ্রমণ পর্ব), ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৬

গোলাম হুসেন সালীম, বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতিন), ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৫

গোলাম হোসাইন, সিয়ারউল মুতাফাখিরিন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

এমাউদ্দীন আহমদ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা, গতিধারা প্রকাশনী, ২০০৯

মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার, সিরাজউদ্দৌলা, কলিকাতা, ১৮৯৮

ইব্রাত-ই-আরবার-ই-বসর

গোলাম হুসেন সালীম, বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতিন, নতুন সংস্করণ), ঢাকা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮

উইকিপিডিয়া

Blockman, Geography and history of Bengal, Calcatha

Journal of the Asiatic Society, Part-1. No. 11, 1867

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ- কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২৪শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যবস্থাপনা

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

শুরুর কথা [Foreword]

জীবন-মৃত্যু, মানুষের জীবনে এক সর্বজনীন অনিবার্য সত্য। আর ব্যবস্থাপনা, মানব জীবনে এক অনিবার্য প্রয়োজন। অব্যবস্থাপনা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তা হচ্ছে "দুর্বল ব্যবস্থাপনা বা খারাপ ব্যবস্থাপনা।" মানব জীবনে ব্যবস্থাপনা-শূন্য কোন কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব নেই। একান্ত ব্যক্তিগত জীবন হতে শুরু করে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক, শিক্ষা জীবন তথা সামরিক-বেসামরিক জীবনের সকল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনার এই অপরিহার্যতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য, সব দেশের জন্য, সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আজ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষ বসবাস করছে। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষের এই কর্মতৎপরতাকে ব্যবস্থাপনার ভাষায় Diversified Workforce হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। Diversified Workforce এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতার পাশাপাশি যোগাযোগের সহজতার কারণে বিশ্বকে এখন Global Village হিসেবেই মানুষ বিবেচনা করে। Global Village-এর সুবাদে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষের পক্ষে যে কোন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

www.pathagar.com

কুরআন কোনো ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বই-পুস্তক নয় কিংবা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ব্যবস্থাপনার ভাষায় কথিত কোনো ব্যবস্থাপনা Expert নন। এমনি এক অবস্থায় Diversified Workforce এবং Global Village বিবেচনায় "ইসলামী ব্যবস্থাপনা" কতটুকু যৌক্তিক? কতটুকু সফল? কতটা বাস্তব? প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণা এবং কার্যাবলীর চলমান বাস্তবতায় "ইসলামী ব্যবস্থাপনা"-র আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি-না? Global Village-এর যুগে "ইসলামী ব্যবস্থাপনা"-র ধারণা আদৌ কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে কি? বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা ধারণা ও নীতির অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে "ইসলামী ব্যবস্থাপনা"–ধারণা এমন অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম ও বিকাশ এবং ইসলামী ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম ও বিকাশের মধ্যে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভংগিগত একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক এই দুই জীবনকে অবিভাজ্য মনে করে। প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণা বা Concept মানুষকে উৎপাদনের একটি উপকরণ মাত্র মনে করে, যার সাথে শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের সংশ্লেষ রয়েছে। স্পষ্টতঃই প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণায় মানুষকে শুধুমাত্র আর্থিক উপযোগ সৃষ্টির সক্ষমতার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ফলে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী ব্যবস্থাপনার মাঝে ধারণাগত মৌলিক পার্থক্য, কার্যতঃ প্রায়োগিক পার্থক্য সূচিত করে।

অবিভাজ্য ধারণার প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যবস্থাপনা ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নিরপেক্ষ একটি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ধারণার প্রতিফলন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা এর সামগ্রিকতার এক একটি অংগ। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা একটি সামগ্রিক আলোচনার দাবী রাখে। আলোচনার দাবী পূরণে মৌলিক ব্যবস্থাপনার [Fundamental Management] সাথে ইসলামী ব্যবস্থাপনার স্বরূপ তুলে ধরার পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি মানবীয় মৌলিক দিকে ইসলামী ব্যবস্থাপনার কিছু দিক-নির্দেশনা বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ইসলামী ব্যবস্থাপনা কি? [What is meant by Islamic Management?]

ইসলামী ব্যবস্থাপনা আলোচনা করার পূর্বে ব্যবস্থাপনা বলতে প্রচলিত ধারণাগুলো কি তা আলোচনা করা যাক। ইংরেজী Management শব্দটির সমার্থক গণ্য করা হয় "to handle" অর্থাৎ চালনা করা বা পরিচালনা করা। তাই ব্যবস্থাপনা বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এতে নিয়োজিত ৬টি গুরুত্বপূর্ণ উপায়-উপকরণকে [Men, Machine, Materials, Money, Market and Method] সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোকে বুঝায়।

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা মূলতঃ নেতৃত্বদানের কৌশল। লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বর্ণিত ৬টি গুরুত্বপূর্ণ উপায় উপকরণকে সংগঠিত করণ, মোটিভেশন বা প্রবৃত্তকরণ, সমন্বয়করণ, নির্দেশনা প্রদান এবং সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনই ব্যবস্থাপনার মৌলিক কর্মকাণ্ড। ব্যবস্থাপনা মাত্রই এসব কাজ সম্পাদন করা বুঝায়।

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপরোক্ত উপকরণাদির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষই বাকী উপকরণগুলোর ব্যবহারকারী। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা বলতে মানুষকে পরিচালনা করাও বুঝায়। Management শব্দটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে- অর্থাৎ Manage + Man + Tactfully = Management এভাবেও কেউ কেউ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন। রু ও বায়ার্স-এর মতে 'অন্যদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়াই ব্যবস্থাপনা (Management is getting things done by others)[১]

ব্যবস্থাপনা বিশারদ 'কুনজ' ও 'ডনেল' এর ভাষায় ব্যবস্থাপনা হচ্ছে, পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ, নির্দেশনাদান, প্রবৃত্তকরণ বা মোটিভেটিং, সমন্বয়করণ ও নিয়ন্ত্রণ কাজের একটি সমন্বিত সামাজিক প্রক্রিয়া। যা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ, যন্ত্রপাতি, মালামাল, অর্থ, বাজার ও পদ্ধতিকে দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির কর্মপ্রচেষ্টায় প্রয়োগ করা হয়। [Management is a distinct social process consisting of planning, organizing, directing, motivating, coordinating and controlling, applied to the efforts of employees to utilize efficiently man, materials, machine, methods, money and market with a view to achieving predetermined objectives.][২]

L.A. Allen এর ভাষায়, "Management is what a manager does.[৩] ব্যবস্থাপক যা করেন তাই ব্যবস্থাপনা।

জর্জ আর টেরী ও ফ্রাংকলিন এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের নিমিত্তে পরিকল্পনা, সংগঠন, উদ্বুদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাদি সম্পাদন করে। [Management is a distinct process consisting of activities of

---

১. Leslie Rue and LIoyd L. Byars, Management : Theory and application, Richard D. Irwin, Homewood-1983, P-8.
২. Weihrich, H. & Koontz, H. (1994), Management – A global perspective, Singapure : McGraw Hill. P-4.
৩. Louis A. Allen – Management and Organization, McGraw-Hill, Tokyo, 1958, P-4

www.pathagar.com

planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives with the use of human being and other resources.][৪]

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যবস্থাপনার ধারণা তুলে ধরা হল

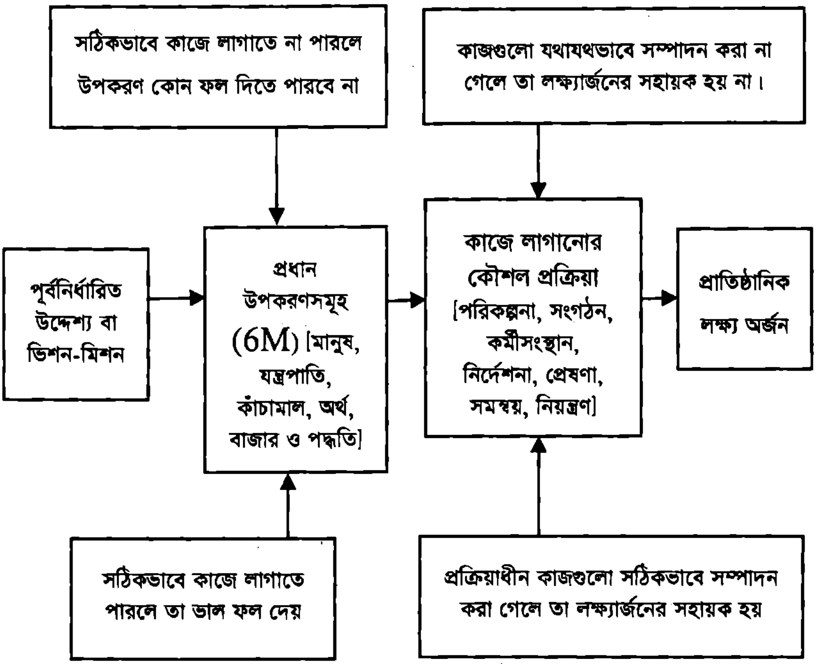

ছক চিত্র ঃ ব্যবস্থাপনা ধারণা মডেল[৫]

এ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা বিশারদদের যতগুলো সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো এবং ব্যবস্থাপনা মডেল চিত্রেও যা ফুটিয়ে তোলা হল, তাতে স্পষ্ট হয় ঃ

১. পুরো ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি একজন ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভরশীল।
২. 6M-কে handle করার বা ব্যবহার করার নিরঙ্কুশ এখতিয়ার দেয়া হয়েছে ব্যবস্থাপককে। এতে কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।
৩. ব্যবসায় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনই মুখ্যতঃ ব্যবস্থাপনার মূল

---

৪. George R. Terry & Stephen G. Franklin – Principles of Management, 8th Ed. 1994. P-4
৫. Mohammad Khalequzzaman, Management, p-2&3

www.pathagar.com

প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এখানে পারলৌকিক জীবনের কোন ভূমিকা বিবেচনা করা হয়নি। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণা পারলৌকিক জীবন বর্জিত ধারণা হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪. যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদ বা স্কলারই প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণার পুরোহিত বা দিক নির্দেশক। এখানে কোন মৌলিক অনুসরণীয় আদর্শ নেই।

৫. Ends Justifies the means এটাই প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণার মূল কথা। এমনকি প্রতারণা, জালিয়াতি ইত্যাদি লক্ষ্যার্জনে সহায়ক হলে তা বরণীয় বিবেচিত হয়। যে কোন রক্ষণশীল মনোভাব লক্ষ্যার্জনের বাধা বিবেচিত হলে বরং তা বর্জনীয় গণ্য হয় অথবা আপোষ করা হয়।

৬. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মচারীদেরকে উৎপাদনের একটি উপকরণ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। মানুষের divine dignity বা আশরাফুল মাখলুকাত ধারণা এখানে পরিত্যাজ্য বিবেচিত।

৭. ন্যায়বিচার ব্যবস্থাপকের ইচ্ছাধীন।

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সীমা ব্যবস্থাপক পর্যন্ত বিস্তৃত। আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার কোন ধারণা এতে নেই।

৯. প্রেষণার জন্য নৈতিকতা কোন বাধা নয়। শারিরীক-আর্থিক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

১০. প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং একচেটিয়া বাজার ধারণার পৃষ্ঠপোষক।

১১. প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণায় জীবনের অবিভাজ্যতার স্পর্শ নেই। জীবন অবিভাজ্য। আর ঐসব দিক অবিভাজ্য জীবনের এক একটি অংশ এভাবে জীবনকে বিবেচনা করা হয় না। জীবনের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত প্রত্যেকটি দিককে বিচ্ছিন্নভাবে পরিমাপ করা হয়। ফলে জীবন হয়ে পড়ে সমন্বয়হীন। একদেশদর্শী।

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণার এসব বিষয়কে মূল্যায়ন করেই ইসলামী ব্যবস্থাপনাকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো। ইসলাম জীবনকে অবিভাজ্য মনে করে। জীবনের সবকটি দিক তাওহীদের সুতোয় গাঁথা। একজন অনুসরণীয় পথপ্রদর্শক জীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের দিশারী। যিনি ইহলৌকিক জীবনের সর্বোচ্চ কল্যাণ এবং পারলৌকিক জীবনের সফলতা একসাথে কিভাবে পাওয়া যায় তা একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের মত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ইসলামে, ব্যবস্থাপকের নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে চূড়ান্তভাবে আল্লাহর কাছেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হয়। ইসলাম কর্মচারীদের আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে শারীয়াত নির্ধারিত নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করেছে। মানবজীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে আল্লাহর হক বা হককুল্লাহ এরং বান্দার হক বা হক্কুল ইবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে

www.pathagar.com

ইসলাম একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থার ধারণার বিপরীতে অবাধ বাজার নিশ্চিত করেছে। একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থায় বান্দার হক ভয়ানকভাবে উপেক্ষিত হয় এবং মানুষকে চরম স্বেচ্ছাচারী ও নৈতিকতা বিবর্জিত সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। সার্বিক প্রেক্ষিতে, ইসলামী ব্যবস্থাপনা বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশিত মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সততা ও দক্ষতার সাথে শারীয়াতসম্মতভাবে পূর্ব নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনে পরিচালিত কর্মকান্ড [পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি]-কে বুঝায়।

ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin & Evolution of Management)

ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি, মানবজাতির সূচনাকাল থেকেই বলা যায়। আর মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হয়েছে, পেশা অবলম্বন করেছে, কাজ সম্পাদনে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করেছে তখন হতেই ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ) একা ছিলেন না, স্ত্রীসহ একটি পরিবার সংগঠিত হয়েছিল। পৃথিবীতে আল্লাহ আদম (আ)-কে একা পাঠাননি। পৃথিবীর জীবন যেন সুখের হয় এবং পারলৌকিক জীবন যেন দুঃখভরা না হয়, তাই আল্লাহ পৃথিবীর জীবন পরিচালনায় কিছু নির্দেশ আদম (আ)-কে দিলেন। যা বাস্তবায়নে স্ত্রীর সহযোগিতা নিয়ে আদম (আ)-কে একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় নামতে হয়েছিল।

আল্লাহ বলেন,

"... অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল।..."

"... যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না "।[৬]

একটি পরিবারের মৌলিক চাওয়া-পাওয়া আর কোটি কোটি পরিবারের মৌলিক চাওয়া-পাওয়ার মাঝে মৌলিক কোনই পার্থক্য নেই। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীর সহযোগিতা নিয়ে প্রথম মানব, প্রথম নবী প্রকৃতপক্ষে Micro ব্যবস্থাপনার সূচনা বা পত্তন করেছিলেন। যা আজ গোটা পৃথিবীতে কোটি কোটি পরিবার নিয়ে Macro ব্যবস্থাপনার পত্তন হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী প্রক্রিয়ায় বিকশিত ব্যবস্থাপনার ফলাফল মানবজাতি বিষময়রূপে ভোগ করেছে। যুগে যুগে মানব সমাজ হতে ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও সুন্দর চরিত্রের মানুষকে মনোনীত করে আল্লাহ মানবজাতিকে সঠিক ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। যেমন, ইউসুফ (আ)-এর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় দুর্ভিক্ষ মুকাবিলা করা, মূসা (আ)-এর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ফিরাউনের "ডিভাইড এন্ড রুল" নীতি ব্যর্থ হওয়া। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সোনালী সমাজ উপহার দেয়া। এসবই মানবজাতির ইতিহাসে

---

৬. সূরা আল বাকারাহ ঃ ৩৭-৩৮, আল কুরআনুল কারীম, ইফা বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

Macro ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশের সোনালী ইতিহাস।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র ব্যবস্থাপনার ক্রমবিকাশকে ৫টি পর্যায়ে ভাগ করেছে[৭] ঃ

ক) প্রাচীন যুগ (খ্রীস্টের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত) [Ancient Period]

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ হতে ৫২৫ অব্দ পর্যন্ত সময়ের কীর্তিসমূহ প্রাচীন মিশরের ব্যবস্থাপকীয় ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে। হিব্রু সভ্যতায় হযরত মূসা (আ)-এর ভূমিকা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখে। আইন প্রণয়ন, সরকার পরিচালনা ও মানব সম্পর্ক উন্নয়ন বিষযে দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসেবে হযরত মূসা (আ)-এর অবদান স্মরণীয়।

চৈনিক সভ্যতায় ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উন্নতিতে লাও-জু (Lau-Tzu)-এর অবদান লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন চীনের প্রশাসনে বিশেষজ্ঞকর্মী (Staff advice) ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার বিকাশে গ্রীক সভ্যতারও অবদান রয়েছে। দার্শনিক প্লেটো একজন ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী একটি কাজ অর্পন করার কথা বলেছেন। এ সভ্যতায় সর্বোত্তম পদ্ধতি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো।

খ) মধ্যযুগ (খ্রিস্টের জন্মের পর হতে শিল্প বিপ্লবের পূর্বকাল) [Middle Stage]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শাসন ব্যবস্থা ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অবদানের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন, প্রতিশ্রুতি ঋণের মত (Promise is a debt)[৮] অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের মত প্রতিশ্রুতি পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যা ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য কল্যাণমূলক অবদান রাখতে সহায়তা করেছে। তিনি আরো বলেন "যারা প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভুক্ত নয় [Those who cheat is not of us (Shahih Muslim)]।"[৯] তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না" [Anyone who treats those under his authority badly, will not enter Paradise.] ।[১০] এভাবে ব্যবস্থাপনাকে একটি কল্যাণমূলক মানবিক কর্মকাণ্ডে উপনীত করেছিলেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। পরবর্তীতে হযরত আবু বাকর ও উমার (রা)-এর সময়ে ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডকে TQM (Total Quality Management i.e. Nevere

---

৭. Mohammad Khalequzzaman, Management, p-5-7/ 2nd Edition

৮. Reportedly At-Tabaraani from Ali and Abdullah Ibn Mas'ood

৯. Islam & Business Page-131 & 187

১০. জামে আত্-তিরমিযী, হাদীস নং-৯৭৭।

৮—

www.pathagar.com

Ending Process of development) পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। হযরত আবু বাকর ও হযরত উমার (রা) কর্তৃক অনুসৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মডেল ছিল নিম্নরূপঃ[১১]

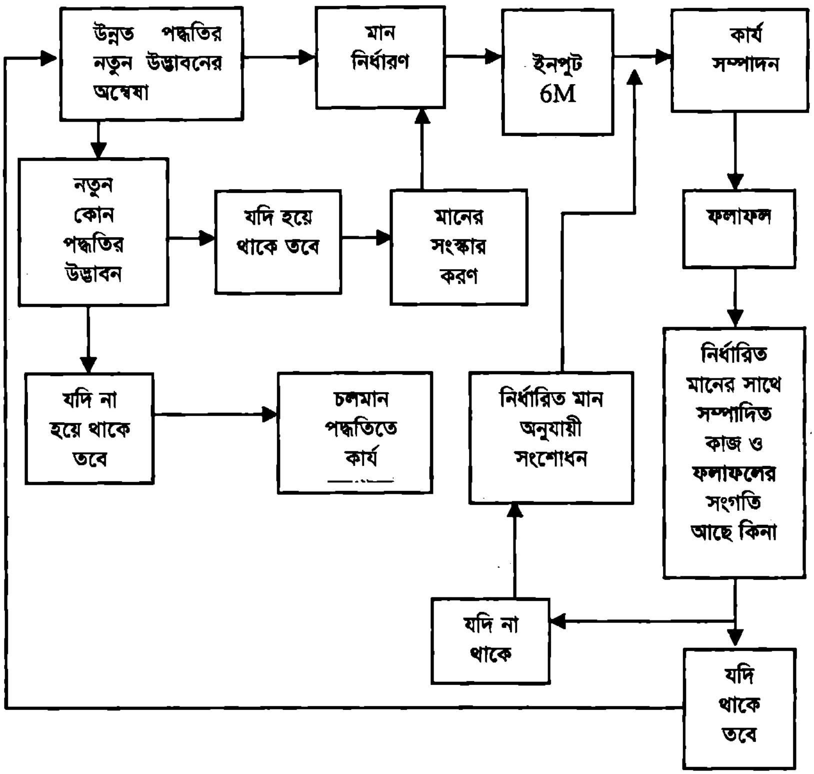

ছক চিত্র ঃ হযরত আবু বাকর ও হযরত উমার (রা) কর্তৃক অনুসৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মডেল।

এছাড়াও মধ্যযুগে যারা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখেন তাদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ঃ

১. আল ফারাবি (Al-Farabi) ঃ ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আল ফারাবি লিখিতভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। তিনি নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ এবং পরিত্যাজ্য দোষসমূহ তুলে ধরেন।

২. ইমাম আল গাযালি (Imam Gazzali) ঃ ১১০০ খ্রীস্টাব্দে 'নাসিহাত আল মুলক' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্পর্কে তিনি

১১. Dr. Md. Golam Mohiuddin, Basic Management, Page-128

www.pathagar.com

সেখানে আলোকপাত করেন।

৩. লুকা প্যাসিওলি (Lucca Pacioli) ঃ ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে লুকা প্যাসিওলি দু-তরফা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। যা ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

৪. থমাস মুর (Thomas More) ঃ মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারীদের মধ্যে থমাস মুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষায়ন এবং মানবশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করে অপচয়রোধ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা বলেন।

গ) শিল্প বিপ্লবকাল (১৭৫০-১৮৫০) [Industrial Revolution Period]

শিল্পবিপ্লবকালে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারীদের সম্পকে সংক্ষিপ্ত কথা ঃ

১. জেমস স্টুয়ার্ট (James Stewart) ঃ ১৭৬৭ সালে স্যার জেমস স্টুয়ার্ট ক্ষমতার উৎসের তত্ত্ব প্রদান করেন এবং শিল্পোৎপাদনে যন্ত্র প্রর্বতনের পক্ষে জোরালো মতামত দেন।

২. এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ঃ ১৭৭২ সালে এ্যাডাম স্মিথের 'ওয়েলথ অব নেশন' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বর্ধিত উৎপাদনে শ্রম বিভাগের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ব্যবস্থাপনার বহুবিধ সমস্যা ও ধারণা তুলে ধরেন।

৩. ম্যাথু বোল্টন ও জেমস ওয়াট (Mathew Boulton & James Watt) ঃ এ দুই বিজ্ঞ উদ্ভাবক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ করেন।

৪. রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) ঃ তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, অন্যান্য সম্পদের উপর বিনিয়োগের তুলনায় মানবশক্তি খাতে বিনিয়োগ কয়েকগুণ লাভজনক। শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনায় তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

৫. চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) ঃ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ কম্পিউটারের আবিষ্কারক। ব্যবসায়ে সফলতার জন্য, "ব্যবস্থাপনা" সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে তিনি প্রমাণ করেন এবং ব্যবস্থাপনায় গণিত শাস্ত্রের প্রয়োগে তিনি অবদান রাখেন।

ঘ) শিল্প বিপ্লব পরবর্তী যুগ (১৮৫০-১৯৫০) [Post Industrial Revolutionary Period]

এ সময়ে যে সকল মনীষী ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তার মধ্যে এফ. ডব্লিউ টেইলর ও হেনরি ফেওল অন্যতম। এ সময়ে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা একটি ব্যবস্থাপনা মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১. এফ. ডব্লিউ. টেইলর (F. W. Taylor) ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম নেয়া এ প্রতিভাধর ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা মতবাদের রূপকার। শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহারের জন্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন করেন। এতে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারায়

www.pathagar.com

ও পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

২. হেনরি ফেওল (Henry Fayol) ঃ হেনরি ফেওল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ১৪টি মূলনীতির নির্দেশ করেন। যা আধুনিক ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত হয়ে থাকে।

ঙ) আধুনিক যুগ (Modern Stage)

শিল্প বিপ্লব পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপকীয় তত্ত্ব ও এর প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে যে গবেষণা হচ্ছিল তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও আচরণ বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। এর মধ্যে, ম্যাকগ্রেগর, আব্রাহাম মাসলো, হার্জবার্গ, পিটার এফ. ড্রাকার প্রমুখ মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, নিউম্যান, জর্জ আর. টেরি, কুঞ্জ ও ডোনাল, ফিলিপ কটলার, এসপি রবিন্স আধুনিক ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন।

অন্যদিকে আধুনিক যুগে ইসলামী ব্যবস্থাপনার ধারণাকে এগিয়ে নিতে ড. এন. জাবনাউন, নিক মুহাম্মদ আফিন্দি, রফিকুল ঈসা বেকেন, জামাল বাদাবী, মোস্তফা কামাল আইয়ুব, ইসমাইল নূর, খালিদ আহমদ, সাইয়েদ ওসমান আল হাবশী, আইডিত গাজালী, ড. গোলাম মহিউদ্দিন, খুররম মুরাদ প্রমুখ মনীষীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্যবস্থাপনা ঃ বিজ্ঞান না কলা [Management : Science or Arts]

বিজ্ঞান হল সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল জ্ঞান। আর এই জ্ঞানের প্রয়োগ কৌশলই কলা। ব্যবস্থাপনার জন্য সুশৃংখল জ্ঞান যেমন প্রয়োজন তেমনি এর সঠিক প্রয়োগে লাগসই কৌশলের কোন বিকল্প নেই। সফল ব্যবস্থাপনা এ দুয়ের সমন্বয় ছাড়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান কিনা? বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

১. সত্যকে জানবার একটি সুশৃংখল জ্ঞান।
২. শুধুমাত্র ধারণার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এমন জ্ঞান নয়।
৩. জ্ঞানটি পরীক্ষিতভাবে সত্য।[১২]

ব্যবস্থাপনার যেসব নীতি, পদ্ধতি ও ধারণা প্রয়োগ করা হয় তা সুশৃংখল জ্ঞানের মধ্যেই পড়ে, যা অবশ্যই পরীক্ষিত। যেমন, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগঠন কাঠামো করে, বিভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্ব নিরূপণ করে দিলে, উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়– এ তথ্যটি একটি পরীক্ষিত সত্য। ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো শুধুমাত্র ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেমন, বেশী মজুরী প্রদান করলে, কর্মে উৎসাহ বেড়ে যায় অথবা প্রতিটি পণ্যের উৎপাদন হারে মজুরী প্রদান করলে উৎপাদন বেড়ে যায়। এসব ধারণা নির্ভর নয় বরং যুক্তিযুক্ত। এসব পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান তবে এটা পরিপূর্ণ বিজ্ঞান নয়। এটা সামাজিক বিজ্ঞান। যেমন রসায়ন বিজ্ঞানে, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণে পানি হবে। এটা অবধারিত সত্য। কিন্তু ব্যবস্থাপনা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা

---

১২. Dr. Anwar Hossain & Md. Zakir Hossain, Principles of Management, Bangladesh Open Unversity, p-4

www.pathagar.com

করে, যা খুবই জটিল এবং পরিবর্তনশীল। যেমন, ব্যবস্থাপনা নির্দেশনার কোন বিশেষ পদ্ধতি। একই পরিবেশের মধ্যে সকল কর্মীর উপর একইভাবে এর ব্যবহার সমান ফলাফল দেয় না। কারণ সকল শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক গঠন এক নয়। তাই একই নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মী বিভিন্নভাবে সাড়া দেয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনায়ও বিষয়টি একই রকম। ইসলামী ব্যবস্থাপনা ধারণা বা Islamic Management Concept-এ আল্লাহর আদেশ অমান্য করে গৃহীত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে ক্ষতি। এ ক্ষতি ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসায়, অর্থনীতি, রাজনীতি সবকিছুতেই। বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে, ইসলামী ব্যবস্থাপনায় উক্ত পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্যগুলোই বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে কুরআনে অসংখ্য পরীক্ষিত ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।

কলা হলো কোন কাজ করার কৌশল। বিজ্ঞানের তত্ত্ব বাস্তবে ব্যবহারের পদ্ধতি এবং কৌশল। কলা ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক অর্থাৎ বিজ্ঞানকে সফলভাবে ব্যবহার করার জন্য কলা প্রয়োজন। আবার উল্টোভাবে বলা যায়, কলার সফলতা আসে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে। তাই ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান হলেও এর সফল ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপনার আওতার মধ্যে, কলার উপস্থিতি থাকতে হবে।

এ বিষয়ে তিনটি কেস স্টাডি আলোচনা করা হল ঃ

কেসস্টাডি-১ ঃ

ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করতে কম্পিউটার স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এটি বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু কম্পিউটার স্থাপনের বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করবে না। কম্পিউটারকে কাজে লাগানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের কাউকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়িত্ব প্রদান করাই হল কলা।[১৩]

কেসস্টাডি-২ ঃ

কোম্পানীর চেয়ারম্যান মি.এক্স-এর কক্ষে কম্পিউটার ম্যানেজার হাতে একটা ডকুমেন্ট নিয়ে প্রবেশ করলেন। চেয়ারম্যানকে সেটি দেখিয়ে প্রশ্নের আকারে বললেন, "এখানটায় একটু সই করে দেবেন দয়া করে?

কি এটা? চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি বুঝবেন না", কম্পিউটার ম্যানেজার জবাব দেন, "এটা কম্পিউটার এর সঙ্গে সম্পর্কিত"। চেয়ারম্যান তাঁর প্রচ্ছন্ন রাগ দমন করে বলেন, "ওটা এখানে রেখে যান যখন বুঝতে পারবো তখনই সই করবো"। কম্পিউটার ম্যানেজার মহা খ্যাপপা। গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন 'এটা কম্পিউটার এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি সাধারণ কন্ট্রাক্ট মাত্র। এটা আটকে রেখে চেয়ারম্যান কন্ট্রাক্টর-এর কাছে আমাকে হেয় করছেন। তারা বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছে...।"

---

১৩. Dr. Anwar Hossain & Md. Zakir Hossain, Principles of Management, Bangladesh Open Unversity, p-5

www.pathagar.com

কম্পিউটার ম্যানেজার ইচ্ছে করলে বিষয়টি অন্যভাবে মুকাবিলা করতে পারতেন। বলতে পারতেন ঃ "স্যার, এটি আমাদের কম্পিউটার এর নিয়মিত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সংক্রান্ত। আমি এটা ভাল করে দেখে নিয়েছি, আপনি যদি পড়তে চান তাহলে আমি রেখে যেতে পারি। যদিও আমি জানি আপনার হয়তো সময় হবে না এটা পাঠ করার। যদি চান তাহলে দয়া করে এখানটায় সই করে দিতে পারেন।" সম্ভব ছিল যে চেয়ারম্যান ডকুমেন্টটি সই করে তখনই তা ফেরত দিতে পারতেন। কিন্তু, "আপনি বুঝবেন না।" কথাটি সত্য হলেও তা তাকে আহত করে এবং তার মনে বৈরিতা সৃষ্টি করে।[১৪]

এখানে কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের গোটা ব্যবস্থাপনার জন্য বিজ্ঞানসম্মত একটি পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু কম্পিউটার ম্যানেজারের কলা জ্ঞানের অভাব বিষয়টিকে সফল হতে দেয়নি। ব্যবস্থাপনা জগতে এমন অনেক সত্য রয়েছে যা প্রয়োগকারীর কলা জ্ঞানের অভাব, সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়।

কেসস্টাডি-৩ ঃ ফিরআউন ও মূসা (আ)[১৫]

৪২. তুমি [মূসা (আ)] এবং তোমার ভাই [হারুন (আ)] আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।

৪৩. তোমরা উভয়ে ফিরআউনের নিকট যাও; সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে।

৪৪. তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

৪৬. তারা বলল, হে আমাদের রব! আমরা আশংকা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।

৪৭. তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি', আমি শুনি ও আমি দেখি।

আয়াতগুলোতে মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে একজন সীমালঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রপ্রধানকে (বর্তমানের প্রচলিত ভাষায় লৌহমানব) সতর্ক করতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যা করতে হবে সে বিষয়ে আল্লাহতাআলা নির্দেশনা দিয়েছেন ঃ

১. যতই লৌহমানব হোক না কেন, ভয় করবে না।

২. যতই নির্যাতনের আশংকা হোক দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

৩. সীমালঙ্ঘনকারী হলেও তার সাথে নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে। যাতে করে সত্যকে গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ হতে মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর জন্য এটি একটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মিশন ছিল। যার সফলতার উপর ফিরআউন প্রতিষ্ঠিত গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নির্ভর করছে। যেখানে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব

---

১৪. শারু এস রাংনেকার, কর্পোরেট ম্যানেজারদের ভুবনে, পৃষ্ঠা-৬৯

১৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪২-৪৭।

www.pathagar.com

করার, জুলুম-নির্যাতন করার আর অবকাশ থাকবে না। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে অনেক ব্যাপক একটি সামাজিক পরিবর্তন। যা সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ বিজ্ঞানের এই বিশাল কর্মটি সফলভাবে সাধন করতে যে কলা প্রয়োজন সে কথাই আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিলেন, ফিরআউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থাপনাতে বিজ্ঞান ও কলার সমন্বয়েই সকল ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা রয়েছে। অনেক সময় সত্য পথের অনুসারী হবার অহংকারে অনেকে কলার প্রয়োগকে অহেতুক মনে করে। অথচ কলার প্রয়োগকে অহেতুক মনে করার মধ্য দিয়ে কার্যতঃ ইসলামী ব্যবস্থাপনাকেই অস্বীকার করা হয় এবং সত্যকে সমাজে প্রতিষ্ঠার পথে নিজেরাই প্রকারান্তরে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কলাকে এড়িয়ে ইসলামী ব্যবস্থাপনার কোন অস্তিত্ব নেই।

ইসলামী ব্যবস্থাপনার আওতা বা পরিধি [Scope of Islami Management] ঃ

ইসলামে জীবন হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এই দ্বিমাত্রিক স্তরের এক অবিভাজ্য রূপ। আর তার ব্যবস্থাপনার আওতাও উভয় স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- একটি দুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও একটি মাদক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। দুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-রক্ত-বংশ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণেই নিবেদিত। অন্যদিকে মাদক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-রক্ত-বংশ নির্বিশেষে মানুষের দীর্ঘস্থায়ী অকল্যাণে নিয়োজিত।

দ্বিমাত্রিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মাদক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের কার্যাবলী এর আওতা বহির্ভূত। কিন্তু একমাত্রিক জীবন ব্যবস্থায় যেখানে ইহলৌকিক জীবনই চূড়ান্ত সেখানে এ ধরনের সবই আওতার মধ্যে বিবেচিত। যদিও মানব কল্যাণে আসে না এমন কাজ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয় বলে সাধারণতঃ স্বীকার করা হয়ে থাকে। এ হল উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ হতে ইসলামী ব্যবস্থাপনার আওতা।

প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনায় দেখা যায়, সকল ধরনের ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে যেমন, অফিস-আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা অথবা অন্য যে কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার আওতা বলতে ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী সকল প্রতিষ্ঠানই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ হতে একটি পতিতালয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও এটা ইসলামী ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয়। কারণ, পতিতালয় কোন ধর্মের, কোন সমাজের জন্যই কল্যাণমূলক নয়। মর্যাদাপূর্ণ নয়।

একটি প্রতিষ্ঠান একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে অল্প কিছু কর্মী নিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে তা একাধিক ব্যবস্থাপক ও বহু অধীনস্থ কর্মীতে সম্প্রসারিত হয়। প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি এর জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার আওতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে এগিয়ে যেতে ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হয়েছে উচ্চ ব্যবস্থাপনা, মধ্যম ব্যবস্থাপনা, নিম্ন ব্যবস্থাপনা, সাধারণ ব্যবস্থাপনা, কর্মী ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিপণন ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ধারণার। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ, নীতি, কর্মসূচী গ্রহণ, সংগঠনের জন্য সরলরৈখিক, উপদেষ্টা নীতি, বিভাগীয়করণ কমিটি বা দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ, কর্তৃত্বস্থাপন, দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন; নির্দেশনার জন্য নেতৃত্ব, প্রেষণা, প্রণোদনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিবেদন, পরিদর্শন। ব্যবস্থাপক ও নির্বাহীদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ভারসাম্য রক্ষা করা, নির্বাহীদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানসহ তাদের কাজের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োজনীয় কর্মী বাহিনী সংগঠন, তাদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা- এসবই ব্যবস্থাপনার আওতার মধ্যে পড়ে। ইসলামী ব্যবস্থাপনারও বিষয়টি তাই। তবে ইসলামী ব্যবস্থাপনার আওতায় যে বিশেষ দিকটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে তাহলো, কর্মীর মূল্যায়ন। প্রতিটি কর্মীকেই প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ বিবেচনা করতে হবে এবং আরো বিবেচনা করতে হবে যে, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-রক্ত-বংশ নির্বিশেষে, প্রতিটি মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তাই এদের মানবিক সকল চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

"তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিৎ তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয়, তবে যেন তাকে সাহায্য করে।"[১৬]

তিনি আরো বলেন "It is most important for you to provide food and clothing to your assistants [Shahih Muslim]" "Those who work for you are your brothers, Allah has made them your assistants. (Al-Bukhari and Al-Tirmizi)".[১৭] । যখন কেউ কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে, আল্লাহ তা ভালবাসেন- Allah loves that when anyone does a job he does it perfectly [আল বাইহাকী][১৮] আল্লাহতাআলা বলেন, ... এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরকে দিয়ে কাজ

১৬. ইফাবা গবেষণা-৪২, প্রকাশনা-১৯৭৯/৬, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, জুন ২০০০, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৩৯।

১৭. Nik Mohammed Affendi Bin Nik Yusufe, Islam & Business, P-72-73

১৮. Nik Mohammed Affendi Bin Nik Yusufe, Islam & Business, P-78

www.pathagar.com

করিয়ে নিতে পারে...।[১৯] আল্লাহতাআলা আরো বলেন, "আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"[২০]

ইসলাম যেমন কর্মীকে মূল্যায়ন করার তাকিদ দিয়েছে তেমনি কর্মীকেও দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "একজন কর্মী তার নিয়োগকর্তার সম্পদের রক্ষক -A worker is the Guardian of his employers property [সহীহ আল বুখারী এবং মুসলিম]।"[২১]

ইসলামী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব [Importance of Islamic Management]

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, পারিবারিক জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নের এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত। মাদক ব্যবসা, পতিতালয়ের ব্যবসা, মজুদদারীর মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার, অস্ত্রের কারবার ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণায় স্বীকৃত হলেও ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানবজাতির জন্য কল্যাণমূলক নয়। ইসলাম যেসব বিষয় (পণ্য বা সেবা) হারাম/নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সেসব বিষয়ের ব্যবসায় বা সেসব পণ্য বা সেবাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানব কল্যাণমুখী বলে প্রমাণিত হয়নি। আর ইসলামী ব্যবস্থাপনা হল একটি মানব কল্যাণমুখী ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বজনীন ব্যবস্থাপনা। তাই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ইসলামী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য [Goal & Objectives of Islamic Management]

ইসলামী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, জীবনের এই দ্বিমাত্রিক ধারণাকে ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়। পারলৌকিক জীবনের জবাবদিহিতার মূল্যবোধ ছাড়া ইসলামী ব্যবস্থাপনার কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলামী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

লক্ষ্য

ইসলামী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হল ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন। বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে কুরআনের সূরা আল বাকারায় উদ্বৃত আয়াতে ঃ "Our Lord! Give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire!"- "হে আমাদের রব, আমাদেরকে পার্থিব জীবনের কল্যাণ দান করুন এবং পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ দান করুন এবং ভয়াবহ অগ্নি শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।"[২২]

---

১৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২।
২০. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল বাকারা, ২ ঃ ২৮৬।
২১. Nik Mohammed Affendi Bin Nik Yusufe, Islam & Business, P-78
২২. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা অআল বাকারা, ২ ঃ ২০১।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ঃ ইসলামী ব্যবস্থাপনা, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য পরিচালিত হয় ঃ

১. প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতেও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রাখা।
২. প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনীয় মুনাফা অর্জন এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
৩. চাহিদা মুতাবিক, ইসলামে হালাল বা বৈধ সকল পণ্য ও সেবার মানসম্মত যোগান প্রদান করা।
৪. সেবা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বজায় রাখা ও উন্নয়ন করা।
৫. খরচ কমিয়ে কিন্তু মান ক্ষুন্ন না করে মিতব্যয়িতার সাথে উৎপাদন নিশ্চিত করা। যা পণ্য বা সেবার প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করবে।
৬. প্রাপ্ত সম্পদসমূহ যেমন যন্ত্রপাতি, মানবসম্পদ, অর্থ ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৭. শ্রমিক-কর্মচারীদের "উৎপাদনের একটি উপকরণ মাত্র" হিসেবে বিবেচনা না করে, আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হিসেবে বিবেচনা করা এবং পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণের সাধ্যমত ব্যবস্থা করা।
৮. নতুন ও উন্নত কৌশল ও কার্যাবলীর প্রবর্তন করে পণ্য ও সেবার উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধন করা।
৯. জাতীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখা বা দেশ গড়ার অংশীদার হওয়া।
১০. মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দক্ষ কর্মী বাছাই ও নৈতিকতা ভিত্তিক যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান।
১১. প্রতিটি বিভাগে সুষ্ঠু কার্যকারিতা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন অর্জনে দক্ষতা ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করা।

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা [Management Skill in Islamic Management]

ইসলামী ব্যবস্থাপনার জন্যে তো বটেই সব ধরনের ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অপরিহার্য। সাধারণভাবে এই দক্ষতাকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. কারিগরী দক্ষতা।
২. মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা।
৩. ধারণাগত দক্ষতা।
৪. রোগ নির্ণয়মূলক দক্ষতা।

১. কারিগরী দক্ষতা

কারিগরী দক্ষতা হল যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করার যোগ্যতা। এ যোগ্যতাকে দক্ষতা তখনই বলা যাবে যখন দ্রুততম সময়ে তা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

২. মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা

www.pathagar.com

মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা হল যে কোন পরিস্থিতিতে অধীনস্থদের মধ্যে উদ্দেশ্যবোধ, ক্রিয়াবোধ ও আনুগত্যবোধ সৃষ্টিতে সক্ষমতা এবং অসন্তোষ জাতীয় পরিস্থিতি মুকাবিলায় বিচক্ষণতা। যেমন, কর্মচারীদের মধ্যে দাবী-দাওয়া নিয়ে অসন্তোষ চলাকালীন সময়ে কোন শ্রমিক-কর্মচারীর শাস্তি ঘোষণা- অসন্তোষকে আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই শাস্তি প্রয়োগ করতে হলে অসন্তোষ কমে আসলে শাস্তির প্রয়োগ করাই বিচক্ষণতা বিবেচিত হয়।

৩. ধারণাগত দক্ষতা

ধারণাগত দক্ষতা হল, প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের একটি সাধারণ ধারণা রাখা এবং তাদের সমস্যায় সমাধানের ক্ষমতা থাকা। প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের গতির একটি সমন্বিত রূপ দেখার ক্ষমতা। কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন অংশ একত্রীভূত হয় অথবা কোন একটি অংশে পরিবর্তন হলে, তা অন্যান্য অংশকে কীভাবে প্রভাবিত করে ইত্যাদি ধারণা করার ক্ষমতাই ধারণাগত দক্ষতা।

৪. রোগ নির্ণয়মূলক দক্ষতা

কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ। এজন্য অনেক কারণ দায়ী হতে পারে, যেমন কর্মীদের মজুরী কম, কাজের পরিবেশ অসহনীয়, শ্রমের যুক্তির চেয়ে শ্রমিকের যুক্তির প্রভাব, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের ইন্ধন, রাজনৈতিক প্রভাব, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক উচ্চাভিলাশ ইত্যাদি। রোগ নির্ণয়মূলক দক্ষতা হল বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অবস্থার প্রকৃতি এবং তার পেছনে দায়ী কারণগুলোকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা। অন্য কথায়, রোগ নির্ণয়মূলক দক্ষতা শুধুমাত্র কোনো ঘটনা কেন ঘটেছে তা নির্ণয় করা নয়, বরং অন্য অবস্থায় কি ঘটতো তাও পূর্বানুমান করা বুঝায়।

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনা পরিবেশ [Management Environment in Islamic Management]

ইসলামী জীবন দর্শনের দ্বিমাত্রিক জীবন ব্যবস্থার নৈতিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে, ব্যবস্থাপনায় ইসলামী পরিবেশ নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। সাধারণভাবে সব ধরনের ব্যবস্থাপনার পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment)

২. বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment)

১. অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment) ঃ অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান বলতে সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানকেই বুঝায়। সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান বলতে কাঁচামাল, শ্রমিক-কর্মী, পরিচালনা পর্ষদ, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা, মালিক বা শেয়ার হোল্ডার ইত্যাদি।

২. বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment) ঃ বাহ্যিক পরিবেশ বলতে সংগঠনের বাইরের ঐসব উপাদানকে বুঝায় যা সংগঠনের কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক। যেহেতু কোন সংগঠনই স্বনির্ভর নয়। অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

পরিবেশের পাশাপাশি বাহ্যিক পরিবেশের উপরও নির্ভর করতে হয়।

বাহ্যিক পরিবেশে সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উভয় প্রকার উপাদানই রয়েছে।

সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো হলো

প্রতিযোগী (Competitors), ক্রেতা বা ভোক্তা (Customers or End users), সরবরাহকারী (Suppliers or Vendors), মধ্যস্থ ব্যবসায়ী (Middlemen), কৌশলগত মিত্র (Strategic allies), সরকারী সংস্থা (Govt. Agencys), বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান (Investment Body) ইত্যাদি।

পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান গুলো হলো, প্রযুক্তি (Technology), অর্থনীতি (Economy), রাজনৈতিক (Political), সাংস্কৃতিক (Cultural), ভৌগলিক (Physical), সামাজিক (Social), ধর্মীয় (Religious), আইনগত (Legal Elements) এবং আন্তর্জাতিক উপাদান (International Elements)।[২৩]

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় পরিবেশের সকল উপাদান বিবেচনায় ইসলামী পরিবেশ নিশ্চিত করা একটি ব্যাপক সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার অংশ। এক্ষেত্রে তাই অগ্রাধিকারমূলকভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানগুলোকে ইসলামের উদার মূল্যবোধের আলোকে কাঠামোবদ্ধ করা এবং দীর্ঘমেয়াদী সময়ের প্রয়োজন এমন উপাদানগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি মূল্যবোধগুলোর চর্চায় ব্যাপকভাবে মানুষের অংশগ্রহণই মূলতঃ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। আর ইসলামী মূল্যবোধ চর্চায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ব্যাপক হওয়া সম্ভব হবে, ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপকভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনায় ইসলামী পরিবেশ

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণায় 'Profit maximization' হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আর প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সাধন হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। এরূপ লক্ষ্য অর্জনে সমাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ও সুদৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে। আর এজন্য ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিষয়টি আরও স্পষ্টকরণ হয়েছে- Bartol ও Martin এর মতামতে। Bartol ও Martin-এর "Organizational social responsibility refers to the obligation of an organization to seek actions that protect and improve the welfare of society along with its own interests."[২৪]

২৩. Mohammad Khalequzzaman, Management, 2nd Edition, p-64-69.

২৪. Kathryn M. Bartol & David C. Martin – Management, Mc grawHill Inc., 2nd Ed. p-103

www.pathagar.com

অর্থাৎ "প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্বপালন একটি প্রতিষ্ঠানের সেই সকল দায়বদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা পালনের ফলে সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বার্থও সংরক্ষিত হয়।"

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে ঃ

প্রথমত ঃ Profit maximization [যে কোন উপায়ে]।

দ্বিতীয়ত ঃ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শক্তির সুদৃষ্টি অর্জন।

তৃতীয়ত ঃ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণ বা উদ্ধারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ।

এই তিনটি উদ্দেশ্য অর্জনে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ধারণায়, কোন নৈতিক কাঠামো অনুসরণের কথাই বলা হয়নি।

কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালন দ্বিমাত্রিক মূল্যবোধের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এতে Fair Profit -এর মাধ্যমেই Profit maximization হতে পারে, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শক্তির সুদৃষ্টি অর্জনও সম্ভব হয় এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও ব্যবসার সম্প্রসারণও ঘটে। আর এভাবে ব্যবস্থাপনায় ইসলামী পরিবেশ তরান্বিত হয়। প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় সামাজিক দায়িত্ব পালন কৌশলগত। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সামাজিক দায়িত্ব পালন ইসলামী নৈতিক কাঠামোর ভেতর একটি অপরিহার্য কর্মকাণ্ড। পাঠক হয়তো লক্ষ্য করেছেন, ইসলামের দ্বিমাত্রিক জীবন দর্শনের ফলে ইসলামী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকের কাজ করে এবং একটি সর্বজনীন মানবিকতাবোধের ভেতর দিয়েই প্রতিষ্ঠানের সব ইহলৌকিক লক্ষ্যই সফলভাবে অর্জিত হয়। অন্যদিকে প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় যেহেতু কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াই Profit maximization করার কর্মপন্থা গৃহীত হয়, তাই এক্ষেত্রে অমানবিক পথ বেছে নিতে কারো আর বাধা থাকে না। সেটা ব্যবসার নামে টেন্ডারবাজী, অফিসে স্বজনপ্রীতি, রাজনীতিতে খুনাখুনি, সামাজিকতায় চরিত্র হনন, অর্থনীতিতে দারিদ্র্যমুক্তির আড়ালে ক্ষুদ্র ঋণের নামে সুদের শোষণ ইত্যাদি যে কোন কিছু হতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, ইসলামী ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ [Effective Organization, Islamic Management and Internal Environment]

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় যে প্রতিষ্ঠানই পরিচালিত হোক না কেন, প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু কার্যকর তা নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের কিছু উপাদানের কার্যকারিতার উপর। যেমন ঃ

প্রথমত ঃ জনশক্তির উদ্দেশ্যবোধ।

দ্বিতীয়ত ঃ সতর্কতাবোধ।

তৃতীয়ত ঃ অধঃস্তনদের জন্য উৎকণ্ঠা।

চর্তুথত ঃ শারীরিকভাবে একত্রে কাজ করা।

পঞ্চমত ঃ ন্যায়বিচার (Justice) নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

১। উদ্দেশ্যবোধ [Commitment] ঃ কার্যকর প্রতিষ্ঠানে কোন না কোন ভাবে একটি ব্যাপক উদ্দেশ্যবোধ সঞ্চারিত থাকে। প্রায় প্রত্যেকেই জানে তার কাছে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা কি? অন্যদিকে একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে লোকজনের মাঝে এমন উদ্দেশ্যবোধ লক্ষ্য করা যায় না। দেখে যেন মনে হয় তরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে চলেছে। 'অংশগ্রহণ' এর লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেই সভাগুলো সর্বাধিক জরুরী সিদ্ধান্তগুলো স্থগিত রেখেই শেষ হয়ে যায়।

একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, এতে কর্মরত লোকজনের মধ্যে সর্বাধিক উদ্দেশ্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির অনুপাত এর উপর নির্ভরশীল। অকার্যকর প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণ উদ্দেশ্যবোধ এর মাত্রা খুবই কম। এক্ষেত্রে লোকজন কোনরূপ অঙ্গীকার, সম্পৃক্ততা কিংবা অবদানবোধ নিয়ে কাজ করে না।

উদ্দেশ্যবোধ এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের বা কোন পদমর্যাদার সংশ্লিষ্টতা নেই। অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা পদমর্যাদার লোকের মধ্যে উদ্দেশ্যবোধ কার্যকর থাকবে ব্যাপারটি এমন নয়। কোন প্রতিষ্ঠানে, এমনকি চেয়ারম্যান-এরও এমন উদ্দেশ্যবোধ থাকে না, যে চেয়ারম্যান-এর কাছে অফিসের কাজের চাইতে গলফ খেলা বা টিভিতে খেলা দেখা অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। অপরদিকে একজন সাধারণ শ্রমিক বা কর্মীর মাঝেও একটি উদ্দেশ্যবোধ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করে তুলতে উদ্দেশ্যবোধ-এর দু'টো কেস উল্লেখ করছি

কেস-১ ঃ একজন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরী পরিদর্শনে যান। ফ্যাক্টরীতে সম্প্রতি উৎপাদন দ্বিগুণ করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং তাতে সবাই তখন ভীষণ উৎফুল্ল। মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক উভয়েই বিষয়টি পরিদর্শককে অবহিত করলেন। প্রোডাকশান ম্যানেজারও ঐ সুসংবাদটি তাকে দিলেন। শেষে ওয়ার্কশপে এসে পৌঁছলে একজন লেদমেশিন অপারেটরও এ নিয়ে কথা বলছে– পরিদর্শকের তা নজর কাড়ে। তখন পরিদর্শক সেই শ্রমিককে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি এ ব্যাপারে এত আগ্রহী হলেন কেন? ম্যানেজার এবং সুপারভাইজারদের কথা না হয় বুঝলাম তারা হয়তো পদোন্নতি পাবেন। আপনার বেলায় কি হচ্ছে, এখন দশটা লেদ আপনার চারপাশে চলছে যা বেড়ে বিশটি হবে। তার অর্থ তো হল আরও অধিক শব্দ।" লেদ অপারেটর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, না না আপনি অবস্থাটা বুঝছেন না। আমরা সারা দেশের গ্রামগুলোর বিদ্যুতায়নের সঙ্গে জড়িত। দ্বিগুণ ক্ষমতা দিয়ে বিদ্যুতায়নের গতিও দ্বিগুণ হবে। আমি নিজে যে গ্রাম থেকে এসেছি সেখানে মাত্র তিন বছর আগে বিদ্যুৎ এসেছে এবং তারপর গ্রামে জীবনযাত্রার মান বদলে যেতে দেখেছি। এটা এই ফ্যাক্টরীর সম্প্রসারণের সাথে সাথে আরও দ্রুত বিস্তার লাভ করবে।

যে কেউ অনুধাবন করতে পারবেন এই অপারেটরের মাঝে উদ্দেশ্যবোধ কতোটা থাকতে পারে।

www.pathagar.com

কেস-২ ঃ উদ্দেশ্যবোধ সনাক্ত সম্ভব যদি বিবেচনা করা যায় কিসের আকর্ষণে প্রতিদিন মানুষ কাজে ছুটে যায়। কোনো এক ক্ষেত্রে, এক ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে ওঠে, কিন্তু তার আলস্য যেন কাটে না। ভাবে আজ ডুব দেবে, অফিসে যাবে না। তারপর ভাবে, না এরি মধ্যে বেশ ক'দিন ক্যাজুয়েল লীভ ভোগ করেছি, সামনে হয়তো আরও কিছুদিন ছুটির প্রয়োজন হবে। নাহ্, তার চেয়ে বরং আজ অফিসে যাই, একদিনের ক্যাজুয়েল ছুটি বাঁচাই। অন্য একটি ক্ষেত্রে, এ ব্যক্তি হয়তো সকালবেলায় জ্বর জ্বর অনুভব করছে, অনেকদিন ছুটিও তার পাওনা আছে, কিন্তু সে ভাবে 'শরীরের ঐ অবস্থা সত্ত্বেও সে অফিসে যাবে। কেননা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাকে করতে হবে।' সুতরাং স্ত্রীর কাছে জ্বর এর ভাবটা গোপন করে যায় এই ভয়ে যে স্ত্রী যদি তাকে অফিসে যেতে বাধা দেন।

স্পষ্টতঃই এই ব্যক্তির একটি উদ্দেশ্যবোধ আছে। জ্বর আসছে মনে হলেও সেই লোকটির উদ্দেশ্যবোধ তাকে কাজে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।[২৫]

২। সতর্কতাবোধ [Awareness] ঃ উঁচু কার্যকারিতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সতর্কতাবোধ। যেমন কারোর যদি নজরে পড়ে যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কোন সুযোগের অপচয় হচ্ছে কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোথাও অনভিপ্রেত কিছু ঘটে যাচ্ছে, তাহলে সে সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের কাউকে অবহিত করা জরুরী মনে করে, যার সর্ম্পকে সে জানে যে তার কাছে গেলে এসবের প্রতিকার পাবে। এভাবে অবহিত করার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সিস্টেম, পদ্ধতি, যোগাযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি যেমন একদিকে অলংঘনীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে তেমনি একটা প্রচ্ছন্ন উপলব্ধিও সকলের মাঝে বিরাজ করে যে এগুলো প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের অধীন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা থাকলে ঐ যোগাযোগ চ্যানেল-এর ব্যত্যয় ঘটানো যেতে পারে কিংবা সিস্টেম বা পদ্ধতি ভেঙ্গে সুনির্দিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা যাবে।

অপরদিকে একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে কোথায় কি হচ্ছে সেদিকে কারোর কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। অপচর্চা ও দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে; সেগুলো প্রতিরোধ করার জন্য কারোর মাথা ব্যথা নেই। ফলাফল দাঁড়ায়, প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সুযোগ হাতছাড়া হয় এবং কাজও কম হয়। যদি কেউ স্ব-উদ্যোগে প্রকৃত কিংবা সম্ভাব্য অপকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট করে, পাল্টা তাকেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে এবং নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। প্রতিষ্ঠানটি সুযোগ-এর সুবিধা লাভে ব্যর্থ হয় কিংবা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোন আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। বাস্তবে দেখা যায়, একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ ব্যক্তি সর্বশেষে অবহিত হন।

৩. অধস্তনদের জন্য উৎকণ্ঠা [Responsibility to Employees/Fellows] ঃ জনশক্তির কর্মসম্পাদন ক্ষমতা, সম্ভাবনা এবং অগ্রগতির প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকার অর্থে অধস্তনদের জন্য উৎকণ্ঠা, উঁচু কার্যকারিতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তির প্রতি ব্যবস্থাপনার কোন যত্ন

২৫. শারু এস রাংনেকার, কর্পোরেট ম্যানেজারদের ভুবনে, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫-৫৬

www.pathagar.com

নেই, বরং জন্তু বা যন্ত্র হিসেবে মূল্যায়ন আছে। লোকজনদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন এর প্রতি ব্যবস্থাপনার কোন আগ্রহই নেই। ফলে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে অধস্তনগণ তাদের করণীয় কাজের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দেয় এবং তারা অনুভব করে যে উপরে কেউ আছেন যিনি তাদের ভালমন্দ দেখছেন। আর অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে অধস্তন ব্যক্তি কখনো তার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দেয় না। সে নিশ্চিত যে তার ঘর নিজেকে সামলাতে হবে। তাই চিন্তায় থাকে কি করা যায়, বস এর কাছ থেকে কখনো কোনো সমর্থন প্রত্যাশা করা যায় না। কার্যকর ইসলামী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে তাই ব্যবস্থাপনাকে অধস্তনদের প্রতি দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে। অধস্তনদের প্রতি দায়িত্ব বলতে কি বুঝায় তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত হাদীস হতে সুস্পষ্ট হয় ঃ

"তারা (অধঃস্তনরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কারো (দীনী) ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিলে সে যা খাবে তাকে তা থেকে খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করবে তাকে তা থেকে পরিধান করতে দেবে। আর যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তা করার জন্য তাকে বাধ্য করবে না। আর সেই কাজ যদি তার দ্বারাই সম্পন্ন করতে হয়, তবে সে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে।"[২৬]

অন্যদিকে কার্যকর ইসলামী ব্যবস্থাপনায় অধঃস্তনদের দায়িত্ব বলতে কি বুঝায় তাও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস হতে সুস্পষ্ট হয় ঃ "একজন অধঃস্তন নিয়োজিত ব্যক্তি (শ্রমিক বা কর্মচারী), তার নিয়োগকর্তার সম্পদের অভিভাবক বা সংরক্ষক।"[২৭]

অর্থাৎ কার্যকর ইসলামী ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকর্তা অধস্তনদের অধিকার পূরণে যেমন উৎকণ্ঠিত থাকেন তেমনি অধীনস্থ নিয়োজিত, যেমন শ্রমিক-কর্মচারীরা, নিয়োগকর্তার স্বার্থ সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবেই সচেষ্ট থাকে।

৪. শারীরিকভাবে একত্রে কাজ করা [Team Spirit] ঃ উঁচু কার্যকারিতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলা। অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক সমন্বয়হীনতার মধ্যে কাজ চলে। স্মারকপত্র চালাচালি হয়। আনুষ্ঠানিক সভায় সমস্যা সমাধান বা মুকাবিলা করার চাইতে সমস্যাকে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে মারার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানে "দশে মিলি করি কাজ" এ নীতির শত্রুর অভাব নেই। কম-বেশী দুর্ঘটনা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই ঘটে। কার্যকর প্রতিষ্ঠানে লোকজন একে অপরের সংগে সাক্ষাৎ করে এবং এ দুর্ঘটনায় সৃষ্ট সমস্যা মুকাবিলার জন্য সবাই ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে কাজ করে। অকার্যকর কোন প্রতিষ্ঠানে একে অপরের সংগে ঝগড়া বিবাদ কিংবা শত্রুতা থাকলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য দুর্ঘটনাটির সুযোগ নেয়।

---

২৬. সহীহ আল-বুখারী , ২য় খণ্ড, পৃ.-৮৯৪
২৭. সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় দিনে-রাতে পাঁচবার একত্রে সালাত আদায় করার বিধান পালনের মাধ্যমে শারীরিকভাবে একত্রে কাজ করার এবং বিভিন্ন পদবীতে কর্মরত সবার একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিংবা মালিক যখন শ্রমিক-কর্মচারীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে সালাত আদায় করেন, তখন ইসলামী ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা বাস্তব রূপ লাভ করে। এছাড়াও একই পোশাক, একই খাবার ইত্যাদি নীতিমালা কার্যকরী করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলা যায়। যা প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ কার্যকারিতা সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টর।

৫. ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা [Ensuring Justice] ঃ উঁচু কার্যকারিতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিষ্ঠানে রক্ত, বর্ণ, বংশ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের জনবলের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। ইসলামের নির্দেশনাও তাই। আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়োনা। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন।"[২৮]

আল্লাহ্ আরো বলেন, "আল্লাহ্ ন্যায়বিচার/ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ (Fair dealing)...এর নির্দেশ দেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[২৯]

ন্যায়বিচার, উচ্চ-প্রণোদনা বা প্রেষণার অন্যতম উৎস। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক নির্মল সম্পর্কের ও টীম স্পিরিটের একমাত্র ভিত্তি। ন্যায়বিচার সকল নেতৃত্বের চাবিকাঠিও। অন্যদিকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে স্বজনপ্রীতি বা আঞ্চলিকতা ন্যায়বিচারের স্থলাভিষিক্ত হয়। ন্যায়বিচারের অভাবে উচ্চ মাত্রার উদাসীনতা এবং দুর্বল টীম স্পিরিট প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশইঃ অকার্যকর করে তোলে।

ইসলামী ব্যবস্থাপনা ও হেনরী ফেয়ল (Henry Fayol)-এর ১৪টি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা [Islamic Mgt. and 14 Mgt. principles of Henry Fayol]

ফরাসী শিল্পপতি হেনরী ফেয়ল ১৮৪১ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে ফরাসী ভাষায় ব্যবস্থাপনা নীতিমালার উপর তার 'Administration Industrially Generale' বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে তা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। ফেয়ল তার অভিজ্ঞতা থেকে ১৪টি ব্যবস্থা নীতির উল্লেখ করেন।[৩০] ইসলামী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ হতে উক্ত ১৪টি ব্যবস্থা নীতির প্রায়োগিক আলোচনা

---

২৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আন্ নিসা, ৪ ঃ ১৩৫।
২৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আন্ নাহল, ১৬ : ৯০।
৩০. Dr. Anwar Hossain & Md. Zakir Hossain, Principles of Management, Bangladesh Open Unversity, p. 38-39

৯—

www.pathagar.com

নিম্নরূপ ঃ

১. শ্রম বিভাজন (Division of Labour) ঃ শ্রমশক্তি ব্যবহারে বিশেষায়নের নীতি প্রয়োগ করা উচিৎ। যেমন, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে সম্পূর্ণ জামা একজন তৈরি করে না। –একজন শুধু জামা কাটে, একজন মেশিনে সেলাই করে, একজন হাতের কাজ করে। এভাবে ভাগ করে দক্ষতার সাথে কাজ করলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। বদরের যুদ্ধে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের শ্রম বিভাজন করে তিরন্দাজ, ঘোড় সওয়ার এবং সম্মুখ যোদ্ধাদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষের বিশাল আয়োজন সত্ত্বেও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্রম বিভাজন ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সহায়তা করেছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন কেউ কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে আল্লাহ তা ভালবাসেন।"[৩১]

শ্রম বিভাজন সুচারুরূপে কার্য সম্পাদনের একমাত্র হাতিয়ার। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে আন্তরিক এবং তার নিয়োগকর্তার অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সাথে সম্পাদন করে।"[৩২]

২. ক্ষমতা ও দায়িত্ব (Authority and responsibility) ঃ ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কোন নির্বাহীকে কোন কাজের দায়িত্ব দিলে, ঐ কাজটি করার জন্য তাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিতে হবে। আল্লাহ পৃথিবীর বুকে যত রাসূল বা নবীকে রিসালাত বা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই যুক্তিযুক্ত ক্ষমতাও দিয়েছিলেন।

৩. শৃঙ্খলা (Discipline) ঃ সাফল্যের জন্য শৃঙ্খলা অপরিহার্য। দিনে-রাতে পাঁচবার সালাতে অংশগ্রহণ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে। এ শৃঙ্খলা শুধু পার্থিব জীবনের সফলতা নয়, পারলৌকিক জীবনের সফলতারও চাবিকাঠি। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় সালাত আদায় আবশ্যিকভাবেই অপরিহার্য। এছাড়া ইসলামী ব্যবস্থাপনায় রয়েছে আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য। যা প্রতিষ্ঠানে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

৪. আদেশের ঐক্য (Unity of Command) ঃ প্রতিষ্ঠানের সু-ব্যবস্থাপনার জন্য একজন কর্মীর শুধুমাত্র একজন নির্বাহীর কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া উচিৎ। দ্বৈত নির্দেশনা কাজে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। ইসলামে আদেশের ঐক্যের এতটাই গুরুত্ব যে, তিনজনের একটি সফর কর্মসূচীতে একজনকে, আদেশের জন্য নির্বাহী বা নেতা মনোনীত করে নিতে তাকিদ দিয়েছেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "কোন সফরে যদি তিনজন ব্যক্তি থাকে তবে তারা যেন তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাহী নিয়োগ করে"।[৩৩]

---

৩১. বায়হাকী

৩২. সহীহ আল বুখারী

৩৩. আবু দাউদ

www.pathagar.com

সফর সবসময়ই স্বল্পমেয়াদী। অন্যদিকে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে। কাজেই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার আদেশে ঐক্য একটি অপরিহার্য ইসলামী ব্যবস্থাপনা নীতি।

৫. নির্দেশনার ঐক্য (Unity of direction) ঃ একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত একটি শাখার সকল কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা এবং এর তত্ত্বাবধানে একজন নির্বাহী থাকবে। চতুর্থ নীতির সাথে এর পার্থক্য হল, চতুর্থ নীতিটি কর্মী সংক্রান্ত, এই নীতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পর্কিত। সেইসাথে শ্রম বিভাজনের মত একে কর্ম বিভাজন নীতিও বলা যায়। যা একজন নির্বাহীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। যাকাত আদায় ও বন্টন এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা শাখার জন্য দুইজন নির্বাহীর পরিবর্তে একজন হলে তাতে নির্দেশনার ঐক্য বিঘ্নিত হতে পারে।

৬. ব্যক্তির চাইতে সমষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণ (Subordination of individuals to General Interests) ঃ সমষ্টির স্বার্থের মাঝেই ব্যক্তির স্বার্থ রয়েছে। ব্যক্তি যখন বুঝবে সমষ্টির স্বার্থ বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং এই স্বার্থ সংরক্ষণে তার নিজেরও স্বার্থ কিছুটা সংরক্ষিত হচ্ছে, তখন সে কাজ গভীর আন্তরিকতার সাথেই করবে।

আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ভালকাজ করে বা নেক আমল করে তা তার নিজের জন্যই।'[৩৪] নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক। তা তোমার পক্ষ থেকে তোমার জন্যই সাদাকা।[৩৫]

৭. পারিশ্রমিক (Remuneration) ঃ পারিশ্রমিক এবং পারিশ্রমিক দেয়ার নিয়ম এমন হওয়া উচিৎ, যাতে কর্মী এবং মালিক সবাই সন্তুষ্ট থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনটি হাদীস উদ্ধৃত করছি ঃ

ক. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) " মজুরের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিয়োগ করতে নিষেধ করেছেন।"[৩৬]

খ. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'।[৩৭]

গ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ উত্থাপন করবেন। তন্মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি কাউকে মজুর হিসেবে খাটিয়ে ও তার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা সত্ত্বেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।"[৩৮] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "For your workers there must be satisfaction with their basic requirements. **[Shahih Muslim]**"[৩৯]

---

৩৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৫।
৩৫. সহীহ আল-বুখারী ও সহী মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ড, পৃ.-১১৪
৩৬. বায়হাকী, ইসলামের অর্থনীতি, পৃ.-১১৭
৩৭. ইবনে মাজা, সূত্রঃ হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩
৩৮. সহীহ আল বুখারী, হিদায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৯৩
৩৯. Nik Mohammed Affendi Bin Nik Yusufe, Islam & Business, P-73

www.pathagar.com

৮. কেন্দ্রীকরণ (Centralization) ঃ ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ ততটুকুই হওয়া উচিৎ, যতটুকু প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক সাফল্যের জন্য দরকার। ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যা কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য বাধা তাহল অধস্তন ও নির্বাহীদের পারস্পরিক আস্থার অভাব, এ বাধাকে জয় করতে হবে। আর ইসলাম পারস্পরিক আস্থার অভাব মিটিয়ে দেয়। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই Right man in the right place নিশ্চিত করতে হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "If you give a job to someone who is not knowledgeable just wait for the destruction"[৪০]

৯. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খল (Scalar Chain) ঃ প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত নির্বাহীদের পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হওয়া। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধ খুবই কার্যকর। এ সম্বন্ধের অভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দীর্ঘসূত্রিতায় আক্রান্ত হয়। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ এ সম্বন্ধ সৃষ্টির চাবিকাঠি।

১০. সবকিছু অবস্থানমত থাকা (Order) ঃ লক্ষ্যার্জনে কাজকে সুষ্ঠু গতিতে এগিয়ে নিতে সবকিছু জায়গামত থাকা প্রয়োজন। উহুদের যুদ্ধে পাহাড়ের পাহারায় থাকতে যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাদের জায়গামত না থাকাতে মুসলিমদের লক্ষ্য পূরণ ব্যাহত হয়েছিল।

১১. সমতা (Equity) ঃ সমতা বা Equity বলতে মালিকপক্ষের নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন ব্যবহার এর মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য এবং নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা বুঝানো হচ্ছে। সমতা বস্তুতঃ ন্যায়বিচার অর্থে। আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ (Fair dealing)...এর নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৪১]

ইসলামে সমতা বা ন্যায়বিচারকে বলা হয় Hygiene Factor, যা প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশকে সুস্থ রাখে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধকে অক্ষুন্ন রাখে।

১২. কর্তৃত্বের স্থায়িত্ব, কাজের স্থায়িত্ব (Stablity of Tenure) ঃ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কর্তৃত্ব ও কর্মীদের কার্যকালের নিরাপত্তা বিধান দরকার। যদি প্রতিষ্ঠানে কিছু দিন পরপর কর্মী বদল হয়, তবে তা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের প্রতিও বাধা স্বরূপ। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় তাকওয়ার গুণ, জনশক্তির মাঝে পারস্পরিক গভীর আস্থার একমাত্র ভিত্তি। তাকওয়ার অধিকারী এবং যোগ্য কর্মীদল গড়ে তোলা সম্ভব হলে ঘন ঘন কর্মী বদলের কোন প্রয়োজন হয় না।

১৩. উদ্যোগ গ্রহণ (Initiative) ঃ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কর্মীরা যাতে ব্যক্তিক উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত হয়, সেদিকে নির্বাহীর

---

৪০. Said by Abu Huraira, Nik Mohammed Affendi Bin Nik Yusufe, Islam & Business, P-74

৪১. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আন্ নাহল, ১৬ ঃ ৯০।

www.pathagar.com

লক্ষ্য রাখা উচিৎ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "An employee who excels in his devotion to Allah and also renders to his master what is due to him of duty, sincerity and obedience, for him there is double reward with Allah **[Al-Bukhari]**" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "Allah loves that when anyone does a job, he does it perfectly. **[Al-Bukhari]**"[৪২]

১৪. একতাই শক্তি (Esprite de Corps) ঃ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য যৌথ প্রচেষ্টার উপর নির্ভলশীল; তাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এমন হতে হবে যাতে কর্মীদের কার্যধারার মধ্যে একতা আনা সম্ভব হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় একতা ও শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।"[৪৩] আল্লাহ আরো বলেন, "যারা ঐক্যবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত আল্লাহর পথে [In the way of Allah] সংগ্রাম করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।"[৪৪]

১৯১৬ সালে উপস্থাপিত হেনরী ফেয়লের এই নীতিমালাগুলো আধুনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হেনরী ফেয়লের নীতিমালার সাথে ইসলামী ব্যবস্থাপনার সার্বিকভাবে তুলনা, বিপরীতমুখী নয় বরং ইসলামে এসব নীতিমালা ১৪০০ বছর পূর্বেই আলোচিত ও অনুসৃত হয়েছিল।

এছাড়া বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক ও প্রবক্তা বলে খ্যাত ফেডরিক উইনস্লো টেলর ১৯১১ সালে তার বিখ্যাত বই 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিমালা (The Principles of Scientific Management) প্রকাশ করেন।

ফেডরিক উইনস্লো টেলর, যে মৌলিক নীতিমালা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর বলে মনে করতেন, তাহলোঃ

১. অনুমানের উপর নির্ভর না করে বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিমালা ব্যবহার করা।
২. দলগত কাজে বিভেদ নয়, একতা।
৩. ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশৃংখলার চাইতে দলের সকল সদস্যের সহযোগিতা অর্জন করা।
৪. সীমিত নয় বরং সর্বোচ্চ উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করা।
৫. শ্রমিকের এবং কোম্পানীর স্বার্থে শ্রমিককে সম্ভাব্য পরিপূর্ণভাবে উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।[৪৫]

ফেডরিক উইনস্লো টেলর কর্তৃক উপরের যে মৌলিক নীতিমালাগুলো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর বলে মনে করতেন, ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলাম

---

৪২. Nik Mohammed Affendi Bin Nik Yusufe, Islam & Business, P-78
৪৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল আনফাল, ০৮ ঃ ৪৬।
৪৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আস্ সাফফ্, ৬১ ঃ ০৪।
৪৫. Dr. Anwar Hossain & Md. Zakir Hossain, Principles of Management, Bangladesh Open Unversity, p. 37

www.pathagar.com

বিষয়গুলোকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছে তা ব্যবস্থাপকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

অনুমানের উপর নির্ভর না করে বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিমালা ব্যবহার করা

তথ্যকে যাচাই করে ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ, কুরআনের সূরা আল হুজুরাত-এ যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা ব্যবস্থাপকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে ইসলামে বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিমালা ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে ১৪০০ বছর আগেই। আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ, যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।"[৪৬]

দলগত কাজে বিভেদ নয়, একতা

দলগত কাজে ইসলাম বিভেদ বর্জন করে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলেছে। শুধু তাই নয় বিভেদ করলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।"[৪৭]

আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।"[৪৮]

ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশৃংখলার চাইতে দলের সকল সদস্যের সহযোগিতা অর্জন করা

দলের সকল সদস্যের সহযোগিতা অর্জন করতে ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও নির্দেশনা রয়েছে তা যে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন, "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর .... "[৪৯]

সীমিত নয় বরং সর্বোচ্চ উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করা

বস্তুতঃ উদ্দেশ্যবোধ বা কমিটমেন্ট হতেই সর্ব্বোচ্চ প্রণোদনা উৎসারিত। আর সর্ব্বোচ্চ প্রণোদনাই কেবল সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে। ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বেই সর্ব্বোচ্চ প্রণোদনার বিষয়ে ভূমিকা রাখার যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা এখনও অনন্য।

নবী (সা) বলেন, "সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে আন্তরিক এবং তার নিয়োগকর্তার অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে, নিষ্ঠা ও

---

৪৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ০৬।
৪৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল আনফাল, ০৮ ঃ ৪৬।
৪৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল আনফাল, ০৩ ঃ ১০৩।
৪৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১০।

www.pathagar.com

আনুগত্যের সাথে সম্পাদন করে।"[৫০] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "যখন কেউ কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করে আল্লাহ তা ভালবাসেন।"[৫১]

শ্রমিকের এবং কোম্পানীর স্বার্থে শ্রমিককে সম্ভাব্য পরিপূর্ণভাবে উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করা, মজুরী নিয়ে অবিচার না করা, মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মত ন্যূনতম মজুরী দিয়ে সুবিচার করা, ঘাম শুকোনোর আগেই তার মজুরী পরিশোধ করা এবং সাধ্যাতীত কাজের বোঝা তার উপর না চাপানো - কোনো শ্রমিক-কর্মচারীর সাথে যদি এই ব্যবহার করা হয় তবে কার্যতঃ তা শ্রমিককে সম্ভাব্য পরিপূর্ণভাবে উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ারই নামান্তর। আর শ্রমিকদের এসব অধিকার ঘোষিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বেই।

আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ (Fair dealing)...এর নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৫২] আল্লাহতাআলা আরো বলেন, "আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"[৫৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিৎ তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দেবে না, যা তার সাধ্যাতীত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয়, তবে যেন তাকে সাহায্য করে।"[৫৪]

হেনরী ফেয়লের ব্যবস্থাপনার ১৪টি মূলনীতি এবং ফেডরিক উইনস্লো টেলর প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালার সাথে ইসলামী ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা হল হেনরী ফেয়ল ও টেলর তাদের এই নীতিমালা প্রয়োগে নৈতিকতার ভূমিকাকে কোন প্রয়োজনই মনে করেননি। অন্যদিকে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নৈতিকতাকে এড়িয়ে গেলে তা আর ইসলামী ব্যবস্থাপনাই থাকে না।

ইসলামী ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী (Islamic Managemant & Managemant Function)

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সকল কাজ : যেমন পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশনা, প্রেষণা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ, একটি বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য যেমনি প্রয়োজন তেমনি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্যও ব্যবস্থাপনার এ সকল কাজ

৫০. সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম।
৫১. বায়হাকী।
৫২. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আন্ নাহল, ১৬ ঃ ৯০।
৫৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল বাকারা, ২ ঃ ২৮৬।
৫৪. ইফাবা গবেষণা-৪২, প্রকাশনা-১৯৭৯/৬, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, জুন ২০০০, দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৩৯।

www.pathagar.com

সম্পাদনের বিকল্প নেই।[৫৫] একজন পরিবার প্রধান যেমন ব্যবস্থাপক তেমনি একজন সরকার প্রধানও এক অর্থে ব্যবস্থাপক। পরিবার প্রধান যদি পরিকল্পিতভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও উপকরণাদির সুষ্ঠু ব্যবহার ব্যবস্থাপনা কার্যাদির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারেন তবে তার পক্ষে লক্ষ্যার্জন সম্ভব হয়। অন্যদিকে একজন সরকার প্রধানকেও তার জনগণ ও সহায় সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা কার্যাদির সহায়তা নিতে হয়। সকল সমাজেই ব্যবস্থাপনার কাজের ধরন ও প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরনের। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠান ও সমাজভেদে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বিশ্বায়নের এ যুগে ব্যবস্থাপনা ও তার কার্যাদি সর্বজনীনতা লাভ করেছে।

ইসলামী ব্যবস্থাপনায় এই সর্বজনীন কার্যাদির ভূমিকা, ইসলামী নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাই একজন ইসলামী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন কার্যাদি যেমন নিশ্চিত করতে হয় তেমনি নিশ্চিত করতে হয় ইসলামী নৈতিকতার মান। প্রসঙ্গত ঃ ব্যবস্থাপনা কার্যাদির একটি প্রধানতম কার্য প্রেষণা বা প্রণোদনা নিয়ে কেসস্টাডি ভিত্তিক আলোচনা করা হল ঃ

কেসস্টাডি ভিত্তিক প্রধানতম ব্যবস্থাপনা কার্য[৫৬]

প্রেষণা বা উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থাপনা কার্যাদির একটি প্রধানতম কার্য। যার সঠিক প্রয়োগ, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের সহায়ক এবং ভুল প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল কার্যাদি অকার্যকর হয়ে পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশকালে যে কোন ব্যক্তির কার্য সম্পাদনের দু'টি স্তর এর কথা ভাবা যায়।

প্রথমত ঃ কত অল্প কাজে সে সারতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ কতোটা বেশী সে করতে সক্ষম। এই দুটির মাঝের প্রভেদই হল, প্রেষণা বা উদ্বুদ্ধকরণ বা মটিভেশন।

একজন ব্যক্তির সর্বাধিক কর্ম সম্পাদনের বিষয়টি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। যতোই সে ঐ স্তরে পৌঁছতে যাবে ততোই স্তরটা আরও উপরে চলে যায় আর এভাবেই একজন ম্যানেজারের বিকাশ ঘটে। চিরাচরিত পথে যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়, তা হচ্ছে গাজর এবং লাঠি বা টাকা এবং ভয়। আমরা যদি একজন কর্মচারীকে বলি "আমি চাই আজ বিকেলের মধ্যে এ কাজটি করা হোক, তা না হলে আগামীকাল আর আসবার কথা তুমি ভেবো না"। প্রচুর সম্ভাবনা থাকে যে, সে কাজটি সেরে রাখবে। সমস্যাটা হল, ধরা যাক সে উল্টো বলছে, "আমি এ কাজটি আজ বিকেলের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারবো না এবং আগামীকাল আমি আসছি। দেখবো আপনি কি করেন?" তাহলে আপনি সমস্যায় পড়ে যাবেন। কেননা ভীতিটা এখন আপনার দিকে। এখন ভয় অনেক কম, ফলে ভয়-ভীতি দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ বা ম্যানেজ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ভয়-ভীতি যদি কাজ না করে তবে সাধারণতঃ অর্থের ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ লাঠিতে

---

৫৫. Mohammad Khalequzzaman, Management, 2nd Edition, p. 51-56

৫৬. শারু এস রাংনেকার, কর্পোরেট ম্যানেজারদের ভুবনে, পৃষ্ঠাঃ ১১৫-১২৭

www.pathagar.com

কাজ না হলে গাজর ব্যবহার করো। কিন্তু অর্থও তার নিজস্ব সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো, কতোটা অর্থ পাওয়া যাবে? **অর্থ প্রদান করবার সহজতম পন্থা হলো ওভারটাইম দেয়া**। কিন্তু একবার যদি কেউ তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তবে সে স্বাভাবিক সময়ে কাজ করতে চাইবে না। কোন একজন শ্রমিক যেমন বলেছিল, 'সময় মানে অর্থ, কিন্তু ওভারটাইম মানে অধিক অর্থ।' একজন লোক যত বেশী অর্থ পায় ততো বেশী সে চায়, **ফলে ওভারটাইম বাড়তেই থাকে**। একদিন হয়ত আপনার বস বলবেন, 'আপনার ডিপার্টমেন্টে অতিরিক্ত ওভারটাইম হচ্ছে। এটা কমান, একেবারে বাদ দিয়ে দিন। আপনি ডিপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে আপনার লোকজনকে বলবেন, 'এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। সাথে সাথে তারা জানতে চাইবে কতোটা ওভারটাইম?

আপনি বলবেন, 'কোনো ওভারটাইম নয়। তারা বলবে, ওভারটাইম নয় মানে? ওভারটাইম ছাড়া কিভাবে কাজটি করা যাবে? তাই ওভারটাইম দ্বারা ম্যানেজ করা মানে নিজের সমস্যা নিজেই সৃষ্টি করা এবং অচিরেই দেখা যাবে ওভারটাইম ছাড়া ম্যানেজই করা যাচ্ছে না। **যখন ওভারটাইম পাওয়া যাবে না তখন সকল ব্যবস্থাপনা জানালা দিয়ে পালাবে।**

ফলে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, অর্থ ও ভয় মানুষ পরিচালনার ক্ষেত্রে বা মটিভেশনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না। তাহলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে ভবিষ্যতে তিনটি উদ্বুদ্ধকরণ উপাদানের কথা ভাবতে হবে ঃ

ক) স্বকীয়তাবোধ বা একাত্মতাবোধ।

খ) গুরুত্ববোধ এবং

গ) উন্নয়নবোধ।

ক) স্বকীয়তাবোধ বা একাত্মতাবোধ ঃ নিজের মনে করাই স্বকীয়তাবোধ। একবার কোনো ব্যক্তি যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রতিষ্ঠানটি তার নিজের তাহলে তা ঐ ব্যক্তির স্বয়ংক্রিয় উদ্বুদ্ধকরণের কারণ হয়ে পড়ে। এই উপলব্ধিই একটি উদ্বুদ্ধকারী শক্তি। স্বকীয়তাবোধের উপলব্ধি মানুষকে জীবন বিসর্জন দিতেও উদ্বুদ্ধ করে। সৃষ্টি করে গভীর ঐক্যবোধ। "আমরা" বোধ "তারা" বোধ নয়। একতা, বিভেদ নয়। এভাবে পুরো জনশক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়।

সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক জীবনের ঝুঁকি নেয়। কমান্ডারের নির্দেশ নিয়ে কোন সৈনিক ব্যয় এবং সুবিধা বিশ্লেষণ করে না যে, শত্রুর পোস্ট দখল করা এবং একটি মেডেল পাবার চান্স আমার কতটুকু এবং পাশাপাশি কতটুকু চান্স আছে বুলেটবিদ্ধ হয়ে চিরতরে ধরাশায়ী হবার। সৈনিক তার জীবন বাজী রাখে। এটাই মটিভেশন। সেনাবাহিনীতে এই মটিভেশন তৈরিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমতঃ মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতার ধারণা। দ্বিতীয়তঃ দেশপ্রেমের প্রতিদান। তৃতীয়তঃ একই ইউনিফর্ম। চতুর্থতঃ অফিসার-জওয়ান সবাই একই সঙ্গে প্রচুর শারীরিক প্রশিক্ষণ নেয়া, কুচকাওয়াজ। পঞ্চমতঃ শান্তির সময়ে অফিসার-জওয়ান

www.pathagar.com

একসাথে দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণ। এভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে স্বকীয়তাবোধ হয়ে ওঠে জীবন উৎসর্গকারী মটিভেশন। জাপানের শিল্প কারখানায় মটিভেশনের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই একরকম ইউনিফর্ম পরিধান করে, রং, কাপড়ের মান এক ও অভিন্ন। ফলে দৃষ্টিগত অভিন্নতা সৃষ্টি হয়। সবার মাঝে স্বকীয়তাবোধ তৈরি হয়। শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, কোন দেশে এই স্বকীয়তাবোধের অভাব হলে, "আমরা" ধারণার পরিবর্তে "তারা"-র ধারণা বিকশিত হলে সে দেশ, সে জাতির দুর্ভাগ্য অনিবার্য।

খ. গুরুত্ববোধ ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের যেখানে প্রত্যেকে ক্ষমতাহীন এবং ক্ষমতাহীনতার ভাবটা বিরাজমান সেখানে প্রেরণা বা অনুপ্রেরণা জাতীয় কিছু আশা করা বৃথা। যেখানে মানুষ উপলব্ধি করে তাদের ক্ষমতা রয়েছে, তারা কিছু করতে পারে, তারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। কিছু করতে পারার অবকাশ যে প্রতিষ্ঠানের অধঃস্তনদের মধ্যে রয়েছে তা অবশ্যই কর্তৃপক্ষের গুরুত্ববোধের পরিবেশ তৈরির ফলাফল।

কেসস্টাডি ঃ ১

একটি বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "তোমার চোখে কোন কিছু খারাপ ঘটে যাচ্ছে দেখলে কি করবে? উত্তরে সে বললো, "আমার বস এর কাছে গিয়ে বলবো।" তারপর তাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হল, "ধরো যদি তোমার বস না শোনেন? তাহলে আমি তার বস এর কাছে যাব।" সোজা উত্তর শ্রমিকটির। তাকে আরো প্রশ্ন করা হলো, 'যদি তিনিও না শোনেন? 'তাহলে তো আমাকে তার উপরওয়ালার কাছে যেতে হবে। যদি তিনিও শুনতে না চান তোমার কথা? ধরো এই বসদের মধ্যে কেউই তোমার কথা শুনছেন না, তাহলে? এভাবে প্রশ্ন করার পর শ্রমিকটির সর্বশেষ জবাব দিল "আমি চেয়ারম্যান এর কাছে যাবো, তিনি শুনবেন।" প্রত্যয়দীপ্ত জবাব শ্রমিকটির।

এই যে পরম আস্থা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকেই সূচিত হয় ক্ষমতাবোধের, যা গুরুত্ববোধেরই ফলাফল। যেখানেই মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতাবোধ কিংবা উপলব্ধি জাগে, বুঝা যাবে সেখানেই তারা উদ্দীপিত এবং লক্ষ্যপানে তারাই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেয়।

কেসস্টাডি ঃ ২

একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন চৌকস কর্মকর্তাকে ডেকে তার বস একান্তে নিয়ে বললেন, 'এ কাজটা আমি অন্য কাউকে দিতে চাই না। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে দিনে চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করতে হলেও তা সম্পন্ন করবে।' তারপর সফলভাবেই সে কর্মকর্তা তার কাজটি সম্পাদন করেছিলেন।

এ শুধুই গুরুত্ববোধের ফলাফল। তাই গুরুত্ববোধ একটি উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী উপাদান। যা কখনই শাস্তির ভয় বা অর্থের প্রলোভন দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গুরুত্ববোধের যথেষ্ট ব্যবহার যেন কারো অহংকে অনর্থক উসকে না দেয়।

www.pathagar.com

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় গুরুত্ববোধের মাধ্যমেই উদ্বুদ্ধ করেছেন। অর্থের প্রলোভন তিনি কখনই দেখাননি। আর আল্লাহর শাস্তির ভয়ই শুধু দেখিয়েছেন। অপছন্দনীয় বিষয়ে প্রশাসনিকভাবে উপেক্ষার নীতিই অনুসরণ করেছেন।

Motivation ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক মটিভেশন ব্যতীত ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলী মুখ থুবড়ে পড়ে। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় ঈমান, তাকওয়া ও তাওবাহ হচ্ছে মটিভেশনের তিন মূলভিত্তি। ইসলামী ব্যবস্থাপনার সফলতা এই তিন ভিত্তিতে মটিভেটেড জনবলের উপর নির্ভর করে।

গ. উন্নয়নবোধ

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল উন্নয়নবোধ বা প্রবৃদ্ধির উপলব্ধি। যখন কোন শ্রমিক বা কর্মী এ উপলব্ধি করে যে 'আমি কিছু শিখছি, আমার কর্মদক্ষতা বাড়ছে" তখন এই উন্নয়নবোধই তাকে একথা শেখায় যে, এই প্রতিষ্ঠান আমার, আমার প্রবৃদ্ধি এখানেই। আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে যেতে হবে। যতক্ষণ তারা মনে করে যে, তারা কিছু শিখছে, ততক্ষণ তারা অনুপ্রাণিত এবং কাজ করতে প্রস্তুত। এর বিপরীত অবস্থা হল, যখনই তারা অনুভব করবে এখানে শেখার কিছুই নেই, শুধু ঘানি টানা, তখন উদ্বুদ্ধহীনতা তাদের পেয়ে বসে।

কেস স্টাডি ঃ ১

অফিসের বস তার সহকর্মীকে বলছেন, "আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে evergreen, যান কাজ করুন। সমস্যায় পড়লে বলবেন।"

এ ধরনের বসের অধীনে কর্মীর অনুভূতি হচ্ছে 'আমার বিকাশের সুযোগ হল।' কর্মী এখানে দারুণ অনুপ্রাণিত।

সাড়ে ছ' কিংবা আট ঘণ্টা শুধু নয়, দশ এমনকি এগার ঘণ্টা কাজ করতেও কর্মী তখন দ্বিধা করে না।

কেসস্টাডি ঃ ২

অফিসের বস তার সহকর্মীকে বলছেন, "এমন কাজ কি আপনি আগে করেছেন? যদি না করে থাকেন তবে অন্য কাউকে বলছি এটা করার জন্য কিংবা আমি নিজেই করবো।" অথবা অফিসের বস তার সহকর্মীকে বলছেন, "যদিও এমন কাজ আপনি আগে করে থাকেন, তবুও আপনি কাজটা আমার কাছ থেকে বুঝে নেবেন, কোনো চিঠি বাইরে পাঠাবেন না, খসড়া আমাকে দেখাবেন, চিঠিটা আমিই পাঠাবো।"

এ ধরনের বসের অধীনে কর্মীর অনুভূতি দাঁড়ায়– "আমি মনে হয় কিছুই শিখিনি দিন দিন আমার পারার ক্ষমতা যেন হ্রাস পাচ্ছে। তখন কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কর্মী। আর সম্ভাব্য সব ধরনের ছুটি নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে - নৈমিত্তিক ছুটি, অর্জিত ছুটি, অর্ধবেতন ছুটি, সীক লীভ ইত্যাদি।

মানুষকে তার উন্নয়ন বা তার বিকাশে সহযোগিতা করা মানে মানুষকে সম্পদে পরিণত করা। ইসলামী ব্যবস্থাপনার মূল কথাই হচ্ছে মানুষকে সম্পদে পরিণত করা।

www.pathagar.com

যে কোন প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল রাখতে মটিভেশন বা উদ্বুদ্ধকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কার্য (Function)। তথ্য প্রযুক্তি ও মিডিয়ার কল্যাণে মানুষ তার অধিকার নিয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক সচেতন এবং সোচ্চার। ফলে অধঃস্তনকে বরখাস্ত করাটা এখন খুব সহজসাধ্য নয়। অনেক সময় এটা তদারককারী কর্মকর্তার জন্য বুমেরাং হয়ে যায়। এমনি এক অবস্থায় ভয়-ভীতি, মটিভেশনে কোন অবদান রাখে না। একইভাবে স্বল্পমেয়াদে অর্থের ব্যবহার কাজ করে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটা বড় ধরনের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ মটিভেশনে চাকুরী হতে বরখাস্তের ভয় [লাঠি] এবং অর্থের প্রভাব [গাজর] বস্তুতঃ খুবই সাময়িক ফলাফল দেয়। দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রকৃত উদ্দীপনার সূত্রই হচ্ছে ঃ ক. **স্বকীয়তাবোধ** বা একাত্মতাবোধ খ. গুরুত্ববোধ এবং গ. বিকাশ বা উন্নয়ন বোধ।

উদ্দীপনার এই সূত্র বস্তুগতে বিদ্যমান যে কোন সূত্রের মতই মানব মনের জগতের জন্য সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী ব্যবস্থাপনার মৌলিক পার্থক্য [Difference Between Conventional Management & Islamic Management]

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা (Conventional Management)

১. লক্ষ্য অর্জনের পথে নৈতিক মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ নয়। Ends Justifies the means এটাই প্রচলিত ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন।
২. মিশন, ভিশন ও কার্যাবলী বাস্তবায়নে নৈতিকতার কোন বাঁধন নেই।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনে অমানবিক উপায় অবলম্বন দোষণীয় নয়।
৪. বস্তুগত লাভালাভই প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।
৫. মানুষকে একটি উৎপাদন বা ব্যবস্থাপনা উপকরণ মাত্র বিবেচনা করা হয়।
৬. সকল আর্থিক লেনদেন সুদভিত্তিক।
৭. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সামাজিক দায়বদ্ধতার [CSR] ধারণা।
৮. সম্পদের সার্বভৌমত্বের ধারণায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কার্যতঃ প্রত্যাখ্যান করা।
৯. নিরংকুশ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের স্বীকৃতি।
১০. যে কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনে অবাধ স্বাধীনতা এবং তার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এখানে মানব কল্যাণ গৌণ বিবেচিত।
১১. সুবিচার নয়, স্বার্থ উদ্ধার।
১২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকীয় বস্তবাদী বিশ্লেষণ।
১৩. সাংগঠনিক (organizational) সংস্কৃতিতে নিরেট বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন।
১৪. ব্যবস্থাপনায় নারীদের অবাধ ব্যবহার।
১৫. ব্যবস্থাপনা কার্যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে অবজ্ঞা করা।

ইসলামী ব্যবস্থাপনা (Islamic management)

www.pathagar.com

১. লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি, লক্ষ্য অর্জনের মতই গুরুত্বপূর্ণ।
২. মিশন ও ভিশন অর্জনে নৈতিক বাঁধনকে অংগীভূত মনে করা।
৩. কোন যুক্তিতেই লক্ষ্য অর্জনে অমানবিক উপায়কে স্বীকৃতি না দেয়া।
৪. প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনে গৃহীত সিদ্ধান্তে অবিচল অবস্থায় নিরলস কাজ করে যাওয়া।
৫. মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত" বিবেচনায় ব্যবহার করা।
৬. সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন অগ্রাধিকার পাওয়া।
৭. মানুষের কল্যাণে সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
৮. সম্পদ হচ্ছে পরীক্ষা এবং আমানত। সম্পদে আল্লাহরই শুধু সার্বভৌমত্ব এ নীতির প্রতিফলন করা।
৯. বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণ বিবেচনায় নিরংকুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের কোন স্বীকৃতি নেই।
১০. মানব হিতকর নয় এমন পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় অপারগতা।
১১. সবার জন্য সুবিচারের মাধ্যমে বস্তুগত লক্ষ্যার্জন।
১২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকীয় বাস্তবতাকে বস্তবাদী ও ইসলামী নৈতিকতা ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং শুরার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
১৩. সাংগঠনিক সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ বা চেতনার প্রতিফলন।
১৪. ব্যবস্থাপনায় নারীদেরকে সুরক্ষিত, নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে কাজ করার সুযোগ প্রদান ।
১৫. মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতা বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করা।
১৬. চূড়ান্ত প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত করার পর আল্লাহর উপর নির্ভরতা।
১৭. উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা।
১৮. গুরুতর বা সাধারণ যে কাজই হোক তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা।
১৯. অনুমান নয়, যাচাইকৃত তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপকীয় কার্য পরিচালনা করা।
২০. পার্থিব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং অনন্ত জীবনের সফলতা অর্জনই ইসলামী ব্যবস্থাপনার মূল ভিশন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থাপনা [Islamic Management In Different Field]

সামাজিক ক্ষেত্রে

সমাজবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করা মানুষের স্বভাবজাত। মানুষের প্রতি মানুষের মেলামেশার, জানার স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং জীবন ধারনের জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হতেই সামাজিক জীবনের সূচনা। মানবজাতি বা "আল-ইনসানু"-এর মূলধাতু "ইন্‌সুন" মানে মনের আকর্ষণ, ঝোঁক প্রবণতা, ভালবাসা, মেলামেশা। মানুষের সৃষ্টির মূলেই রয়েছে অন্যের প্রতি আর্কষণ, ভালবাসা আর মেলামেশা। সামাজিক জীবন গড়ার এ হচ্ছে মূল ভিত্তি। সমাজের মানুষগুলোর পারস্পরিক

www.pathagar.com

সম্পর্কগুলো যেন সুন্দর হয়, সুখময় হয়, কল্যাণময় হয়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এরই লক্ষ্যে আল্লাহতাআলা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালবাসা ও দয়া। আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[৫৭] মানুষের সমাজকে লক্ষ্য করেই কুরআনের বিধান নাযিল হয়েছে। যেসব আয়াতে ব্যক্তি গঠন ও ব্যক্তি সংশোধন বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে সেগুলোও মূলতঃ সমাজের উপকারার্থে। সালাত, যাকাত, হজ্জসহ যাবতীয় মৌলিক ইবাদাত যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য সমাজ জীবনই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। ঈমান গ্রহণ করার অর্থ দাঁড়ায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নেতৃত্ব মেনে নেয়া এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে অঙ্গীকার করা। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন সালাত জামায়াতের সাথেই আদায় করতে হয়। সাওম বা রমাদানের রোযারও রয়েছে এক সামাজিক রূপ। সমাজ থেকে মিথ্যা কথা ও কাজকে বর্জন করার একমাসব্যাপী ঈমানদারদের প্রশিক্ষণ। যাকাত হচ্ছে সমাজের ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে এক অনন্য ব্যবস্থা। আর হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা একার কাজ নয়। আর আল্লাহ হজ্জের জন্য সামর্থ্যবান সকলকেই একযোগে আহবান করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের মৌলিক সকল ইবাদাতেরই রয়েছে সামাজিক রূপ।

সামাজিক জীবনে ইসলামী ব্যবস্থাপনার মূলনীতি (Principles of Islamic Management of Social Life)

১। ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই

আল্লাহ বলেন, "আর বৈরাগ্যবাদ তো তাদেরই আবিষ্কৃত, আমি তো তাদের এ বিধান দেইনি"।[৫৮]

সামাজিকভাবে মানুষের পূতঃপবিত্র জীবন যাপনের পথ ইসলামে রয়েছে। পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনের প্রয়োজন ইসলামে নেই।

২। ঐক্যবদ্ধ থাকা

আল্লাহ বলেন, "তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[৫৯] সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে থাকা এবং বিচ্ছিন্নতার সকল উস্কানীকে এড়িয়ে চলার দীক্ষাই ইসলাম মানুষকে দিয়েছে।

৩। মানব জাতির প্রতি দায়িত্ব পালন

আল্লাহ বলেন, "তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে আর বিরত রাখবে মন্দ কাজ থেকে।"[৬০] জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণের জন্যই মুসলিম জাতির উত্থান। আন্ত

---

৫৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আর রূম, ৩০ ঃ ২১।
৫৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৭।
৫৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১০২।
৬০. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১১০।

www.pathagar.com

র্জাতিকতার এত উদার ঘোষণা ও দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত ইসলামই মানব জাতির কাছে সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেছে।

৪। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো

দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইয়াতীম ও মিসকীনদের সহায়তায় উৎসাহ দেয় না তাদেরকে দীনের অস্বীকারকারীরূপে চিহ্নিত করেছেন। প্রচলিত ব্যবস্থাপনায়, ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বা কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) হিসেবে যা বিবেচিত, ইসলামে তা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই প্রত্যেক মানুষের মৌলিক দায়িত্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাকে এড়িয়ে গেলে ইসলামকে অস্বীকার করার শামিল গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তুমি কি এমন লোককে দেখেছ, যে দীনকে অস্বীকার করে? সেতো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকীনদের খাবার দানে মানুষকে উৎসাহিত করে না।"[৬১]

৫। সহযোগিতার হাত বাড়ানো

আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই।"[৬২] নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তুমি তোমার মু'মিন ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালিম হোক অথবা হোক মাযলূম।"[৬৩] উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম যালিমকে সাহায্য করার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যালিমকে যুল্‌ম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তার কিয়ামাতের দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।"[৬৪]

৬। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো

সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহতাআলা। আল্লাহ বলেন ঃ "নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"[৬৫] আল্লাহ সকল প্রকারের ও সকল পর্যায়ের প্রতিবেশীর সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া ঈমানের পরিপন্থী কাজ।

---

৬১. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা মাউন, ১০৭ ঃ ১-৩।
৬২. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১০।
৬৩. সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ.৪২২।
৬৪. সহীহ মুসলিম, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ.৩২।
৬৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আন্ নিসা, ০৪ ঃ ৩৬।

www.pathagar.com

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[৬৬] তিনি আরো বলেন, "ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে, তৃপ্তি সহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়।"[৬৭]

প্রতিবেশী যে কোন ধর্মের, যে কোন বর্ণের এবং যে কোন আদর্শের অনুসারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানো এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করার প্রতি ইসলাম প্রত্যেক মু'মিনকে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামেরই শিক্ষা। সকল প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ ঈমানেরই দাবী।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। প্রশ্ন করা হল; হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? জবাবে তিনি বলেন ঃ যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।"[৬৮]

৭। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সব ধরনের টিজিং ও হয়রানি থেকে তাদের মুক্ত রাখা নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। আল্লাহ বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন-যাপন করবে।"[৬৯] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম তারা, যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।"[৭০]

৮। অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান

ইসলামী রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বা বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানি করে অথবা তার কোন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, কিয়ামাতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে পক্ষ অবলম্বন করবো।"[৭১] এমনকি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে যদি তার মুসলিম নাগরিকদের উপর অত্যাচার করে, অবিচার করে তার প্রতিশোধ স্বরূপ কোন ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকের উপর কোন প্রতিশোধ নিতে পারবে না। কোনভাবেই অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

৯। আল্লাহ তা'আলার নিকট চাওয়া

সর্বোপরি সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট দু'আ চাইতে হবে। কারণ তিনিই প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য সৃষ্টি

---

৬৬. সূত্রঃ মিশকাত।
৬৭. বায়হাকী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ.৪২৪।
৬৮. সূত্রঃ মিশকাত।
৬৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আন-নিসা, ০৪ ঃ ১৯।
৭০. জামে আত-তিরমিযী, সূত্রঃ মিশকাত, পৃ.২৮১।
৭১. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৮২।

www.pathagar.com

করেন। আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তাদের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৭২]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি হবার কারণে এর রয়েছে ব্যাপক পরিধি। অর্থনীতি এর একটি অন্যতম দিক। সুষম সম্পদ বন্টনকে কেন্দ্র করে বিশ্বে নানা অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আর এ লক্ষ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতায় সর্বোচ্চ সম্মানের নিদর্শন হিসেবে নোবেল প্রাইজও দেয়া হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে, পাশ্চাত্য জগত কিংবা সমাজতান্ত্রিক জগত কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুষম সম্পদ বন্টনে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এই অক্ষমতার পেছনে যে কারণ রয়েছে, তা হলো, অর্থনৈতিক তত্ত্ব - শুধু একটি তত্ত্বই। এই তত্ত্বের পেছনে সামাজিক বা রাজনৈতিক মোটিভেশন থাকলেও তা পক্ষপাতদুষ্ট। সেই সাথে তত্ত্ব প্রয়োগের কোন সর্বজনীন প্রয়োগবিধি নেই। মানবীয় সব তত্ত্বেরই এ এক অনিবার্য অক্ষমতা। ফলে পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক উভয় বিশ্বেই অর্থনৈতিক তত্ত্বের সফলতা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়।

অন্যদিকে ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে অর্থনীতির কিছু মূলনীতি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সম্পদের সুষম বন্টনে সুস্পষ্ট খাতসহ প্রয়োগ বিধিও বলা আছে। সেই সাথে আছে উচ্চমাত্রার মটিভেশন। এতে করে ইসলামের অর্থনীতির বাস্তবায়ন অন্যান্য যে কোন তত্ত্বের চেয়ে সহজ এবং মানবিক। তাই ইসলামী অর্থনীতি কার্যকর হবার পর জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই উন্নত হয়েছিল যে যাকাত গ্রহণের মত মানুষের অভাব পড়ে গিয়েছিল।

অর্থনীতির ইসলামী ব্যবস্থাপনা মূলনীতি (Principles of Islamic Management of Economy)

১. সম্পদ ও ক্ষমতায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য।
২. রক্ত, বর্ণ, গোত্র, বংশ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধের মূল্যবোধ চর্চা।
৩. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কর্মসংস্থানের অধিকার সংরক্ষণ।
৪. স্বনির্ভরতা অর্জনের চেতনায় ঐক্যবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা।
৫. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করণ।
৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ।
৭. যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন।
৮. আয়ের সুষম বন্টন।
৯. আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের নীতি অনুসরণ।
১০. নিষিদ্ধ দ্রব্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অবৈধতা।

---

৭২. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা আল আনফাল, ০৮ ঃ ৬৩।

www.pathagar.com

১১. সুদ বিবর্জিত ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।
১২. আল কারদুল হাসান বা বিশ্বস্ত ঋণ বা আল্লাহকে ঋণ প্রদান। [ক্ষুদ্র ঋণ বা সুদ ভিত্তিক ঋণ নয়।]
১৩. শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ।
১৪. মজুদদারী ও কালোবাজারীর অবৈধতা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থাপনা, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যকে ঘিরে আবর্তিত। বিষয়টি কুরআনের সূরা তাওবা, সূরা ফাতহ ও সূরা সফে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহতাআলা উল্লেখ করেছেন। সূরা ফাতহ্-এ আল্লাহ্ বলছেন, "তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য জীবন বিধান সহ পাঠিয়েছেন, আর সব জীবন বিধানের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৭৩] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এই মিশন ও ভিশন দিয়ে রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনিত করেছিলেন।

বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে গোটা বিশ্বেই ইসলামের আদর্শিক প্রভাব স্বল্পমাত্রাতে হলেও সক্রিয় রয়েছে। ইসলামের আদর্শিক সৌন্দর্য এখনও বহু নর-নারীকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। সার্বিক বিবেচনায় অন্যান্য সকল জীবন বিধানের উপর ইসলামী জীবন বিধানকে বিজয়ী করার রাজনৈতিক মিশন ও ভিশন ছাড়া মুসলিমদের বিকল্প কিছু করার অবকাশ নেই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে মিশন ও ভিশনকে অর্জন করতে ব্যবস্থাপনাকেও ইসলামের আঙ্গিকে সাজাতে হবে। সার্বিক অর্থনৈতিক সফলতা, রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন হলেই কেবল সম্ভব হয়। তাই রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জন, ইসলামী ব্যবস্থাপনায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে ইসলামী ব্যবস্থাপনার মূলনীতি (Principles of Islamic Management of Political Aim)

১. কুরআন, সুন্নাহ এবং সোনালী যুগের ইসলামী রাষ্ট্রের ঘটনা প্রবাহের আলোকে চলমান ঘটনা প্রবাহের হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত পুংখানুপুংখ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।
২. ক্ষুদ্র কিংবা বড়ো পরিসরে আশ শুরার [ক্ষুদ্র কিংবা বড়ো তা নির্ধারণ করবেন যিনি পরামর্শ নিতে চান তিনি] মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অবিচলতা।
৪. শুরার অনুমোদিত পন্থায় স্বচ্ছতার সাথে নেতৃত্ব নির্বাচন।
৫. যে কোন Conflict ধরনের বা বিরোধ মীমাংসায় কুরআনের সুবিচার সংক্রান্ত নির্দেশকে বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করে সুবিচার নিশ্চিত করা।

---

৭৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, কুরআনুল করীম, সূরা ফাতাহ, ৪৮ ঃ ২৮।

www.pathagar.com

৬. দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে বিদ্যমান আইনসমূহের পর্যালোচনা ও শারীয়া সম্মত আইন প্রণয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সেল প্রতিষ্ঠা করা এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-র আওতায় আনা।

৭. প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের দাওয়াতী কার্যক্রমকে সর্বস্তরে জনপ্রিয় করে তোলা, শুধু অধঃস্তন দায়িত্বশীলদের জন্য নির্দিষ্ট না করা, গণমানুষের মধ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা, আখিরাতমুখী জীবন গড়া এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো।

৮. যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির সফলতার বাস্তবতা কার্যকরভাবে তুলে ধরতে যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জনশক্তির মাঝে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলা এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক তৎপরতা হয়েছে বহুমুখী। এর প্রকারভেদ লক্ষাধিক। এসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই অর্থলগ্নি বা আর্থিক ঋণ নির্ভর। বর্তমান অর্থনৈতিক তৎপরতার এ প্রেক্ষিতে যাকাতের নীতি প্রয়োগের বাস্তবতা নিরূপণ করা একটি গবেষণাপ্রসূত ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ। রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে যাকাত ভিত্তিক এ অর্থনৈতিক তৎপরতা চালানোর কোন বিকল্প নেই।

৯. শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাক্কালে নয়, নিয়মিতভাবে মা-শিশু, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ, মাঠে-ময়দানে, রাস্তা-ঘাটে, গরীব কর্মচারীদের মাঝে সমাজ সেবামূলক কাজ পরিচালনা করা। এসব সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম গণভিত্তি রচনায় সফল অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

১০. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইসলামের পক্ষে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মতামত প্রতিফলন করা এবং সকল ধরনের অননুমোদিত হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করা।

১১. গণমানুষের সমস্যা শুনতে সময় দেয়া।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যবস্থাপনার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা [Problems of Exploring Islamic Mgt. In Bangladesh]

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, HSBC সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু ব্যাংক ইসলামী Mode-এ ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করছেন। কিন্তু তাতে ইসলামী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসার যে প্রসার ঘটেছে বাংলাদেশ, ইসলামী ব্যবস্থাপনার প্রসার সেভাবে হয়নি। এর প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সঠিকভাবে চি⎕ত করার উপরই নির্ভর করে তা অতিক্রমের উপায় উদ্ভাবনের। প্রতিবন্ধকতাগুলো এমন ঃ

১. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রশাসনে 'ইসলাম অগ্রাধিকার' এই নীতির অভাব।

২. ইসলামী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা কর্মের অভাব।

www.pathagar.com

৩. প্রচলিত ব্যবস্থাপনা বিশারদদের 'ইসলামী ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে অনুৎসাহ ও অনীহা বা আগ্রহের অভাব।
৪. ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা ভিত্তিক প্রকাশনার অভাব।
৫. শিক্ষা কারিকুলামে এ বিষয়ে কোন কোর্স না থাকা।
৬. ইসলামী ব্যবস্থাপনার কোন মডেল প্রতিষ্ঠান না থাকা।
৭. প্রচলিত ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী ব্যবস্থাপনার মাঝে ঐক্যমত্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করার অভাব।
৮. ইসলামী ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনরূপ ও মানবিক আবেদন উপস্থাপনে পারদর্শিতার অভাব।
৯. মুসলিম সমাজে 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' এই চেতনার অভাব।
১০. ইসলামী ব্যবস্থাপনা ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব।
১১. ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব।
১২. ইসলামী ব্যবস্থাপনা ধারণাকে এগিয়ে নিতে সঠিক নেতৃত্বের অভাব।
১৩. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।
১৪. ইসলামী ব্যবস্থাপনায় পেশাদারী দক্ষতার অভাব।
১৫. যোগাযোগ ও তথ্য বিষয়ক সমস্যা।
১৬. ব্যবস্থাপনা, মালিকানা থেকে পৃথক। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন উৎপাদন বা ব্যবসায় সম্প্রসারণের কথা কল্পনাও করা যায় না। ব্যবস্থাপনায় স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগের ফলে সংগঠন ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় নেমে আসে এবং কারবারগুলো অদক্ষ ও অযোগ্য লোকে ভরে যায়।
১৭. জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনার অভাব।
১৮. মেধা পাচার।
১৯. সমন্বয় সমস্যা।
২০. ন্যায্য পারিশ্রমিকের অভাব।

বাংলাদেশ ইসলামী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের দূরীকরণের উপায় [Remedies]

১. ইসলামী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশাসনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।
২. ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কর্মে স্পন্সর করা।
৩. প্রচলিত ব্যবস্থাপনার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশারদের ইসলামী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রণ জানানো।
৪. ব্যাপকভাবে ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কর্ম প্রকাশে আগ্রহী উদ্যোক্তার অনুসন্ধান।
৫. দেশের শিক্ষা-কারিকুলামে ইসলামী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পর্যাপ্ত কোর্স চালু করা।

www.pathagar.com

৬. ইসলামী ব্যাংকগুলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যবস্থাপনার মডেল হিসেবে দাঁড় করানো।
৭. প্রচলিত ব্যবস্থাপনার নৈতিকতা নিরপেক্ষ আধুনিক পদ্ধতিসমূহ ইসলামী ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ করা।
৮. "ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামী ব্যবস্থাপনার সুফল সর্বজনীন" - এ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানো।
৯. ইজম ও বস্তুবাদী জীবনের নানামুখী চেতনা নয়, 'ইসলাম একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান'– এ চেতনাতেই ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা।
১০. দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১১. জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা চালু করা।
১২. ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং মেধা পাচার রোধ করা।
১৩. সুষ্ঠু সমন্বয় নিশ্চিত করা। অবশ্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুষ্ঠু সমন্বয়ের পূর্বশর্ত।
১৪. ব্যবস্থাপনার অধিকার বা হক হলো দক্ষ ব্যবস্থাপক পাবার আর স্বজনের প্রতি প্রীতি বা হক হলো ব্যক্তিগত আর্থিক অনুগ্রহ পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার।
১৫. দ্রুত ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল ব্যবহার।

উপসংহার [Conclusion]

কুরআনের পথদিশায় জীবনের রয়েছে দ্বি-মাত্রিক ধারণা : ইহজাগতিক ও পারলৌকিক জীবন। কুরআন, জীবনের এই দ্বি-মাত্রিক ধারণাকে গোটা মানব জাতির ক্ষেত্রে অবিভাজ্য মনে করে এবং ধারণাগত বা তত্ত্বগতভাবে নয় প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে মূল্যায়ন করে। তাই ইসলামী ব্যবস্থাপনায় মানব জাতির অবিভাজ্য জীবনের সফলতা খুঁজতে এমন একজন মানুষের প্রয়োজন ছিলো যিনি ইহজাগতিক ও পারলৌকিক এই উভয় জীবনে প্রায়োগিকভাবে সফল ব্যবস্থাপক একজন মানুষ হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হবেন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), প্রচলিত ব্যবস্থাপনার ভাষায় তথাকথিত কোন ব্যবস্থাপনা Expert ছিলেন না, তিনি ছিলেন "The only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels".[৭৪] ভারতের অবিসংবাদিত নেতা MK Gandhi-র দৃষ্টিতে অবিভাজ্য জীবনের সফলতার লক্ষ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা, শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, গোটা মানব জাতির সম্পদ– "I have read sir Abdullah Suhrawardy's collections of the saying of the Prophet with much interest and

---

৭৪. Michael H. Hart, The 100, A Ranking of The Most Influential Persons In History, pp-33.

www.pathagar.com

profit. They are among the treasures of mankind, not merely Muslims"[৭৫] পারলৌকিক ও ইহজাগতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমন একজন সফল মানুষের অনুসরণে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক, এই দ্বি-মাত্রিক জীবনের ব্যবস্থাপনায় সফলতা আসবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন করা জ্ঞানপাপীর অথবা নিরেট মূর্খতার পরিচায়ক।

Diversified Workforce-এর জন্য Ensuring justice for all, Ensuring Human Rights [সকলের জন্য ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা] এবং Total Quality Management [TQM]-এর বাস্তব অনুশীলনে ইসলামী ব্যবস্থাপনার রয়েছে সমুজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য, রয়েছে অবিভাজ্য জীবনের সফলতার বৈজ্ঞানিক দিক-নির্দেশনা, যা আধুনিক ব্যবস্থাপনারও অপরিহার্য অংগ। Global Village-এর আজকের বিশ্বেও একইভাবে ইসলামী ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিকসহ জীবনের সকল দিকে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা ধারণা ও নীতির বর্তমান বাস্তবতায় "ইসলামী ব্যবস্থাপনা"– ধারণাটি স্থানীয় ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে অনিবার্য সফলতার এক অব্যর্থ অবলম্বন। তবে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের দ্বি-মাত্রিক ধারণাকে স্বীকার করেই এ সফলতা অর্জন সম্ভব হবে। ■

---

৭৫. Syed Ashraf Ali, Islam : what others say, pp-96।

লেখক-পরিচিতি : জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির-বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক এবং ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষক ও পর্যবেক্ষক), দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ লি:), গাজীপুর।

লেখা-পরিচিতি : [প্রবন্ধটি অগাস্ট ২৮, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।]

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাঃ স্বরূপ ও সমাধানের উপায়

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

ভূমিকা

সম্পদ সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম। আঞ্চলিকভাবে ভূ-রাজনৈতিক (Geo-Political), ভূ-কৌশলগত (Geo-Strategic) দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক এলাকা। ভারত মহাসাগরের প্রবেশ পথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভৌগলিক অবস্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানচিত্রের উপর চোখ বুলালে বুঝা যায় যে, ভূ-খণ্ডটি নিছক একটি ভৌগলিক অঞ্চলই নয়, উত্তরে ভারতের অংশ বিশেষসহ চীন, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পূর্বে ভারতের বিতর্কিত ও বিদ্রোহী এলাকা এবং পূর্বে মায়ানমার- এসব কিছু মিলিয়ে তা একটি স্ট্রাটেজিক ইউনিটের রূপ ধারণ করে। গত কয়েক দশক থেকে বাংলাদেশেরই এই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত কিছু লোক বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী তৎপরতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে লিপ্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনুবর্তী পশ্চাদভূমি হিসেবে এবং চীন, ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান (ASEAN) ভুক্ত অর্থনৈতিক শক্তির প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাবভূমি (Vicinal Land) হিসেবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূ-ভাগটি বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও গুরুত্ববহন করে এবং এটি বিশেষ তাৎপর্যময় স্থানে অবস্থিত। বাংলাদেশের এই বৃহৎ পার্বত্য অঞ্চলটি সব দিক থেকে ভূমি পরিবেষ্টিত। অঞ্চলটির সবচেয়ে নিকটতম সমুদ্র উপকূল দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে মাত্র ১২ কি. মি. পশ্চিমে কক্সবাজার জিলার উখিয়ার কাছে অবস্থিত। পার্বত্য রাঙ্গামাটির পশ্চিম প্রান্তের কাউখালি থেকে মাত্র ৩০ কি.মি. দূরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জিলার সংকীর্ণ একফালি ভূ-ভাগ, যা কোন স্থানেই পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ কি.মি. এর চাইতে বেশি প্রশস্ত নয়, তা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রেখেছে। চট্টগ্রামের বন্দর যা কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে তার নাব্যতা এবং সমস্ত চট্টগ্রামের বন্দর, কল-কারখানা এবং নগরীসহ সমস্ত জিলা, পাশ্ববর্তী কক্সবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জিলা সমূহের বিদ্যুতের সরবরাহ এই কর্ণফুলীর পানির উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নৌপরিবহন এবং কৃষির জলসেচ ব্যবস্থার জন্য কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জিলাদ্বয় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রবাহিত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা ইত্যাদি নদীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এইভাবে দেখা যায় যে, সমস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জিলাদ্বয়ের প্রায় দেড়কোটি মানুষের জীবন জীবিকা তথা অস্তিত্ব এবং বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের অস্তিত্ব ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অন্যতম উৎস পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে জড়িত। এ সব দিক বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া দুর্গম এবং পর্বতঘেরা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান চট্টগ্রাম বন্দর, মহানগর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জিলার ভূ-ভাগকে ভূ-রাজনৈতিক এবং অবস্থানগত দুর্ভেদ্যতা দান করেছে। অন্যকথায় আল্লাহ না করুন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতায় চট্টগ্রাম অঞ্চল কৌশলগতভাবে (Strategically) ঐ এলাকাকে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত দুর্বল ও প্রতিকূল বৈশিষ্ট্য দান করবে।[১] বস্তুত এ জন্যই আধিপত্যবাদ, নব্য উপনিবেশবাদের এজেন্টরা বাংলাদেশের মানচিত্রের দশভাগের উপর লোমশ-নখর কালো থাবা বিস্তার করেছে। ড. এমাজউদদীন আহমদ লিখেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে যে নিষ্ঠুর খেলা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।[২]

---

১. ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক, অতন্দ্র জনতা বাংলাদেশ, ধানমন্ডি, ঢাকা, ১৯ অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ.১১০-১১১।

২. ড. এমাজউদদীন আহমদ, জুমল্যান্ডের পরিণতি, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুদুর অতীত থেকেই সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সে যুগে চট্টগ্রাম ছিলো বাংলার হরিকল জনপদ নিয়ে গঠিত। এটি ছিলো বরাবর বাংলাদেশের কন্টিগিউয়াস টেরিটোরি এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে এর সুস্পষ্ট, সুসংবদ্ধ গঠন ও অবয়ব প্রদানকারী অঞ্চল।[৩] বাংলাদেশের এক-দশমাংশ সার্বভৌম ভৌগলিক এলাকায় বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে হালকা জনসংখ্যা অধ্যুষিত অথচ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চল। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম পাহাড়ী ও বনাবৃত অঞ্চল। এখন থেকে ২০ কোটি বছর পূর্বে এ অঞ্চলে বিদ্যমান টেথিস সাগরের (Sea of Tethis) তলদেশ থেকে হিমালয় পর্বতমালার উত্থানের সময় শুরু হওয়া গিরিজনি আন্দোলনের (Mountain Building Tectonic Movement) ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সারি সারি পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে।[৪] সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছোট ছোট টিলা, পাহাড়, উপত্যকা, নদী, হ্রদ, নালা-ঝর্ণায় পরিপূর্ণ। উঁচু-নীচু পাহাড়-পর্বত, পার্বত্য নদ-নদী, উর্বর উপত্যকা আর দুর্গম ঘন চিরহরিৎ বনভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামকে দান করেছে এক অনন্য নিসর্গ, আরণ্যক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি আর বৈচিত্রময় ভূগোল। প্রাণ বৈচিত্র, বনজ, কৃষি সম্পদের পাশাপাশি প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানী তেল, ইউরেনিয়াম, মহামূল্যবান প্লাটিনামসহ বিভিন্ন খনিজ ধাতু এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ এ অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।[৫] পারমাণবিক চুল্লির অপরিহার্য জ্বালানী ইউরেনিয়ামের মওজুদ থাকার এক সম্ভাবনাময় এলাকা হলো এ তিনটি পার্বত্য জিলা। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ অতি মূল্যবান। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে প্রায় ২১° ২৫′ থেকে ২৩° ৪০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১° ৫৫′ থেকে ৯২° ৪৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশ জুড়ে পর্বত সংকুল পার্বত্য চট্টগ্রাম বা Chittagong Hill Tracts এর অবস্থান।[৬]

---

৩. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী ও ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব, পার্বত্য চট্টগ্রাম : ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব, লেখকদ্বয় কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ.-৫।

৪. জাফর আহমদ নূর, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশ্বমোড়লদের হেড লাইটের আলো পড়েছে (প্রবন্ধ), পৃ-১।

৫. খাগড়াছড়ি জেলার সামুতং-এ ০.১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ইতোমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে। কাপ্তাই ও আলীকদমে কঠিন শিলা পাওয়া গেছে। রামুতে পাওয়া গেছে গ্যাস, সেই সাথে আলিকদমে পেট্রোলিয়াম ও লামায় পাওয়া গেছে কয়লা। মানিকছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে রয়েছে পাথরের বিরাট মওজুদ। দেখুন ড. তারেক শামসুর রহমান, পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন পথে? আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

৬. সুগত চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, ট্রাইবাল অফিসার্স কলোনী, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৩, পৃ.১৫।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের তিনটি প্রশাসনিক জিলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন[৭] এর মোট ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার বা ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম হতে পৃথক করে জিলার মর্যাদা প্রদান কালে এর আয়তন ছিল ৬,৭৯৬ বর্গমাইল। ১৯০১ সালে এর আয়তন হ্রাস পেয়ে ৫,১৩৮ বর্গমাইলে দাঁড়ায়। সবশেষে ১৯৪৭ সালে ৫০৯৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব বাংলায় তথা পাকিস্তানে যোগ দেয়। অর্থাৎ ৮৭ বছরে (১৮৬০-১৯৪৭) ১৭০৩ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়।[৮] পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল হলেও এর প্রাকৃতিক তথা বাস্তব আয়তন অনেক বেশি। পার্বত্যভূমি আর সমতল ভূমির আয়তন প্রাকৃতিক কারণে এক ধরনের নয়। যেমন পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির উপর অবস্থিত একটি পাহাড় খণ্ডের পাদদেশ, ঢাল, মধ্যবর্তী ভাঁজ, উপরিভাগ ও তলদেশের চড়া বা জমিসহ জ্যামিতিক পরিমাপ করলে প্রতি বর্গমাইল এলাকা বেড়ে সোয়া দুই বর্গমাইলে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব আয়তন হবে কমপক্ষে ১১,৪৫৯.২৫ বর্গমাইল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরূপের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করেই একে সাধারণ সমভূমির মতো ৫০৯৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বলে গণ্য করা হয়, যা দেশের মোট আয়তনের এক-দশমাংশ।[৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জিলা পর পর অবস্থিত। উত্তরে খাগড়ছড়ি জিলা, মাঝখানে রাঙ্গামাটি জিলা ও দক্ষিণে বান্দরবান জিলা। এই তিনটি প্রশাসনিক জিলায় উপজিলা/থানা আছে ২৫টি। রাঙ্গামাটিতে ১০টি : রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, নানিয়ারচড়, জুরাইছড়ি, বিলাইছড়ি, কাওখালি, কাপ্তাই, রাজস্থলি। খাগড়াছড়িতে ৮টি : খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, দীঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহলছড়ি। বান্দরবানে ৭টি : বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম, নাইক্ষংছড়ি। আয়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি লেবানন, সাইপ্রাস, ব্রুনাই, কাতার, সিঙ্গাপুর, মরিশাস কিংবা লুক্সেমবার্গের[১০] চেয়ে বড়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরূপ সমতল ভূমি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাহাড়পুঞ্জের মধ্যস্থলে

---

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য বান্দরবান ১৯৮৮ সালে তিনটি জেলার মর্যাদায় বিভক্ত হয়। দ্রষ্টব্য : জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বাংলাদেশ গেজেট, ২রা মার্চ, ১৯৮৯।

৮. জয়নাল আবেদিন, পার্বত্য চট্টগ্রামঃ স্বরূপ সন্ধান, বুক মিউজিয়াম পরিবেশিত, ২৬ মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ১৭।

৯. জয়নাল আবেদীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

১০. লেবানন ৪০৩৪ বর্গমাইল (১৪৪৩২ বর্গ কি.মি.), সাইপ্রাস ৩৫৭১ বর্গমাইল (৯২৫০ বর্গ কি.মি), ব্রুনাই ২২২৫ বর্গমাইল (৫৭৭০ বর্গ কি.মি), কাতার ৪৪০২ বর্গমাইল (১১৪০০ কি.মি) সিঙ্গাপুর ২৪০ বর্গমাইল (৬২২ বর্গ কি.মি), মরিশাস ৭২০ বর্গমাইল (১৮৬৫ বর্গ কি.মি), লুক্সেমবার্গ ৯৯৮ বর্গমাইল (২৫৮৬ বর্গ কি.মি) আয়তন বিশিষ্ট।

www.pathagar.com

রয়েছে উপত্যকা যা অনেকটা সমতল, বনভূমিময় এবং ঝরণাধারা, যেগুলোকে বলা হয় 'ছড়া' বা 'ছড়ি'। এ অঞ্চলের পাহাড় শ্রেণী উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এগুলোকে দশটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয় : সুবলং, মাইনি, কাসালং, সাজেক, হরিং, বরকল, রাইনখিয়াং, চিম্বুক, মিরিঞ্জা। পাহাড়গুলো সাধারণত ১০০ থেকে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। পর্বতগুলোর উপত্যকা সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এবং উচ্চতা কয়েকশ' ফুট থেকে কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কেওক্রাডং এর উচ্চতা ২৯৬০ ফুট।[১১] সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নিয়ে নতুন বিতর্কের সূচনা হয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। বলা হচ্ছে কেওক্রাডং নয়, তাজিংডংই (সরকার নাম রেখেছেন 'বিজয়') হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ। একটি সূত্র থেকে তাজিংডং এর উচ্চতা ৩১৮৫ ফুট বলে জানা যায়।[১২] পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের উচ্চতা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাহাড় ও অরন্যের রাখি বন্ধনে চির সবুজ পার্বত্য চট্টগ্রাম কেবল বাংলাদেশেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম দৃষ্টি নন্দন স্থান।[১৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও উপত্যকায় বয়ে চলেছে অনেকগুলো পাহাড়ি নদী। প্রধান নদী ৭টি : চেংগি, মাইনি, কাসালং, কর্ণফুলি, রাইনখিয়াং, সাংগু, মাতামুহুরি। হ্রদ ৪টি। প্রধান হ্রদ কাপ্তাই, এটি মানব সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদ, বৃহৎ জলাধার যার আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ৩০০ বর্গমাইল। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলি নদীতে বাঁধ (দৈর্ঘ্য ১৮০০ ফুট, উচ্চতা ১৫৩ ফুট) দেয়ার ফলে এ হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই হ্রদে নানা জাতের প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। বাকি তিনটি প্রাকৃতিক হ্রদ। রাইনখিয়ানকাইন, বোগাকাইন ও নুনছড়ি মাতাই পুখিরী। কর্ণফুলী নদীর উৎস স্থলে রাইনখিয়ানকাইন হ্রদটি অবস্থিত। এই হ্রদের দৈর্ঘ্য এক মাইল। এখান থেকে পানি বের হবার রাস্তা আছে এবং এর পানিতে প্রচুর মাছও জন্মে। ১৮৭৫ সালে লেফটেন্যান্ট জর্জ গর্ডন এই হ্রদটি আবিস্কার করেন। এই হ্রদ পালতাই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণপূর্বে রেমা ক্রিটিং এর পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক হ্রদ গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক হ্রদ হলো বোগাকাইন। এটি বান্দরবান পার্বত্য জিলার অন্তর্গত রুমা থানার পূর্বদিকে শঙ্খ নদীর তীর থেকে ১৬ মাইল অভ্যন্তরে নাইতং মৌজায় এক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক হ্রদের তীরগুলি পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বলে এটিকে মানুষের

---

১১. সার্ভে অব বাংলাদেশের তথ্য, উদ্বৃত মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ. ১৭।

১২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারী ২০০০।

১৩. ড. মাহফুজ পারভেজ, বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তি চুক্তি, সন্দেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃ.৯।

www.pathagar.com

খনন করা দীঘি বলে মনে হয়। হ্রদের তিনদিকে সমতল থেকে ১৫০ ফুট পর্যন্ত স্থান উচুঁ বাঁশঝাড়ে আবৃত পর্বতশৃংগ দ্বারা পরিবেষ্টিত। হ্রদের চতুর্দিকে ১৫০০ ফুট থেকে ২০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ মালভূমি রয়েছে। এই হ্রদের গভীরতা ১২৫ ফুট।

মাতাই পুখিরী হ্রদ। ত্রিপুরা লোকদের ভাষায় এর অর্থ দেবতার পুকুর। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জিলার অন্তর্গত মহালছড়ি থানার সদর দপ্তর থেকে ১২ মাইল উত্তরে আলুটিলা 'নুনছড়ি' নামে একটি ছোট নদীর উৎসস্থলে এই হ্রদটি অবস্থিত। এই হ্রদটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হলেও হ্রদের চতুর্দিকে মালভূমি দ্বারা বেষ্টিত বলে এটাকে সমতল ভূমির মধ্যে অবস্থিত বলে মনে হয়। এই হ্রদের আয়তন প্রায় দুই একর। প্রায় ৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত হলেও এই হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে এর উচ্চতা অনুভব করা যায় না। এই হ্রদের পানিতে প্রচুর মাছ। এর পানি পান করা যায়। হ্রদের চারদিকে ঘনগাছের বন থাকায় এটিকে বেশি আকর্ষণীয় দেখা যায়।

ভৌগলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য রাজ্য ও মায়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের সাথে সংযুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে ও খাগড়াছড়ি জিলার পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড়পুঞ্জ ও মায়ানমারের অংশ, দক্ষিণে মায়ানমার, পশ্চিমে সমতল উপকূলীয় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জিলা অবস্থিত। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৩৬.৮০ কিলোমিটার, মিজোরাম রাজ্যের সাথে ১৭৫.৬৮ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে ২৮৮.০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। সমগ্র এলাকাটি ফেনী, কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং এদের শাখা নদী ও উপনদীর উপত্যকা দ্বারা সুস্পষ্ট চারভাগে বিভক্ত হয়েছে। এসব উপত্যকাগুলো হচ্ছে- চেঙ্গী উপত্যকা, কাসালং উপত্যকা, রাইনখিয়াং উপত্যকা এবং সাঙ্গু উপত্যকা। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত বৃষ্টি-বিধৌত মাঝারি ধরনের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রাম গেরিলা যুদ্ধের জন্য আদর্শস্থানীয়।

বাংলাদেশে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠী বা উপজাতির সংখ্যা ৪৬। [১৪]

---

১৪. বাংলাদেশে কতটি নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে রয়েছে মত পার্থক্য। এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি দলিলপত্র এবং বিভিন্ন গবেষণাপত্রে ভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ১২, কেউ বলেছেন ১৫, আবার কেউ বলেছেন ৪৬। যেমন, মাহমুদ শাহ কোরেশি সম্পাদিত 'ট্রাইবাল কালচার ইন বাংলাদেশ' গ্রন্থে মার্কিন নৃ-বিজ্ঞানী Peter J. Bertocci ১৯৯১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ১২। আবার ১৯৯৪ সালের আদম শুমারী রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ.জি.সামাদ বলেছেন, দেশে ১৫টি নৃ-গোষ্ঠী বাস করছে। মাহমুদ শাহ কোরেশি নিজেই বলেছেন বাংলাদেশে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩১। অন্যদিকে নৃতত্ত্ববিধ সি. মেলোনি বলেছেন, বাংলাদেশে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৬। তিনি অবশ্য ভাষাগত দিক থেকে নৃ-গোষ্ঠী গুলোকে

www.pathagar.com

সারণী -১

বাংলাদেশে বসবাসকারী নৃ-গোষ্ঠীর তালিকা। তালিকাটি ১৯৯১ সালের আদমশুমারী রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

*(কেবল ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়)

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ১২টি উপজাতি বাস করে।[১৫] উপজাতিদের সবাই বহিরাগত। এখানে বসবাসকারী উপজাতিদের সম্মিলিত সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র .৪৫% (দশমিক চার পাঁচ শতাংশ)। এরা বিভিন্ন কারণে বিশেষতঃ নিরাপদ আশ্রয় লাভের সন্ধানে তিব্বত, চীন, মায়ানমার এবং ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল থেকে অনধিক ৪০০ বছর আগে বাংলাদেশের ভূখণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে। এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে চাকমারা নবাগত। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা সবাই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ১২টি উপজাতিরই নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে। দুই একটি উপজাতির লেখ্য ভাষা থাকলেও কোন বাস্তব ব্যবহার নেই। এক উপজাতি অন্য উপজাতির ভাষা বুঝে না। এক উপজাতির সদস্য অন্য উপজাতির সাথে কথা বলার সময় বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। প্রতিটি উপজাতি বাংলা ভাষা বুঝে এবং নিজস্ব উপজাতির বাইরে আসলে বাংলা ভাষায় কথা বলে।

আধুনিকায়ন বিশেষতঃ বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের ফলে উপজাতীয়দের সনাতন জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যাযাবর জীবন পরিহার করে এরা স্থায়ী বসতি স্থাপনে অভ্যস্থ হচ্ছে। সভ্য জগতের মানুষের মতোই এরা পরিপাটি পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও এখন আর আগের মতো দিগম্বর তরুণ-তরুণী দেখা যায় না। জুম-নির্ভর জীবিকা বলতে গেলে উঠেই যাচ্ছে। এর বিপরীতে এরা সমতলের মতো আধুনিক কৃষিকাজ আয়ত্ব করেছে। চাকুরী, ব্যবসাসহ সমতলের মানুষের মতোই এরা বিভিন্ন পেশায় আসতে শুরু করেছে। বহু উপজাতীয় এখন

ওই ৪৬ ভাগে ভাগ করেন। দেখুন, গৌতম মন্ডল, অশান্তির বেড়াজালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, নিউজ নেটওয়ার্ক, ধানমন্ডি, ঢাকা, জুলাই ২০০৫, পৃ.৩৩।

১৫. রাঙ্গামাটিতে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা ১১টি (চাকমা, মারমা, তংচংগ্যা, ত্রিপুরা, পাংখো, লুসাই, বোম, খিয়াং, মুরং, চাক, খুমি)। খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাসকারী উজাতির সংখ্যা ৪টি (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল)। বান্দরবন জেলায় বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা ১২টি (মারমা, মুরং, ত্রিপুরা, তংচংগ্যা, বোম, চাকমা, খুমী, খিয়াং, চাক, উসাই, লুসাই, পাংখো)। বিস্ত ারিত দেখুন অশোক কুমার দেওয়ান, চাকমাজাতির ইতিহাস বিচার, দিপীকা দেওয়ান প্রকাশিত, খবংপর্যা, খাগড়াছড়ি, নভেম্বর ১৯৯১; বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, উদয় শংকর দেওয়ান প্রকাশিত, উত্তর কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি, জানুয়ারী ২০০৫; প্রভাংশু ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ইতিহাস, এপ্রিল ২০০৬; আতিকুর রহমান, পার্বত্য তথ্য কোষ ১-৯ খণ্ড, পর্বত প্রকাশনী, সিলেট, নভেম্বর ২০০৭; আবদুস সাত্তার, পাকিস্তানের উপজাতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স ঢাকা, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে চাকুরী ও শিক্ষার্জন উপলক্ষে অবস্থান করছে। অনেকেই দেশের বিভিন্ন শহরে স্থায়ী বাসগৃহ গড়ে তুলেছে। দেশের সমতলের তুলনায় পার্বত্যবাসীরা অতি দ্রুত আধুনিকতা ও শহুরে জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম

আজকের যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর আলাদা কোন প্রশাসনিক অস্তিত্ব বাংলাদেশের মুসলিম শাসনামলে ছিলো না। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের

নং	নৃ-গোষ্ঠীর নাম	সংখ্যা	নং	নৃ-গোষ্ঠীর নাম	সংখ্যা
১	চাকমা	২,৫২,৮৫৮	১৫	তংচংগ্যা	২১,৬৩৯
২	সাঁওতাল	২,০২,১৬২	১৬	বুনো	৭,৪২১
৩	গারো	৬৪,২৮০	১৭	হাজং	১১,৫৪০
৪	ত্রিপুরা	৮১,০১৪	১৮	হরিজন	১,১৩২
৫	মারমা	১,৫৭,৩০১	১৯	খাসী	১২,২৮০
৬	উম্	১৩,৪৭১	২০	কোচ	১৬,৫৬৭
৭	খুমি	১,২৪১	২১	মাহাতো	৩,৫৩৪
৮	চাক	২,১২৭	২২	মনিপুরী	২৪,৮৮২
৯	খীয়াং	২,৩৪৩	২৩	মুন্ডা	২,১৩২
১০	লুসাই	৬৬২	২৪	ওঁরাও	৮,২১৬
১১	ম্রো	১২৬	২৫	পাহাড়িয়া	১,৮৫৩
১২	মুরং	২২,১৭৮	২৬	রাজবংশী	৭,৫৫৬
১৩	পাংখো	৩,২২৭	২৭	উরুয়া*	৫,৫৬১
১৪	রাখাইন	১৬,৯৩২		অন্যান্য	২,৬১,৭৪৩
				মোট	১২,০৫,৯৭৮

কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিলো না। তখন এটি ছিলো চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র ইতিহাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল বাংলাদেশের ভেতরে, সেই প্রাচীন হরিকেল জনপদ থাকা অবস্থায়। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করে পৃথক জিলায় পরিণত করা হয়। বৃটিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার্থে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলকে ভিন্ন জিলা ঘোষণা করে। শাসনের জন্য নিয়োগ করা হয় একজন তত্ত্বাবধায়ক বা জিলা প্রশাসক। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম বৃটিশ জিলা প্রশাসক ছিলেন মি. টি. এইচ. লুইন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে আজকের বাংলাদেশে ১২০৪ সাল থেকে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে বিপর্যয় পর্যন্ত মুসলিম শাসন চালু ছিলো। অন্য কথায় বৃটিশ পূর্ব বাংলাদেশে মুসলিম শাসন ৫৫৩ বছর (১২০৪-১৭৫৭) স্থায়ী হয়েছিল। ১৩৪০ সালে বাংলার সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৫০খ্রী.) সোনারগাঁ থেকে চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন। ফলে তাঁর সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চল সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনাধীনে আসে। সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ মেঘনার তীরবর্তী শহর ও

www.pathagar.com

নদীবন্দর চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন।

এরপর দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে থাকে। রাজমালার বর্ণনায় জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজা ধনমানিক্য ১৫১৩-১৫ খ্রী. চট্টগ্রামের কিয়দংশ দখল করেন। বাংলার তদানীন্তন শাসক হোসেন শাহী বংশের পরাক্রমশালী সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) দ্রুত সেনাবাহিনী প্রেরন করে পুনরায় সমগ্র চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হোসেন শাহী আমলে আরাকানের মগ রাজা মং খা রী (১৪৩৪-১৪৫৯) চট্টগ্রামের রামু অঞ্চল দখল করেন। এ দখলদারীর বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরিত হয়। সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালে আরাকান রাজা স্বল্প সময়ের জন্য এ অঞ্চল দখল করেন। সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় আরাকান সম্রাট নুসরাত খানের নেতৃত্বে। জো আঁ দে বারোস এর Da Asia এবং সমসাময়িক পর্তুগীজ গ্রন্থ থেকে জানা যায় আরাকানের রাজা বাংলার সুলতানদের সামন্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম অধিকারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার ফলেই আরাকান রাজ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সামন্তে পরিণত হয়েছিলেন বলে পন্ডিতগণ মনে করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ চট্টগ্রামকে দু'ভাগে ভাগ করে পরাগল খান ও খোদা বখশ খান কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। খোদা বখশ খানের শাসনাধীন ছিলো দক্ষিণ চট্টগ্রাম।

দিল্লীর শূর সম্রাট শেরশাহের আমলে পর্তুগীজ নাবিকরা চট্টগ্রাম শহরের ২০ মাইল দক্ষিণে দিয়াংগা এবং আরাকান উপকূল সিরিয়ামে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এ সকল পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা আরাকান কর্তৃপক্ষের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করে প্রায়ই দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত হয়। এ সকল পর্তুগীজ জলদস্যুরা চট্টগ্রামের স্থানীয় জনগণ যারা সাধারণভাবে মগ্ নামে পরিচিত তাদের সহযোগিতায় সমতল এলাকায় দস্যুবৃত্তি পরিচালনা করতো। এ সকল দস্যুর অত্যাচারে সমতল অঞ্চলের জনগণের শান্তি ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয় এবং মোগল প্রশাসন এদেরকে শায়েস্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বাংলার তৎকালীন সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগীজ উপনিবেশকারী এবং আরাকান রাজ্যের মধ্যকার কলহের সুযোগে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল জয় করেন এবং ধার্মিক সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) নির্দেশানুসারে এ অঞ্চলের নাম রাখেন ইসলামাবাদ। পরবর্তীতে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল অধিকারে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বিরাজ করে।

বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলার মুঘল সুবেদারগণ চট্টগ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁদের প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করতেন এবং কোন কোন উৎপন্ন দ্রব্য ও পশুর (যেমন : হাতি, তুলা) উপর করারোপ করতেন। মুঘলদের পর উপনিবেশিক বৃটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। ১৭৬০ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাব মীর কাসেমের (১৭৬০-১৭৬৪) নিকট থেকে চট্টগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার একশো বছর পরে ভারতের বৃটিশ শাসকরা তাদের 'বিভক্ত

www.pathagar.com

করে শাসন করার' (Divide and Rule) কৌশল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্ম দেয়। ১৮৬০ খৃস্টাব্দের ২৬ জুনের নোটিফিকেশন নাম্বার ৩৩০২ এর ভিত্তিতে এবং একই সালের ১ অগাস্ট ১৮৬০, রেইডস এর 'ফ্রন্টিয়ার এ্যাক্ট ২২ এফ ১৮৬০' অনুসারে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী তাকিদে বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠী বৃহত্তর চট্টগ্রাম জিলাকে বিভক্ত করে এর পাহাড় প্রধান অঞ্চলকে স্বতন্ত্র 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' জিলার রূপ দেয়। ১৯০০ সালের ম্যানুয়েলের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০০ সালের ১লা মে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী প্রভাব খর্ব করার লক্ষ্যে এবং ঐ এলাকার স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে 'নোটিফিকেশন ১২৩ পিডি' চিটাগাং হিল ট্রাক্টস, রেগুলেশন ১৯০০ (Chittagong Hill Tracts Regulation 1900) চালু করে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী জিলা প্রশাসক সেখানকার সবধরনের অভিগমন বা জনস্থানান্তর বন্ধ বা প্রতিরোধ করতে পারতেন। ঐ আইন প্রণয়নের দ্বারা বৃটিশ বেনিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বহিরাগত যাযাবর উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসে বাধ্য করানোর প্রয়াস চালায় এবং দেশের মূল জনগণ তথা বাংলাভাষী বা বাঙালীর অবাধ গমনাগমন ও বসতি স্থাপনকে বিঘ্নিত করে ভূমিজ সন্তান (Son of the Soil) নয় এমন বহিরাগত ও বিদেশী এবং এদেশে অভিবাসী (immigrant) ভারত-বার্মা থেকে আগত চাকমা, টিপরা, লুসাই, মগ, মারমা উপজাতিদের ঠাঁই করে দেয়া হয়।[১৬] ১৯৩৫ সালে বৃটিশ প্রণীত ভারত শাসন আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'সম্পূর্ণ বা পৃথক অঞ্চলে' (Totally Excluded Area) হিসেবে চিহ্নিত করে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সংলগ্ন বাংলাভাষী মুসলিম অধ্যুষিত সমতল অঞ্চলের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বৃটিশ বেনিয়া উপনিবেশিকদের এই কৌশলের কারণ ছিলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী প্রভাব ও বসতিস্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং সেখানে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করা। প্রায় জনশূন্য এবং সম্পদ সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বার্মা, আরাকান, চীন ও উত্তর-পূর্ব ভারতের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত বসতি স্থাপনকারী উপজাতিদের যতটুকুই দাবী ছিলো অঞ্চলটির কাছের সংলগ্ন চট্টগ্রামের সমতলবাসী বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর ঐ অঞ্চলটির উপর অধিকার বা দাবী কোন যুক্তিতেই কম ছিলো না। কিন্তু স্বার্থান্বেষী বেনিয়া ইংরেজরা ন্যায়পরায়ণতার যুক্তিকে লঙ্ঘন করে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে। ১৯৫৬ সালে পৃথক অঞ্চলের বিধানের সমাপ্তি ঘটে। এই সালে প্রাদেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করে এবং এর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি

---

১৬. S. Mahmood Ali, 'The Fearful state: Power people and Internal war in South Asia', London and new Jersy: ZED Books, 1993, উদ্বৃত ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৫।

www.pathagar.com

ঘটে ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের বুনিয়াদী গনতন্ত্র সংবলিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে। মৌলিক গনতন্ত্রের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমতলের রাজনৈতিক ধারায় মিশে যাওয়ায় সমতলের শাসন বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) এর মর্যাদারও স্বাভাবিক অবসান ঘটে।

ঐ বছর ম্যানুয়েলের ৫১ অনুচ্ছেদ রহিত করে পাকিস্তানের সর্বত্র সকল নাগরিকের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করা হয় ঢাকা হাইকোর্টের এক রায়ে। তখন থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী বসতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি মাত্র বৃহত্তর জিলা ছিলো। ১৯৮৩ সালে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি প্রশাসনিক পার্বত্য জিলায় বিভক্ত করা হয়। ১৯৮৯ সালে সংসদে তিনটি জিলার জন্য তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাশ করা হয়। এই বিলে স্থানীয় পরিষদের কাঠামোও নির্ধারণ করা হয়। এতে একজন চেয়ারম্যান (উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন), ২০ জন উপজাতীয় সদস্য ও ১০ জন অউপজাতীয় সদস্য রাখা হয়। ১৯৮৯ সালের এ প্রক্রিয়ায় বহিরাগত চাকমা, টিপরাদেরকে আরো মারাত্মক ইন্ধন যোগানো হয়।[১৭]

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে বিতর্কিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে তাঁর কার্যালয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত কম্পিউটারে মুদ্রিত ১৫ পৃষ্ঠার এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন সরকারী আওয়ামী লীগ দলের চীফ হুইফ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং শান্তি বাহিনীর পক্ষে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। এই চুক্তি সংবিধান বিরোধী, দেশ বিরোধী, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী, গণতন্ত্র - মৌলিক অধিকার - সমতা-সমসুযোগ বিরোধী বলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলিমরা এর বিরোধীতা তখন থেকেই করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো ১২টি উপজাতিকে বাদ দিয়ে চাকমা শান্তি বাহিনীর সাথেই সরকার চুক্তি করেছে। কেবল চাকমাদের সাথে চুক্তি অন্যদের অধিকার ও সুযোগ হরণ মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মুসলিম বাঙালীদের সম্পদ লুঠ-পাট, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালানো, তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, তাদের নারীদের ধর্ষণ, তাদের শিশুদের বিভৎসভাবে হত্যা করা, তাদেরকে আহত-নিহত করা, তাদের জমি কেড়ে নেয়া, তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা, তাদেরকে ঐ অঞ্চল থেকে বহিস্কার করা ইত্যাদি কু-কর্ম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরও শান্তি বাহিনীর সন্ত্রাসীদের দ্বারা আজো অব্যাহত আছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ৩৮ বছর ধরে যে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী দেশ রক্ষা

---

১৭. ৫ম খণ্ড- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি, বাংলাদেশ গেজেট, মার্চ ২, ১৯৮৯; উদ্বৃত ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পূর্বোক্ত পৃ. ৫।

১১—

www.pathagar.com

করলো, বিদ্রোহ থামালো, স্বাধীনতা বাঁচালো, জীবন দিয়ে, ঘাম ও রক্ত দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করলো সে বাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়ে বর্তমান সরকার স্থানীয় বাঙালী মুসলিমদের জীবন ও সম্পদকে ১৯৯৭ এর শান্তি চুক্তি পূর্ববর্তী সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধহীন আক্রমণের মুখে ঠেলে দিয়েছে।[১৮] ১৯৭১ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র[১৯] চলছে সরকার সে ষড়যন্ত্রের 'পাতানো ফাঁদে' এদেশের এক সম্পদশালী এক-দশমাংশ এলাকাকে ঠেলে দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার অর্থ দাঁড়াবে বর্তমান বাংলাদেশের দশ ভাগের একভাগ ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকালয় থেকে সেনাক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার ফলে সেখানে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। তারা বাঙালীদের কাছ থেকে যথেচ্ছ চাঁদা আদায় করছে। কৃষিপণ্য বিক্রিতে, ছাগল বিক্রিতে, কাঠ বিক্রিতে, ফল-ফসল বিক্রিতে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে হচ্ছে। আগেও দিতে হতো। এখন তা বেপরোয়া রূপ ধারণ করেছে। শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীরা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে ভূমি। দখলে নিয়ে নিচ্ছে বাঙালীদের ইজারা নেয়া জমি, রাবার বাগান ও আম বাগান প্রভৃতি। চাকমা ভিন্ন অন্য উপজাতিরাও চাকমা সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতনের শিকার। চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী হামলা থেকে তারাও রেহাই পাচ্ছে না। এই মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতা এটাই। অন্য কথায় ভারতে প্রশিক্ষিত মাত্র কয়েক হাজার সশস্ত্র সন্ত্রাসীর কাছে জিম্মি ওখানকার সব বাসিন্দা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ইতিহাস

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বহুল আলোচিত এবং প্রচুর পরিমাণে পর্যালোচিত। এর ইতিহাস সম্পর্কে এখন প্রায় প্রত্যেকেই জানেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কোন দলের সমস্যা নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। এ অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় জনসমষ্টি যে ভূমিজ সন্তান নন এবং এ অঞ্চলে ইতিহাসের কোন পর্যায়ে যে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাও সবাই জানেন। এও জানেন যে, এ অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় জনগণ পাশাপাশি বসবাস করেছেন

---

১৮. জাফর আহমদ নূর, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশ্ব মোড়লদের হেড লাইটের আলো পড়েছে (প্রবন্ধ), পৃ.১।

১৯. ধর্মযাজক ফাদার টীম ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে খৃস্টানীকরণ (Christianization) প্রোগ্রাম শুরু করেন। পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া তিনি এখানে বিগত ৩৭ বছর যাবত অবস্থান করে ছোট বড় সকল উপজাতি সদস্যদের খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে পার্শ্ববর্তী মিজোরাম (৯০% খৃস্টান ও ইহুদী), ত্রিপুরা (৩০% খৃস্টান), মনিপুর (৪০% খৃস্টান), আসাম (৪৫% খৃস্টান), মেঘালয় (৮০% খৃস্টান), অরুনাচল (৭০% খৃস্টান) রাজ্যের খৃস্টান ও ইহুদীদের সাথে ধর্মীয় বন্ধন গড়ার কাজটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাফল্যের সাথে করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধর্মযাজক বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেমোগ্রাফিক ডিনামিকস পরিবর্তনের পাশাপাশি সকল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অত্যাধুনিক বিশাল খৃস্টান ডরমিটরী, গীর্জা, মিশনারী স্কুল, বাইবেল কেন্দ্র, পাঠাগার, সার্ভিস সেন্টার, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ও শক্তিশালী স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

www.pathagar.com

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। মাত্র কিছু সংখ্যক গণবিচ্ছিন্ন নেতা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই শান্তিপূর্ণ নীরব অঞ্চলকে জাতীয় রাজনীতির অঙ্গন ছাড়িয়ে তুলে আনতে চেয়েছেন আঞ্চলিক, এমনকি আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৃহৎ পরিমণ্ডলে।[২০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রথম প্রকাশ ঘটে এ শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি। তখন কিছু সংখ্যক উপজাতীয় নেতা[২১] ভারত বিভক্তি অপরিহার্য জেনে কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার পথ অনুসন্ধান করেছেন, দাবী তুলেছেন। যোগাযোগ করেছেন হিন্দু ব্রাহ্মন্যবাদী নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে। মহাত্মাগান্ধী, (১৮৬৯-১৯৪৮) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, জয় প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯) ও কংগ্রেস সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা এবং শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর মতো হিন্দু মহাসভা নেতার সাথে তারা যোগাযোগ করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতৃত্ব সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই এলাকায় একটি প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করেন। এ সময় কংগ্রেস নেতা এ. বি. ঠক্কর সহ অন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিধিদল নিয়ে এসে সেখানকার উপজাতীয়দের ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে প্রকাশ্য প্রবল প্রচারণা চালায়। তাতে কাজ না হলে উপজাতীয় রাজারা ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের রাজন্যদের মত মর্যাদাবান না হয়েও ১৯৪৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে গঠন করেন 'দি হিলমেন এসোসিয়েশন' ('The Hillmen Association')। লক্ষ্য ছিল অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের রাজন্যদের মত পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি 'দেশীয় রাজ্যে' (Princely State) পরিণত করে প্রতিবেশী ত্রিপুরা, খাসিয়া বা কুচবিহারের ন্যায় রাজা শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুড়ে একটি আলাদা রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) গঠন করা এবং ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তাও যখন সম্ভব হয়নি তখন কংগ্রেস নেতা জওহর লাল নেহেরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) মাধ্যমে ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় যেন র‍্যাডক্লিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রাচীন রেকর্ডপত্রে পাওয়া যায়, বাউন্ডারী কমিশনের (Boundary commission) স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ মাউন্ট ব্যাটেনের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এ কারণে যে, পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সমুদ্র বন্দর 'চট্টগ্রাম অরক্ষিত' হয়ে পড়বে যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতা

---

২০. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ রাজনীতি : কিছু কথা ও কথকথা, মৌলি প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, মে ২০০২, পৃ. ১৬২-১৬৩।

২১. কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির একটি প্রতিনিধি দল এবং ভুবন মোহন রায়ের নেতৃত্বে পার্বত্য রাজাদের আরেকটি প্রতিনিধি দল দিল্লি গিয়ে পৃথক পৃথকভাবে কংগ্রেস নেতাদের সাথে সাক্ষাত করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানান।

www.pathagar.com

অরক্ষিত হয়ে উঠবে যদি মুসলিম প্রধান মালদহ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৪ই অগাস্ট ১৯৪৭ র‍্যাডক্লিফ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেন। একদিকে কংগ্রেস ভারতের পক্ষে আরও অনেক সুযোগ র‍্যাডক্লিফের বাউন্ডারী কমিশন থেকে হাতিয়ে নেয়া এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের প্রবল বিরোধিতার মুখে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সরাসরি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। রেডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে পূর্ব বাংলার সঙ্গে থেকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐসব চাকমা নেতা পাকিস্তানকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেননি। সবাই জানেন ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং ১৯ অগাস্ট পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলে ভারতীয় কংগ্রেস নেতা এ. বি. ঠক্করের প্ররোচনায় রাম-রাজত্বের মোহে উম্মাদ চাকমা নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান[২২], স্নেহ কুমার চাকমা[২৩], ঘনশ্যাম দেওয়ান[২৪] প্রমুখ রাঙ্গামাটিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের সামনে ভারতীয় অশোক চক্রের পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সময় কি ঘটে তা একজন চাকমা লেখকের ভাষায় শোনা যেতে পারে: 'এত আশা-আকাঙ্খা নিয়ে ভারতীয় পতাকা উড়ানো হলেও সঙ্গে সঙ্গেই রশির গিঁট খুলে নিজেই পতাকাটি মাটিতে পড়ে যায়। ফ্লাগ পোল থেকে নিজে নিজে খুলে পড়ায় সেদিন অনেকেই বলেছিলেন, মনে হয় এই মাটিতে ভারতীয় পতাকা কোনদিনই উড়বে না। অগত্যা এক তরুন চাকমা বালকের বানরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার মত কয়েকবার চেষ্টা পরিশেষে তিন চার গিট দিয়ে ভারতীয় পতাকা উড়ানো নিশ্চিত করলেও এ.বি.ঠক্কর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে পারেন নি'।[২৫] ১৫ অগাস্ট মারমারা বান্দরবানে উত্তোলন করেন বার্মার পতাকা। তখনকার চাকমা নেতা স্নেহকুমার চাকমা পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বিধান সভার সদস্যও হন।

মোটকথা পূর্ব বাংলার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে যে ভারত বিভক্তি হয় সেটা তারা মানেননি। ২১ অগাস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেলুচ

---

২২. পার্বত্যাঞ্চলের প্রথম গনসংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির সভাপতি ছিলেন কামিনী মোহন দেওয়ান। পিতার নাম ত্রিলোচন দেওয়ান। দেশ বিভাগের সময় ভারতের সঙ্গে একীভূত হওয়ার লক্ষ্যে তৎপরতা চালানোর দায়ে তিনি কারাবরন করেন। রাঙ্গামাটি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান (১৯৮৯) গৌতম দেওয়ান তার নাতি।

২৩. বৃটিশ আমলের অন্যমত উপজাতীয় নেতা। পিতার নাম শ্যামচন্দ্র চাকমা। জনসংহতি সমিতি তথা শান্তি বাহিনীর অন্যতম উপদেষ্টা। ভারতের পক্ষ নেয়ায় হুলিয়া জারী হওয়ায় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জনপ্রতিধি নির্বাচিত হন।

২৪. ভারতপন্থী চাকমা নেতা, পিতার নাম কালাহুলা দেওয়ান। ঘনশ্যাম দেওয়ানের আপন ভাগ্নে শান্তি বাহিনীর অন্যতম নেতা সমীরন দেওয়ান (মেজর মলয়)।

২৫. এস.বি. চাকমা, উপজাতীয় নেতৃত্ব: সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিকথা, উদৃত ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৭।

www.pathagar.com

রেজিমেন্ট তাদের দমন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মোটকথা ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিন সার্কেলের তিনজন উপজাতীয় প্রধান বা রাজা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি দেশীয় রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের আশায় বৃটিশ বেনিয়া কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে তদবীর করেছিলেন। তারা ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসিয়া অঞ্চল সমন্বয়ে ভারতীয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[২৬] কিন্তু এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে তারা ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে উল্লাস প্রকাশ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অংশ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৮৮১' বাতিল করা হয়। ১৯৫৬ সালে অনন্ত বিহারী খীসা[২৭] এবং মৃণাল কান্তি চাকমার নেতৃত্বে 'হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দ্বারা গঠিত এটাই প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগঠন।[২৮] পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে যথাক্রমে ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানেও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সংবিধানের এক সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করা হয় এবং এই এলাকাকে 'উপজাতি এলাকা' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আইয়ূব খানের শাসনামলে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে উপজাতীয় জণগনকে জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এ সময়ে উপজাতীয় কর্মচারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে বদলি করা হয়। শুধু উপজাতীয়দের দ্বারা গঠিত পুলিশ বাহিনী বাতিল করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আয়ত্তাধীনে আনা হয়। এভাবে বৃটিশ সরকার কর্তৃক দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদার অবসান হয়।

১৯৬৫ সালের ১৮ জুন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার[২৯] নেতৃত্বে 'পার্বত্য ছাত্র সমিতি'

---

২৬. সৈয়দ আজিজ উল আহসান ও ভূমিত্র চাকমা, 'প্রব্লেমস অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইন বাংলাদেশ : দি চিটাগাং হিল ট্রাকটস', এশিয়ান সার্ভে, ভলিউম ২৯, নং-১০, অকটোবর, ১৯৮৯, পৃ-৯৫৯-৯৭০।

২৭. সত্তর এর নির্বাচনের সময় মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার উপদেষ্টা ছিলেন। বাড়ী মোবাছড়িতে। পার্বত্য এলাকায় বেশ কয়েকটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনন্ত বাবুর ছেলে প্রসীত বিকাশ খীসা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালের নেতা এবং ইউপিডিএফের বর্তমান সভাপতি।

২৮. সালাম আজাদ, শান্তিবাহিনী ও শান্তিচুক্তি, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.২২।

২৯. মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার পিতার নাম বিত্ত কিশোর লারমা, মায়ের নাম সুহাসিনী। তিনি অমৃতলাল দেওয়ানের ভাগ্নে। উল্লেখ্য সন্তু লারমা মামাতো বোন বিয়ে করেন। অন্যকথায় অমৃতলাল দেওয়ানের মেয়েকে বিয়ে করেন।

www.pathagar.com

নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। পরের বছর অনন্ত বিহারী খীসা এবং জে. বি. লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি (আদিবাসি) কল্যাণ সমিতি' নামে আরো একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

কেউ কেউ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার জন্ম হয় যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন বিচ্ছিন্নতার পথ পরিহার করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতে মিশে যেতে। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামীলীগ সরকার বাংলাদেশী জাতিসত্তার বদলে বাঙালী জাতিসত্তার বিষয়টিকে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা দিলে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (১৯৭২-৭৫ এ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য) এর প্রতিবাদ করেন, শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যান, স্মারকলিপি দেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অসন্তোষ উত্থাপন করে তা সমাধানের দাবী জানান। শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বাঙালি হয়ে যাবার কথা বলেন। তিনি বলেন 'যা বাঙালি হইয়া যা'।[৩০] শেখ মুজিবের এই প্রস্তাবে নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বকীয় জাতিসত্তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উপজাতিয়রা বিচলিত বোধ করেন।[৩১] এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারী চারু বিকাশ চাকমার[৩২] নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাজা মং প্রু সাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে আরেকটি পার্বত্য প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তবে তারা তাদের দাবিগুলো রেখে যান।

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে উপজাতীয়দের চার দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো ছিল-

১। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষনের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির অনুরূপ সংবিধি বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজন করা।

৩। উপজাতীয় রাজাদের দফতরগুলো সংরক্ষণ করা।

৪। সংবিধানে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন-নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং

৩০. হুমায়ুন আজাদ, পার্বত্য চট্টগ্রামঃ সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.১৮।

৩১. সালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১২-১৩।

৩২. পার্বত্য চট্টগ্রামের এককালের শক্তিশালী আওয়ামী লীগ নেতা। পিতা দিগম্বর চাকমা। দাদা লালমনি ডাক্তার স্বাস্থ্য বিভাগে চাকুরী করতেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে সব সময় চিন্তা করতেন এবং সমস্যা সমাধানে নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিবাদী ভূমিকায় বিশ্বাসী ছিলেন।

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। [৩৩]

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যে চার দফা দাবী উত্থাপন করেছিলেন তার একটিও পূরন না করে তিনি পাহাড়িদের বাঙালী হয়ে যাবার কথা বলায় পাহাড়িরা মারমুখী হয়ে উঠে। মূলত এ কারনেই সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭২ সালে দেশে যে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা তাতে সই করেননি।

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার দাবিকে একদিকে শেখ মুজিব উপেক্ষা করেন; অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে[৩৪] পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ত্রিদিব রায়ের মা বিনীতা রায়কে[৩৫] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান। ত্রিদিব রায় তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায় বাংলাদেশে ফিরে আসতে অস্বীকার করেন। ১৯৭৩ সালে রাঙ্গামাটির এক নির্বাচনী জনসভায় চাকমা রাজার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দেন। এ জনসভায় বলেছিলেন, From this day onward the tribals are being promoted into Bengalis.[36]

শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের চার দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করার পর উপজাতীয়রা উপলব্ধি করলো যে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করা ছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এর ফলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ১৫ মে গঠিত হয় রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি। ১৬ মে গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জে এস এস)।[৩৭] রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি ও জনসংহতি সমিতি-এ দুটি সংগঠনের কোনোটিই মার্কসবাদী আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়নি। সংগঠন দু'টি ছিল মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে সংমিশ্রিত সংগঠন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে জনসংহতি সমিতি সামন্তবাদকে

---

৩৩. আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

৩৪. ১৯৫১ সালের ৭ অক্টোবর চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় মারা যাওয়ার পর ১৯৫৩ সালের ২ মার্চ তদীয় পুত্র রাজা ত্রিদিব রায় রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন। পাকিস্তান শাসনামলে রাজা ত্রিবিদ রায়ের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান সরকারের সাথে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিজয়ী হন।

৩৫. কলিকাতার তৎকালীন হিন্দু ব্যারিষ্টার সরল সেনের কন্যা বিনীতা রায়কে চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায় বিয়ে করেন। এই বিয়ের মাধ্যমে চাকমা রাজ পরিবারে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বিকাশ ঘটে।

৩৬. সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.৯।

৩৭. এ দলের সদস্য ছিলেন : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ চাকমা, চারু বিকাশ চাকমা, বি.কে. রোয়াজা, স্নেহকুমার চাকমা প্রমুখ।

www.pathagar.com

প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, প্রলম্বিত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের কথা বলে। উল্লেখ্য জনসংহতি সমিতির চার দফা কর্মসূচী পাহাড়িদের নিকট ম্যাগনাকার্টা হিসেবে চিহ্নিত হলেও এ দফাগুলোতে শ্রমিক-কৃষকের দাবি তুলে ধরা হয়নি। চার দফা দাবি আদায় ও আওয়ামীলীগ সরকারের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনামলেও আন্ডার গ্রাউন্ডে গিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৩ সালে সেনা উইং সশস্ত্র শান্তিবাহিনী [৩৮] গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে গঠিত হলেও এর কার্যকলাপ ১৯৭৫ সালের অগাস্ট মাসের পর অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপ এ সময়ে বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের চাকমা গেরিলাদের সহযোগিতা। ১৯৭৬ সালের জুনে বিলাইছড়ি আর্মড পুলিশ ক্যাম্প এবং বেতছড়িতে শান্তিবাহিনী প্রথম হামলা করে। ওই বছর জিয়াউর রহমান পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। রাজা ত্রিদিব রায়ের মা বিনীতা রায়কে এই বোর্ডের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৭ সালের ৪ জুলাই জিয়াউর রহমান গঠন করেন ট্রাইবাল কনভেনশন। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে এম এন লারমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তবে জাসদ প্রার্থী উপেন্দ্র লাল চাকমা (২৯৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম-১), স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশ প্রু চৌধুরী (৩০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম-২) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তিবাহিনীর অন্যতম নেতা সন্তু লারমা ও চবরি মারমা ১৯৭৬ সালের কোন এক সময় সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়। এ সময় শান্তি বাহিনীর নেতৃত্বে আসেন প্রীতিকুমার চাকমা। ১৯৮১ সালে শান্তি বাহিনীর সাথে সরকারের আলোচনার শর্ত হিসেবে সন্তু লারমা ও চবরি মারমা মুক্তি পেয়ে পাহাড়ে ফিরে আসেন।

জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী ১৯৭৮ সালে আদর্শিক কারণে সাংগঠনিক বিপর্যয়ে পতিত হয়। এ সময়ে প্রীতিকুমার চাকমার[৩৯] নেতৃত্বে একটি গ্রুপ

---

৩৮. ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী খাগড়াছড়ির ইটছড়ির গভীর অরণ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার ডাকনাম শন্তু বা শান্তি অবলম্বনে এদেরকে ডাকা হতো শান্তিবাহিনী। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ আর্মড পুলিশের ওপর অতর্কিতে প্রথম-হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে শান্তি বাহিনী; দেশব্যাপী শান্তিবাহিনীর নাম আলোচিত হতে থাকে।

৩৯. প্রীতিকুমার চাকমা ছিলেন ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত পাহাড়ী ছাত্র সমিতির সভাপতি। ১৯৮৫ সালের ২০ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন শান্তি বাহিনীর সদস্য আত্মসমর্পন করেন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম অধিনায়ক মেজর জেনারেল এম. নুরুদ্দীন খানের কাছে অস্ত্র জমা দেন। ২৯ জুন বাংলাদেশ সরকার ও প্রীতি গ্রুপের

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী আদর্শের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে পাহাড়িদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করতে চায়। অন্যদিকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা[৪০] প্রলম্বিত যুদ্ধের মাধ্যমে পাহাড়িদের অধিকার আদায় করতে আগ্রহী। এ আদর্শিক সংঘাতের ফলে দু'গ্রুপে হানাহানি শুরু হয়। ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন সন্তু লারমার অধীনস্থ শান্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রীতি গ্রুপের প্রভাবশালী কমান্ডার অমৃতলাল চাকমা ওরফে বলি ওস্তাদসহ[৪১] অনেককে হত্যা করে এবং প্রতিশোধ হিসেবে মানবেন্দ্র লারমা প্রীতি গ্রুপের একটি সুইসাইড স্কোয়াডের হাতে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ নিহত হন। ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসের ১০ তারিখের ঘটনা ১৯৮৭ সালের ভারতীয় পত্রিকায় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"Priti Kumar and his protagonists in the organisation called for 'decisive war' to end in the seccssion of the CHT from Bangladesh and its subsequent merger with India... Manobendra Larma, who viewed India as an expansionist bourgeois state advocated long protracted form of armed struggle to achieve autonomy within Bangladesh, not to secede from it. Manobendra saw the Chakma struggle "as part of the struggle of the toiling masses of Bangladesh." In fact, the cause of immediate differences between the two groups was Manobendra's decision to stop the raids on the non-tribal settlements created by Bangladesh authorities to resettle large members of Muslim peasants and landless labourers in the hill tracts. Priti Kumar felt that time was runnig out for the Chakma. "Now or

---

মধ্যে আত্মসমর্পনের পর প্রীতি কুমার চাকমা বিদ্রোহ ছেড়ে ভারতে পরম সুখে সংসার করছেন। দেখুন হুমায়ুন আজাদ, পূর্বোক্ত। উদ্বৃত ড. মাহফুজ পারভেজ, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৭।

৪০. উল্লেখ্য ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পিই- ২৯৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম-১ আসন থেকে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে হারিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পুনরায় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ১৯৭৪ সালের ২৫ জানুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, অনন্ত বিহারী খিসা, চারু বিকাশ চাকমা প্রমুখ বাকশালে যোগদান করেন। 'বাকশাল' (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) ছিল রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত দেশের একমাত্র দল; সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান বদলে ফেলে 'বাকশাল' এর মাধ্যমে দেশে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

৪১. অমৃত লাল চাকমা ওরফে ক্যাপ্টেন অসাধ্য (বলি ওস্তাদ) ইপি আর এর হাবিলদার ছিলেন। তিনি শান্তি বাহিনীর প্রথম অস্ত্র প্রশিক্ষক নলিনী, রনজন চাকমা ওরফে মেজর অফুরন্ত এর অধীনে শান্তি বাহিনীর সহকারী অস্ত্র প্রশিক্ষক ছিলেন।

www.pathagar.com

Never" was his call...[42]

এই মৃত্যু এবং পার্টির ভাঙন সম্পর্কে ৩১ ডিসেম্বর সন্তু লারমা একটি ছাপানো বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, "গত ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৮৩ ইংরেজী তারিখ জুম্ম জাতির জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত কালো দিবস। এই দিনে জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার চক্রান্তকারী, ক্ষমতালোভী ও বিভেদপন্থী গিরি (ভবতোষ দেওয়ান), প্রকাশ (প্রীতি কুমার চাকমা), দেবেন (দেব জ্যোতি চাকমা), পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) চক্র এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ চালিয়ে জুম্ম জাতির চেতনা ও জাগরণের অগ্রনায়ক, মহান দেশপ্রেমিক, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের অগ্রনায়ক, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের একনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধু, কঠোর সংগ্রামী, ত্যাগী, ক্ষমতাশীল ও দূরদর্শী মহান জাতীয় নেতা, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে তাঁর ৮ (আট) জন সহকারী (পরিমল বিকাশ চাকমা, মনিময় দেওয়ান, কল্যাণময় খীসা, সৌমিত্র চাকমা ও অর্জুন ত্রিপুরা প্রমুখ) সহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। .. .. .. সহকর্মীদের কয়েকজনের মরদেহের ওপরও ব্রাশ ফায়ার করে মরদেহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তারা তাদের ঘৃণিত চরিত্র উন্মোচন করে গেছে।[৪৩]

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুর পর শান্তিবাহিনী লারমা গ্রুপের নেতৃত্ব ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর সন্তু লারমা গ্রহণ করে। এ সময়ে ১৯৮৩ সন্তু লারমার শারীরিক অসুস্থতার কারণে রূপায়ণ কুমার চাকমা পার্টির নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৮৫ সালে আদর্শিক কারণে লারমা গ্রুপ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উষাতনের[৪৪] নেতৃত্বে একটি গ্রুপ এবং রূপায়ণ দেওয়ানের[৪৫] নেতৃত্বে অপর গ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। অপরদিকে দেবেন পলাশের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ প্রীতির নেতৃত্ব থেকে বেরিয়ে ভিন্নভাবে কাজ করতে থাকে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বেগম খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির সাথে পুনরায় সংলাপের ব্যবস্থা করেন। জনসংহতি সমিতি এ সময়ে তাদের পূর্বের পাঁচ দফা দাবি সংশোধিত করে পুনরায় সরকারের নিকট পেশ করে। জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা প্রকৃতপক্ষে

---

৪২. Life is not Ours. The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, P-20.

৪৩. সালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬-১৭।

৪৪. উষাতন তালুকদার পাহাড়ী ছাত্র সমিতির অন্যতম নেতা ছিলেন। শান্তি বাহিনীর তিনি প্রভাবশালী সদস্য এবং মেজর উষাতন তালুকদার সমীরন নামে পরিচিত। তার অপর নাম মলয়।

৪৫. রূপায়ণ দেওয়ান ওরফে মেজর রিপ হচ্ছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জামাতা, শান্তিবাহিনীর প্রভাবশালী ফিল্ড কামান্ডার। তিনি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন।

www.pathagar.com

পূর্বের পাঁচ দফা দাবির অনুরূপ। আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে মতৈক্যের ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি "শান্তি চুক্তি" নামে পরিচিত হয়। তবে চুক্তি সইয়ের পরপরই উপজাতি জনগণের একটি অংশ পার্বত্য চুক্তিকে 'আপসের চুক্তি' বলে আখ্যায়িত করে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। পাহাড়ি গণপরিষদ (পিজিপি),[৪৬] গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম (ডিওয়াইএফ)- কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)- বর্তমান সভাপতি অংগ্য চাকমা[৪৭], হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচ ডব্লিও এফ) - কেন্দ্রীয় সভানেত্রী সোনালী চাকমা[৪৮], এ চুক্তির বিরোধিতা করে। চুক্তি বিরোধীদের দাবী জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে যে চুক্তি করেছে তার মাধ্যমে উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। উপজাতীয়রা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের যে দাবি জানিয়ে আসছিল সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে তা অর্জিত হয়নি। তাই উপজাতীয় পাহাড়ী জনগণের স্বার্থরক্ষা ও পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা। এরই মধ্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশন দু'ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ থাকে চুক্তির বিপক্ষে অন্য ভাগ চলে যায় চুক্তির পক্ষে। পরে চুক্তি বিরোধী কয়েকটি সমমনা গোষ্ঠীকে নিয়ে প্রসীত খীসার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউ.পি.ডি.এফ) গঠিত হয়। তিনি সে সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতা ছিলেন। পরে তার একক নেতৃত্বে দলটি গড়ে উঠে। এখন এ দলটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসন দাবী করে আন্দোলন করছে। তদের সশস্ত্র বাহিনী আছে এটিও তারা স্বীকার করেন না। তবে পার্বত্য তিন জিলায় ইউপিডিএফ'র কয়েক হাজার সশস্ত্র ক্যাডার রয়েছে। পার্বত্য রাজনীতিতে ইউ.পি.ডি.এফ এখন একটি বড় শক্তি। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- তিন পার্বত্য জিলাতেই এদের সাংগঠনিক তৎপরতা রয়েছে। পার্বত্য এলাকার অন্যতম প্রধান সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগে ইউ.পি.ডি.এফের বিরোধ গোড়া থেকেই। চুক্তি বিরোধী ইউ. পি.ডি.এফের দাবী পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন। এ সংগঠনের সভাপতি হিসেবে

---

৪৬. পাহাড়ী গন পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রসীত বিকাশ খীসা। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জনসংহতি সমিতি ফ্যাসিস্ট কায়দায় এগুচ্ছে... .. এ চুক্তিতে শান্তি আসবে না' (সাক্ষাৎকার মানব জমিন, ১৯ অক্টোবর ১৯৯৭)।

৪৭. পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২০ মে ২০০৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থায় জনগণের বিরুদ্ধে সরকার। সরকার, সেনাবাহিনী ও সন্তু লারমা চক্রের মিলিত ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এ গ্রুপটি ইউপিডিএফের অংগ সংগঠন।

৪৮. হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন নেত্রী কল্পনা চাকমা ১৯৯৬ সালের ১২ জুন শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহৃত হন।

www.pathagar.com

নেতৃত্বে রয়েছেন প্রসীত বিকাশ খীসা, (পিতা- অনন্ত বিহারী খীসা), সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা, অন্যান্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রদিপন খীসা, চন্দন চাকমা প্রমুখ। এই ফ্রন্ট মনে করে স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তারা মনে করে এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ও পাহাড়িদের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে না। ইউ.পি.ডি.এফ. সৈন্য প্রত্যাহার ও জাতিসত্তাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধানের গুরুত্ব প্রদান করে। এভাবে দেখা যায় যে পার্বত্য শান্তি চুক্তি নিয়ে পাহাড়ের মানুষ দ্বিধা বিভক্ত। জনসংহতি সমিতির বিকল্প হিসেবে জুম্ম ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (Jumma Naitonal Democratic Front) গঠিত হয়েছে বলেও পত্রিকায় খবর পাওয়া যায়। শান্তি বাহিনীর বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে 'জুম্ম ন্যাশনাল আর্মি' (Jumma National Army)। অন্যান্য সংগঠন হচ্ছে নয়া সেতু (সভাপতি নিত্যানন্দ পাল)। পার্বত্য চুক্তির প্রধান অঙ্গীকার মুতাবিক পাহাড়ের সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা, বেআইনী অস্ত্রের বন্দুকযুদ্ধ, সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি, মুক্তিপন, অবৈধ আধিপত্য বিস্তার, গুপ্তহত্যা আজো বন্ধ হয়নি। পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৩ বছর পূর্ণ হলেও আজও পাহাড়ে শান্তি ফেরেনি। কমেনি খুন, অপহরণ, সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজি। শান্তি চুক্তির আগে শুধু শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাস চললেও চুক্তির পর দ্বিমুখী এবং বর্তমানে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজিতে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম। শান্তি চুক্তির নামে পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জিলাতেই চাঁদাবাজি ভয়াবহ আকার ধারন করেছে।[৪৯] চুক্তিবিরোধী ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), চুক্তি পক্ষের জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) এবং নানা মতবিরোধের কারণে এই দুই গ্রুপ থেকে বের হয়ে নতুন জন্ম নেয়া 'চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ন্যাশনাল ফোরাম (সিএইচটি এনএফ) এর ব্যানারে চাঁদাবাজি চলছে। রাঙ্গামাটিতে জেএসএস সমর্থকরা 'সন্তোষ' এবং ইউপিডিএফ সমর্থকরা 'গুন্ডুস' বাহিনী হিসেবে পরিচিত। খাগড়াছড়িতে জেএসএস সমর্থকরা 'সদক' এবং ইউপিডিএফ সরাসরি নিজেদের পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজি করে। অন্যদিকে বান্দরবানে নতুন জন্ম নেয়া এনএইচটিএফ সদস্যরা 'বোরখা পার্টি' হিসেবে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে এহেন অপরাধ নেই যা হয়নি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সন্তু লারমার শান্তি বাহিনী। আবারো সশস্ত্র যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন সন্তু লারমা।[৫০] অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। বেশ কিছু বড় ধরনের অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাও ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা মুক্ত, পরিস্থিতি শান্ত

৪৯. তিন পার্বত্য জেলায় চাঁদাবাজি চলছেই, সমকাল রিপোর্ট, ৫ ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যা, পৃ-৩।
৫০. দেখুন দৈনিক সমকাল, ৩ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ-৯

www.pathagar.com

এমনটি বলার অবকাশ নেই। পাহাড়ি বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী নানাভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙ্গালীরা প্রতিনিয়ত এদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। মনে রাখতে হবে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদ সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।[৫১] বিগত ৩৫ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে শান্তিবাহিনী ও অন্যান্য সশস্ত্র উপজাতীয়দের হামলায় প্রায় ৮৫ হাজার সৈন্য, বিদ্রোহী ও বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে।[৫২] পার্বত্য চট্টগ্রাম আজও রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, অরক্ষিত। সেখানকার পাহাড়ে, অরণ্যে, চরাচরে আজ মুসলিম বাংলাভাষী জনতার হাহাকার, আহাজারি আর আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রায়শই খুন-অপহরণ হচ্ছে মুসলিম বাংলাভাষীরা। বড় বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড- লংগদু হত্যাকাণ্ড, কাউখালী হত্যাকাণ্ড, বরকলের ভূষণ ছড়া হত্যাকাণ্ড, পানছড়ি হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়ি থানার নব খাগড়াছড়িতে ৭ জন সৈনিক হত্যাকাণ্ড, রামগড় থানার ঝগড়াবিল বাজার হত্যাকাণ্ড, খাগড়াছড়ির লোগাং হত্যাকাণ্ড, নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ড, খাগড়াছড়ির মহাজন পাড়ার হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়ি থানার হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়ি থানার গুলশাখালী, গাঘছড়া, মাইনী, বড় মহিল্লা ও কালাপাকজ্জার ৩৪ বাঙালী কাঠুরের হত্যাকাণ্ড, খাগড়াছড়ির কুমিল্লা টিলার হত্যাকাণ্ড, নাইক্ষ্যাংছড়ি পাড়া ও বলিপাড়ার হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত উপজাতিদের ধর্মকর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার ধরনও পরস্পর থেকে ভিন্ন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে চাকমারা একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে আছে। চাকমারা মূলত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও এখন তাদের একটা বড় অংশ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান ধর্মীয় মিশনগুলো খুব তৎপর এবং উপজাতিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। উপজাতীয়দের বেশ ব্যাপকহারে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি মনে হয় পার্বত্য সমস্যার নতুন উপাদান যোগ করেছে। জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমাদের পরই অর্থ্যাৎ দ্বিতীয় স্থানে বাঙালিদের অবস্থান। বাঙালিদের আবার সবাই মুসলমান। এ মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার তিনটি কারণ প্রধান বলে মনে হয়। প্রথমত. সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, দ্বিতীয়ত. বাঙালী বসবাসকারীদের প্রত্যাহার, তৃতীয়ত. পুঞ্জীভূত ভূমি সমস্যা- ভূমি জরিপ ও বন্টন। তবে তাৎক্ষনিক কারন হিসেবে মনে হয় সেনাবাহিনী ও বাঙালি বসবাসকারীদের প্রত্যাহারের দাবির বিষয়টিই প্রধান। চাকমা উপজাতিদের আঞ্চলিক

---

৫১. নিরাপত্তা বিশ্লেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতামত, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৮ অগাস্ট ২০০৯, পৃ-১।

৫২. দেখুন দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ অগাস্ট ২০০৯, পৃ-১৬।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ'র দাবি তাই। এরা এসব দাবি সংবলিত স্মারকলিপিও স্থানীয় জিলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। পাল্টা স্মারকলিপি পেশ করেছে বাঙালিদের রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যায় ভারতের ভূমিকা

ভারতীয় চক্রান্তের সর্বাধিক প্রকট ফসল হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সংকট। নিজেদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৭টি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমনকারী ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী নামক সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, এ কথা সর্বজনবিদিত। আজ আর কারো সন্দেহ নেই যে, দরিদ্র বাংলাদেশের সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশদ্রোহী উপজাতীয়দের নেপথ্য মদদদাতা শক্তি ভারত।[৫৩] হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ভারত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে ডাকে এবং শান্তিবাহিনীকে সাহায্য করতে চায়।[৫৪] এমনও জানা যায় যে, মুজিব হত্যাকান্ডের পর লারমা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের আশ্রয়ে চলে যান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত করতে থাকেন।[৫৫] বেশ কিছু গ্রুপকে ট্রেনিং দেয়া ছাড়াও ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে ভারত শান্তি বাহিনীকে অস্ত্র ও গোলা বারুদের দু'টি বড় ধরনের চালান দেয়।[৫৬] পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সম্পদের এক অনাহরিত রত্নভান্ডার। ভূ-মানচিত্রের এই বর্নিল স্বপ্নিল ভূস্বর্গ নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত। ভারত চাচ্ছে ফেনী নদীর কোল ধরে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে। ওদিকে নাফ নদীর তীর পর্যন্ত ভারতের আধিপত্য বিস্তৃত হলে তাদের 'সাতকন্যার' স্বাধীনতার আহাজারি পাহাড় পরিবেষ্টিত বিজন জনপদের বন বাদাড়ে গুমরে গুমরে এক সময় নিঃশব্দ হয়ে যাবে। নতজানু করা যাবে বেয়াড়া প্রতিবেশী স্বাধীনতার অহমবোধে উজ্জীবিত বাংলাদেশীদের। প্রাচুর্যের ভান্ডার লোপাট করা সহজ হবে। শ্যেন দৃষ্টি ফেলা যাবে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর। চৈনিক চাপ, বার্মিজ প্রভাব

---

৫৩. মাসুদ মজুমদার, মাসুমুর রহমান খলিলী, আলম আজাদ, সম্পাদকীয়, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! পূর্বোক্ত, পৃ.৬।

৫৪. হুমায়ুন আজাদ, পার্বত্য চট্টগ্রামঃ সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪।

৫৫. ড. আমেনা মহসীন, The politics of Natinalism: The case of chittagong Hill Tracts, ইউপিএল, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৬৬।

৫৬. এস. কালাম উদ্দীন, A Tangled Web of Insurgency, ফারইস্ট ইকনমিক রিভিউ, হংকং, ২৩ মে ১৯৮০: সুবীর ভৌমিক, Insurgent Crossfire: North-East India, ল্যানসার পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬, নয়াদিল্লী; উদ্বৃত ড. মাহফুজ পারভেজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

www.pathagar.com

সহজেই মুকাবিলা করা যাবে- এমন একটি 'সহজ-সরল' অথচ ষড়যন্ত্রমূলক অশুভ পরিকল্পনা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা কাজ শুরু করে। পঞ্চাশের দশক থেকে ভারত অনেক কাষ্ঠখণ্ড পুড়িয়েছে- বাংলাদেশ কাবু করার জন্য। স্বাধীনতার উষা লগ্নেই ভারত চেয়েছিলো বাংলাদেশের অর্জনগুলো হাতিয়ে নিতে। তাদের 'সহায়তায় প্রাপ্ত স্বাধীনতা'কে হাইজাক করতে। বাংলাদেশের গর্ব, অহম ও আত্মমর্যাদাবোধকে দাবিয়ে দিতে। তাই অকৃতজ্ঞ বাংলাদেশীদের প্রতি ভারত রুষ্ট। নতুন পরিকল্পনায় যাবার আগে ভারত নানা কৌশলে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর দেউলে বুদ্ধিজীবীদের মগজ ধোলাই করে নেয়। পরবর্তী সময়ে টার্গেট করে বাংলাদেশের দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনীকে। তাই নানা ছল-ছুতায় তারা সহজ-সরল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদেরকে গিনিপিগ হিসেবে বাছাই করে। স্বাধীনতার মন্ত্র শোনায়, আশ্বস্ত করে '৯ মাসে বাঙালীদের স্বাধীন করে দিয়েছি। ছ'মাসে তোমাদেরকে (চাকমা) পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন করে দেবো'। ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর মোহনবাঁশী শান্তিবাহিনীকে বাস্তবতা ভুলিয়ে দিলো। চাকমা সন্ত্রাসীরা দলে দলে আশ্রয় নিলো ভারতের শরনার্থী শিবিরে। হাতে পেলো অস্ত্র। ভারতীয় পরিকল্পনার অশুভ ছায়াপাতের কারণে তারা 'সাতকন্যা'র মাতম শুনলোনা, উলফার (ULFA) লড়াইয়ের খবর পেলো না, ত্রিপুরার ভেতরের খবর জানলো না। মিজোরামে কি ঘটছে বুঝবার সুযোগ হলো না। দম দেয়া কলের পুতুলের মত ভারতীয় ইচ্ছা পূরণ করার আত্মঘাতী মরন খেলায় মেতে উঠলো।[৫৭] বিভিন্ন ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে এমন সব কথা বেরিয়ে আসে যাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই শান্তি বাহিনীর সাথে ভারতের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতের 'দি টেলিগ্রাফ' প্রত্রিকায় নভেম্বর ১৯৯৬-এ শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সংযোগের চিত্র প্রকাশিত হয়। কলকাতার 'আলোকপাত' পত্রিকার নভেম্বর ১৯৯৬ সংখ্যায় উত্তম উপাধ্যায় নামে একজন রিপোর্টার খুবই পরিস্কার ভাবে জানিয়েছেন, "এখন ১০ হাজার চাকমার মিলিশিয়া বাহিনী যে ভারতীয় সাহায্যেই পুষ্ট এটা ত্রিপুরার ছোট ছোট বাচ্চারাও জানে"।[৫৮] এরূপ প্রকাশ্য ঘোষণার পর এমন কথা বলা নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে, শান্তিবাহিনী ভারতেরই সৃষ্টি।

বিশিষ্ট ভারতীয় গবেষক-বিশ্লেষক অশোক এ বিশ্বাস তার "RAW's Role in Furthering India's Foreign Policy" শীর্ষক পুস্তিকায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সংযোগের কথা খোলাখুলি বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "RAW is now

---

৫৭. তালুকদার মনিরুজ্জামান, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদ সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৫৮. উদ্বৃত ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী ও ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪।

www.pathagar.com

involved in training rebels of chakma tribes and Shanti Bahini who carry out subversive activities in Bangladesh". এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'র' বর্তমানে চাকমা উপজাতি ও শান্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণদানে সরাসরি জড়িত যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নানারকম নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়।[৫৯]

১৯৯৭ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন হাইকমিশনার ফারুক সোবহান (পরে পররাষ্ট্র সচিব) "এশিয়া এজ"-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ "The Bangladesh Government felt that the main support for the 'Shanti Bahini' was being provided by the Research and Analysis Wing in India".- এর অর্থ হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে, শান্তিবাহিনীর মূল সমর্থন আসছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এ্যান্ড এনালিসিস উইং- এর কাছ থেকে। এ কথাও আজ জানা হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন ভারতের মিজোরাম রাজ্যের ডাইরেন্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলেও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এই সামরিক স্কুলের কমানডেন্ট ব্রিগেডিয়ার ত্রিগুলেশ মুখার্জী। এই স্কুলে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে শান্তিবাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের নভেম্বরে ভারতীয় চীফ অব আর্মী স্টাফ জেনারেল শংকর রায় চৌধুরী পুরো বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। এখানকার পরিস্থিতি তিনি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মিলিটারী ফরমেশনগুলি সফর করার সময় ডাইরেন্তীতে আসেন। এখানে জাংগল ওয়ারফেয়ার স্কুলে সামরিক প্রশিক্ষণরত বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেনারেল শংকর রায় আশা ব্যক্ত করেন যে, শীঘ্রই শান্তিবাহিনী সম্মানের সাথে স্বদেশভূমি জুম্মল্যান্ড-এ ফিরে যেতে পারবে।

লক্ষ্যণীয় যে, শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় অবৈধ সংযোগ কত গভীরে রয়েছে জেনারেল শংকরের বক্তব্য থেকে তা বেরিয়ে আসছে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের জুনে সরকার গঠন করার পর থেকেই শান্তিবাহিনীকে জামাই আদর করে হাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলে দিচ্ছেন এবং শেষাবধি তা যাচ্ছে ভারতের খপ্পরে। জেনারেল শংকর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিবাহিনী প্রশ্নে ভারতের পরিকল্পনা এবং নিকট ভবিষ্যতের করণীয় জানতেন বলেই এত নিশ্চিতভাবে শান্তিবাহিনীর স্বদেশভূমি জুম্মল্যান্ডে অচিরেই ফিরে যাবার আশ্বাস দিয়েছেন। ভারত, ভারতীয় RAW এখন এই কাজই করাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে। সন্তু লারমার সঙ্গে চুক্তি করে পার্বত্য

---

৫৯. উদ্বৃত ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী ও ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।[৬০]

দুর্ভাগা জাতি টের পেলো না এতসব অশুভ চক্রের গোপন তৎপরতা। আরো দুর্ভাগ্য যে বাংলাদেশের মেরুদন্ডহীন সরকারগুলো জাতিকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চেষ্টা তো করলোই না, অধিকন্তু ভারতীয়দের অন্যায় চাপ, মিথ্যা অভিযোগ মুকাবিলায় হিমশিম খেলো। ভারত কল্পিত অভিযোগ তুললো, বাংলাদেশ উলফাদের অস্ত্র-প্রশিক্ষণ-আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। এটা যে বঙ্গভূমিওয়ালা এবং শান্তিবাহিনী লালনের বৈধতা নেয়ার কূটনৈতিক চাল তা প্রথমেই সরকার বুঝতে পারলো না। উল্টো নতজানু হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতীয় আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠা সন্ত্রাসীদের সাথে শান্তি চুক্তির মহড়া দিতে শুরু করলো। উস্কানীদাতা ভারত নেপথ্যে খেলে সে প্রচেষ্টাও ভন্ডুল করে দেয় এবং নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষন করে। ভারত বেহুদা গত ৩৫ বছর ধরে জনসংহতি সমিতিকে লালন-পালন করেনি। ইচ্ছা চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুনাচলের সমৃদ্ধি সাধন করা। ভারতের পরিকল্পনা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাবেদার প্রশাসনের ব্যবস্থা করে নিজেদের এলাকার স্বাধীনতাকামীদের শায়েস্তা করা। চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করা। তার জন্য শান্তি বাহিনীকে তারা জামাই আদরে প্রতিপালন করেছে।[৬১] তারাই শান্তিবাহিনী ও জনসংহতির বুদ্ধি, পরামর্শ, অস্ত্র, আশ্রয় ও মন্ত্রণাদাতা। তারাই সাপ হয়ে কামড়ায় ওঝা হয়ে ঝাড়ে। তাদের ভারতীয় পরিকল্পনা প্রথমেই বোধগম্য হলো বাংলাদেশের সচেতন ও দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর কাছে। এক্ষেত্রেও টার্গেট হলো বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। পরিস্থিতিকে ভারত এমন পর্যায়ে ঠেলে এনেছে যে, বর্তমান সরকার নিজ ভূ-খণ্ডের সার্বভৌমত্বের কথা না ভেবে সেনা প্রত্যাহারের শান্তিবাহিনীর আবদারে সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় বলয় সমৃদ্ধ আরেক 'দেশ' বানানোর চক্রান্ত শান্তিবাহিনী ও ইউপিডিএফ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশীদের 'নিজভূমে পরবাসী' করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।[৬২]

প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক, গবেষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা আবুল আসাদ লিখেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সমস্যাজড়িত ও দুর্বল সময়কালে হঠাৎ করেই চাকমাদের মাথায় এসে প্রবেশ করল যে বাংলাদেশের ঐ অঞ্চলটার মালিক মোক্তার তারাই। এই অমূলক চিন্তা তাদের মাথায় কে ঢুকালো জানি না, তবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সুযোগে জেনারেল ওবানের মত কূটবুদ্ধির অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিলো। তারাই এই বিভেদ ও ষড়যন্ত্রের বীজ বুনে যেতে পারে। এর কিছু

৬০. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম : শান্তিবাহিনী ও ভারতীয় অবৈধ সংযোগ, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪-৫৫।

৬১. মাসুদ মজুমদার ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৭।

৬২. ড. সাঈদ-উর-রহমান, প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম : খসড়া চুক্তি প্রকাশ করা দরকার, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

১২—

www.pathagar.com

বিশ্বাসযোগ্যতা এ জন্যেই আছে যে, ঐ শ্রেণীর চাকমারা ভারতীয় অর্থ অস্ত্রেই বাংলাদেশের ঐ পাহাড়ী অঞ্চলের নিরীহ বাসিন্দাদের খুন করে চলেছে। এমনটা বিশ্বাসযোগ্য হবার আরেকটা কারণ হলো, ভারতের অন্নদা-শক্তি-সুনীল বাবুরা ঢাকাই পরিচয়ের নাটাই বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে যখন ৪৭ পূর্ব ভারত প্রতিষ্ঠার কথা বলতে পারেন, তখন ষড়যন্ত্র পটু ওবান বাবুরা একশ্রেণীর চাকমাদের মাথায় ঐ ধ্বংসাত্মক চিন্তা অবশ্যই ঢুকাতে পারেন।[৬৩] পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষভাবে ভারতের বেছে নেয়ার কারণ তিনটি- এক. বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে নিরংকুশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টতা একটি বাধা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে তুলনায় অনুকূল। দুই. সহজ সরল উপজাতি-গোষ্ঠীগুলোর সম্ভাব্য স্পর্শকাতর দিকগুলোকে দাবী বা সমস্যা হিসেবে কাজে লাগানোর সুযোগ। তিন. বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ কৌশলগত এলাকা। যার পশ্চাদভূমি একটি প্রাকৃতিক সমুদ্র বন্দর (চট্টগ্রাম)। এই জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রামকে কুক্ষিগত করার চেষ্টায় সেখানে অবিরত অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখা হয়। [৬৪]

চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্দীপক ভারত অকারণে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। ভারতের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব অনেক। ভারতীয় কর্মকর্তা এবং কাউন্টার ইন সারজেন্সি বিশারদরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশকে ভারতের স্বার্থ, এমনকি আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় হুমকি মনে করেন। মৌসুমি বনভূমির অন্তর্গত পার্বত্য চট্টগ্রাম মাঝারি ধরনের গেরিলা যুদ্ধ চালানোর এবং তাদের অভয়াশ্রমের জন্য আদর্শ স্থানীয় বিধায় পাকিস্তান আমলে ভারতের নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের গোপন ঘাঁটি এখানে গড়ে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু, বলিপাড়া, আলিকদম, দীঘীনালা, মোদক ও থানচিতে মিজো গেরিলাদের ঘাঁটি ছিল। সুতরাং ভারত সরকার পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সব সময়ই ছিল উদ্বিগ্ন।

১৯৭১ সালে সর্বাধিক ভারতীয় সৈন্য মিত্রবাহিনীর ছদ্মাবরণে তৎপর ছিল পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের ঘাঁটি অনুসন্ধান এবং সেগুলো ধ্বংস করার অভিযানে। অপারেশন 'ঈগল' নাম দিয়ে জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে নাগা-মিজোদের গোপন ঘাঁটি তছনছ করে। এ ছাড়া র' (RAW) এর সৃষ্ট মুজিব বাহিনী নাগা-মিজো বিদ্রোহীদের নির্মূলকরণে ভারতীয় বাহিনীকে সহায়তা করে। RAW বুঝে শুনেই মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়কত্ব মরহুম শেখ ফজলুল হক মণিকে প্রদান করে।[৬৫] বাংলাদেশ যেন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে কখনোই ভারতবিরোধী

---

৬৩. আবুল আসাদ, উড়ে আসাদের জুড়ে বসতে দেয়া যায় না, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১।

৬৪. আমির খসরু, প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!! পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।

৬৫. এম. আবদুল হাফিজ, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, অন্য দিগন্ত, মার্চ ২০১০, পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

শিবিরের সাথে হাত মেলাতে না পারে সে জন্য বাংলাদেশের ওপর চাপ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভারত শান্তিবাহিনীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। কারণ ভারত জানত শরণার্থী সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জিইয়ে রাখা যাবে না। সম্প্রতি কলকাতা প্রেসক্লাবে ৩ মার্চ ২০১০ বুধবার 'চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস সাপোর্ট গ্রুপ কলকাতা' নামে একটি সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাঙালিদের কথিত হামলার প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন করে। এ সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবি তরুণ সান্যাল। কলকাতা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনের চারদিকে বুকে ছবি সংবলিত ও শ্লোগানে লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে চাকমা তরুণ-তরুণীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্ল্যাকার্ডে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে লেখা ছিল, শান্তিচুক্তির জন্য আমরা অস্ত্র সমর্পণ করেছি, যদি সেই চুক্তি বাস্তবায়িত না হয়, 'আমরা আবার অস্ত্র ধরতে বাধ্য হব।' এ সংবাদ সম্মেলনের সভাপতি তরুণ সান্যাল বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরমাণু শক্তি তৈরির খনিজ রয়েছে সে জন্য চাকমাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে।[৬৬] উপজাতিদের সাপোর্ট গ্রুপ কলকাতায় কেন বিষয়টি একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেই অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে।[৬৭]

ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির দাবিনামা

ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি এক স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে একটি দাবিনামা পেশ করে। তাদের কয়েকটি দাবি হলোঃ

১. ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জিলার প্রতিটি থানায় দুই-তৃতীয়াংশ উপজাতীয় (জুম্ম) সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবল নিয়োগ করতে হবে;

২. জুম্ম শরণর্থীদের জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে শরণার্থীদের বসতভিটা, বাগান, চাষের জমি, জুম মহল, মন্দিরের জমি, আশ্রমের জমি, পালি কলেজের জমি, শ্মশান ভূমি ও সংরক্ষিত মৌজা বনাঞ্চল অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হোক;

৪. জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত চলমান নিয়মানুসারে নিয়মিত রেশন প্রদান অব্যাহত রাখা হোক;

৫. জুম্ম শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে

৬৬. মোহাম্মদ মাতিন উদ্দিন, এইচ. এম. এরশাদের মন্তব্য নিয়ে কিছু কথা, দৈনিক আমার দেশ, ৯ মার্চ ২০১০, পৃ.৬।

৬৭. উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান, পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও সমসাময়িক ঘটনা বিষয়ে গত ৬ মার্চ ২০১০ 'ঢাকা পোষ্ট' এর গোলটেবিল আলোচনায় বক্তৃতা, দৈনিক সংগ্রাম, ৭ মার্চ ২০১০, পৃ.১।

www.pathagar.com

সমতলের বিভিন্ন জিলা থেকে আনা জমিজমা দখলকারী বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা হোক;

৬. চুক্তি মুতাবেক সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপবিএন ও ভিডিপি ক্যাম্পসহ অপারেশন উপকরণ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক এবং নতুন ক্যাম্প স্থাপনের প্রক্রিয়া বন্ধ করা হোক;

৭. চুক্তি মুতাবেক প্রত্যাগাত শরণার্থীদের কৃষি ঋণ, অন্যান্য ব্যাংক ঋণ, সরকারি সংস্থা থেকে নেয়া ঋণ সুদাসলে মওকুফ করা হোক এবং আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প চালূ ও সহজ শর্তে সুদমুক্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হোক;

৮. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সেটেলার বাঙালিদের দায়ের করা জমি সংক্রান্ত হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করা হোক;

৯. যে সব চাকরিজীবী শরণার্থীকে এখনও পূর্বের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়নি, তাদেরকে অবিলম্বে চাকরিতে পুনর্বহাল ও জ্যেষ্ঠতা প্রদানসহ অন্য সুবিধাদি প্রদান করা হোক। পাশাপাশি শিক্ষিত বেকার জুম্ম শরণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের শর্ত শিথিল করে তিন পার্বত্য জিলা পরিষদ ও পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডে ২০ শতাংশ কোটা দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণ করা হোক;

১০. স্বেচ্ছায় প্রত্যাগত ও ১৯৯৪ সালে প্রত্যাগত ১৭৯৫টি শরণার্থী পরিবারকে তিন হাজার টাকা করে প্রদান করা হোক;

১১. যে সমস্ত পরিবার বসত ভিটা ও জমিজমা ফেরত পায়নি তাদেরকে জমিজমা ফেরত দিয়ে গৃহ নির্মাণ বাবদ ১০ হাজার টাকা এবং কৃষি অনুদান বাবদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হোক;

১২. চুক্তি মুতাবেক সকল ভূমিহীন শরণার্থীকে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা হোক এবং যে সমস্ত পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি তাদেরকে হালের গরু কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হোক;

১৩. বেদখল হওয়া ৯টি মন্দির, ২টি অনাথ আশ্রম, একটি পালি কলেজ ও ২টি টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান ফেরত ও সেগুলি পুন:নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হোক। স্থানান্তরিত ২টি সরকারি বাজার, ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় আগের জায়গায় স্থানান্তর করা হোক এবং অবৈধভাবে স্থাপিত ৫টি বেসরকারি বাজার অবিলম্বে উচ্ছেদ করা হোক;

১৪. প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের সরকার প্রদত্ত রেশনের পরিবহন, ঘাটতি, বিতরণ ও ওঠা নামার বকেয়া খরচের টাকা অবিলম্বে প্রদান করা হোক;

১৫. তালিকা বহির্ভূত এক হাজার একশত তিপ্পান্ন (১১৫৩)টি পরিবারের ন্যায় ৫৫টি পরিবারকে সমানভাবে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হোক;

১৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা

www.pathagar.com

এবং সে তালিকার ভিত্তিতে সকল নির্বাচন করা হোক (যাতে স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য থেকে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা যায়);

১৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হোক এবং উপজাতীয়দের থেকে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অবিলম্বে নিয়োগ করা হোক।[৬৮]

উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপজাতিদের 'আদিবাসী' বানানোর চক্রান্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গত ২৮ জানুয়ারি ২০১০ এক প্রজ্ঞাপনে 'উপজাতীয় সম্প্রদায়কে আদিবাসী অভিহিত করার অপতৎপরতা' প্রসঙ্গে জিলা প্রশাসকের কাছে এক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। প্রেরিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ৪৫টি উপজাতি বাস করে। বাংলাদেশের সংবিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলা পরিষদ আইন, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তিতে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে 'উপজাতি' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও আদিবাসী অভিহিত করা হয়নি। তথাপি সরকারী একাধিক প্রজ্ঞাপনকে অবজ্ঞা করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কতিপয় নেতা ও একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, পাহাড়ে বসবাসরত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এমনকি সাংবাদিকরা ইদানীং এদেরকে উপজাতি না বলে আদিবাসী বলছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করতে প্রজ্ঞাপনে নির্দেশ দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সরকারদলীয় এমপি জনাব আসাদুজ্জামান নূর, মহাজোটের অংশীদার এমপি জনাব রাশেদ খান মেননসহ অনেকেই উপজাতির পরিবর্তে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহারের জন্য রীতিমত দৃঢ় অবস্থানে আছেন। এদের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিরা উপজাতি ও আদিবাসীর পার্থক্য বুঝেন না এটা বিশ্বাস করা যায় না। খোদ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও সরকারের ভেতরে ও বাইরে একটি বিশেষ মহল উপজাতি আদিবাসী বিতর্ক জিইয়ে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করছেন। সরকার ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিজেরাও নিজেদের উপজাতি বা জুম্ম জনগণ মনে করে থাকেন। কিন্তু সমতলের উৎসাহীরা তাদের 'আদিবাসী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। অথচ নৃতাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং অন্যকোন বিচারেই তারা বাংলাদেশের ভূ-পরিমন্ডলের আদিবাসী (Aboriginals) হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন না। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ও আদিবাসী ফোরামের সভাপতি সন্তু লারমা পাহাড়ী জনগণকে 'আদিবাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও তার স্ব-গোত্রীয় নেতারাই এর বিরোধিতা করছেন। পাহাড়ীদের একটি বড় অংশ যারা নিজেদের ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নামে সক্রিয় রেখেছেন তারাও

---

৬৮. উদ্বৃত গৌতম মন্ডল, অশান্তির বেড়াজালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, নিউজ নেটওয়ার্ক, জুলাই ২০০৫, পৃ. ৬২-৬৩।

www.pathagar.com

'আদিবাসী' শব্দটি মেনে নিতে নারাজ। ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসার মতে, পাহাড়ে বসবাসকারীরা পাহাড়ী, তারা আদিবাসী নয়। জে এস এস এর বিদ্রোহী গ্রুপের নেতা ও পাহাড়ীদের অধিকারের প্রশ্নে কট্টরপন্থী বলে পরিচিত সুধা সিন্ধু খীসাও নিজেদের 'আদিবাসী' নয় জুম্ম জনগণ বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির মুখবন্ধে নিজেদেরকে উপজাতি দাবি করেই জে এস এস নেতা সন্তু লারমা পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু বিগত অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে 'আদিবাসী' ইস্যুটি নতুন মাত্রা লাভ করে চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় উপদেষ্টা হওয়ার পর। তারপর কিছু মুখচেনা বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার নেতা-নেত্রী, এনজিও এবং মিডিয়া ইস্যুটিকে নিয়ে মাতামাতি করতে থাকে। অথচ সরকার যৌক্তিক কারনে কোন দিনই উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' বলে উল্লেখ করেনি। উপজাতীয়দেরকে 'আদিবাসী' হিসেবে অভিহিত করার অপতৎপরতায় খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিব্রতবোধ করেন। ইনাম আহমদ চৌধুরীর মতে, পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতিরা কেউই আদিবাসী নন। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে এই এলাকায় এসে বসতি গেড়েছেন। আর সংবিধানেও কাউকে কোন নির্দিষ্ট এলাকার আধিপত্য দিয়ে দেয়ার এখতিয়ার কাউকে দেয়নি।

বিদেশি মহাশক্তিধরদের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে 'আদিবাসী' বানানোর চেষ্টা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এ প্রচেষ্টার সঙ্গে যেমন এদেশে অনেক এনজিও জড়িত, তেমনিভাবে কিছু বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার গ্রুপসহ রাজনৈতিক দলও এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হলে তাদের স্বার্থে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ সহজ হয়ে পড়ে। জানা যায়, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক চার্টারে 'আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় জাতিসংঘ সদস্যভুক্ত যে কোনো দেশে জাতিসংঘ সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে'- এমন ক্লজ আছে। এ দিক থেকে বিচার করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাতকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার নামে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিদেশিদের হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই এদেশে চলছে। শান্তি রক্ষার নামে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনীতে আমাদের সেনাসদস্যদের পাঠিয়ে আমরা যেমন জাতীয় গৌরবের ঢাকঢোল বাজাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসংঘের নেতৃত্বে অন্য কোনো দেশের সৈনিকরা যদি শান্তি রক্ষার নামে এদেশে এসে ঘাঁটি গাড়ে তখন কী আমরা গৌরবের ঢাক-ঢোল বাজাবো? বিষয়টি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাহলে একটা বিষয় পরিষ্কার হবে যে সব ব্যক্তি, এনজিও ও রাজনৈতিক দল এদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহকে আদিবাসী বানানোর চেষ্টা করছে, তারা কার স্বার্থে কাজ করে চলেছে।

বিভিন্ন এনজিও, বিদেশী সংবাদ মাধ্যম, জাতিসংঘের আড়ালে থাকা খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহ এ সকল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। গোপনীয় প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়, ইউএনডিপি, ডানিডা, এডিবিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কোটি ডলার বিনিয়োগ এবং উপজাতীয়দের ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তারা উপজাতীয়দের 'আদিবাসী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এর আগেও পররাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুরূপ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব সম্প্রতি উপজাতি-আদিবাসী বিতর্ক ও নব্য উপনিবেশবাদ শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেন, বিদেশী শক্তির প্রতিভূ 'নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' বলে কুখ্যাত অপতৎপরতাকামী এনজিও চক্র ও খৃস্টান মিশনারী গোষ্ঠী বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতীয় ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনসম্প্রদায়গুলোকে এ দেশের 'আদিবাসী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। উপজাতীয়রা (Tribals) সব সময়ই যে আদিবাসী হবে এমন কথা ঠিক নয়। মতলববাজ এনজিওচক্র তাদের আদিপত্যবাদী বিদেশী প্রভুদের ভূ-রাজনৈতিক নীল-নকশা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নানা শান্তিপ্রিয় নিরীহ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোকে এ দেশের 'আদিবাসী' হিসেবে ঘোষণা করছে, প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের উপজাতীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো এ দেশের আদিবাসী বা ভূমিপুত্র নয়- তার প্রমাণ প্রখ্যাত উপজাতি গবেষক ও নৃতত্ত্ববিদ RHS Huschinson (1906), TH lewin (1869), J.Jaffa(1989), অমরেন্দ লাল খিসা (১৯৯৬) এববং এন আহমেদ (১৯৫৮) প্রমুখের লেখা, গবেষণাপত্র, থিসিস এবং রিপোর্ট বিশ্লেষণে পাওয়া যায়।[৬৯] তারা সবাই এক বাক্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয়দের নিকট অতীতের কয়েক দশক থেকে নিয়ে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে এ দেশে স্থানান্তরিত হয়ে অভিবাসিত হবার যুক্তি-প্রমাণ ও ইতিহাস তুলে ধরেছেন।[৭০]

---

৬৯. RHS Hutchinson, An Account of Chittagong Hill Tracts গ্রন্থটি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। চাকমা জাতির পরিচয় সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিবিধ বিষয়ের উপর এ গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার Capt. T. H. Leara বিরচিত 'The Hill Tracts of chittagong and the Dewllers Therein গ্রন্থটি' ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। J.Jaffa, Chakmas: Victims of Colonialism and Ethro-centric Nationalism, The Main Stress, 28 Oct. 1989; অমরেন্দ্র লাল খিসা, সিফটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয ১৯৯৬; এন. আহমেদ, The Evolution of Bounderies of East Pakistan, Oriental Geographer, Vol.ii, No.4, Dhaka, 1958.

৭০. দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ মে ২০১০, পৃ.১।

www.pathagar.com

স্বাধীন জুমল্যান্ড ও চাকমাল্যান্ড

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমারা হচ্ছে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্ত। সেখানকার উপজাতীয়দের নাম ভাঙ্গিয়ে মূলত: চাকমা উপজাতিভুক্ত কতিপয় বিদেশী এজেন্ট কেবলমাত্র উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য চাকমা প্রভাবিত পৃথক রাজ্য 'জুমল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার বায়না ধরেছে।[৭১] শান্তিবাহিনীর উপরস্থ ও অধীনস্থ সকল সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদীই মুসলিম ও বাংলাভাষীমুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আদতে তাদের স্বাধীন জুম্মল্যান্ড বা চাকমাল্যান্ড গঠনে বদ্ধপরিকর। শান্তিবাহিনীর দাবী অনুযায়ী বাঙালী উচ্ছেদ করতে হবে এবং তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির উপর একচ্ছত্র অধিকার, কর্তৃত্ব ও মালিকানা দিতে হবে। এটি সংবিধান বিরোধী, মৌলিক অধিকার বিরোধী, দেশবাসীর অধিকার হরনের শামিল। ভূমির উপর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের। শান্তিবাহিনী বাঙালীদেরকে নিজ দেশে 'বহিরাগত' 'সেটলার' বলে অভিহিত করে এবং বাঙালীদের বহিস্কারের দাবী করছে এবং বাঙালীদেরকে অত্যাচার, নিপীড়ন, সন্ত্রাস ও হত্যার শিকারে পরিণত করেছে। তারা নিজ দেশে পরবাসী। অথচ তারা রোসাং, আরাকান তথা মায়ানমার বা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, কেউবা আরো দূরের কোন স্থান থেকে এসেছে। তারাই বহিরাগত, অভিবাসী, পরদেশী, তারা এখানকার ভূমিপুত্র বা আদিবাসী নয়। তারা ভারতীয় চাকমাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসছে এবং চাকমা মেজোরিটি তৈরি করে কেবল 'জুমল্যান্ড' নয় বরং বাংলাদেশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পার্শ্ববর্তী সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন 'চাকমা ল্যান্ড' বানিয়ে ফেলার চেষ্টায় রত। বস্তুত: ভারতীয় কর্তৃপক্ষের, গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর এবং ভারতীয় এ্যানালিষ্ট ও পত্র-পত্রিকার ভাষায় 'জুমল্যান্ড' বদলে গিয়ে 'চাকমাল্যান্ড' কথাটি এসে গেছে অনেক ক্ষেত্রে।[৭২] ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী আরো লিখেছেন, চাকমারা বহিরাগত হয়েও সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে নিজেদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র এবং বাস্তবে যারা এদেশবাসী সে বাঙালীদেরকে বহিরাগত বলে ভারতীয় প্রভাবে এবং তাবেদার সরকারের নোংরা সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন করে 'জুমল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার দাবী উঠিয়েছে। এই 'জুম' শব্দটি চাকমাদের ভাষার নয়, এটি কোলদের শব্দ। এছাড়া জুম চাষ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০%-এরও কম। আবার চাকমারা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের অর্ধেকের অর্ধেকেরও কম তথা কেবল দশমিক বাইশ শতাংশ। তারা আরো ১২টি উপজাতির নাম ভাঙ্গিয়ে বাস্তবে তাদের প্রতারিত করে বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক দশমাংশ ভূ-খণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামটি পর্যন্ত চিরতরে মুছে দিয়ে

---

৭১. জয়নাল আবেদীন,পার্বত্য চট্টগ্রাম, স্বরূপ সন্ধান, ২৬ মার্চ ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ-৯।

৭২. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

www.pathagar.com

'জুমল্যান্ড' এবং প্রকৃত প্রস্তাবে 'চাকমাল্যান্ড' কায়েম করতে চায় দেশীয় ষড়যন্ত্রী ও প্রতিবেশী প্রভু রাষ্ট্রের সহায়তায়।[৭৩]

উপজাতীয়দের স্বার্থ, পাহাড়িদের স্বার্থ ইত্যাদির কথা বলে চাকমারা এককভাবে নেতৃত্ব, সুবিধা, অর্থবিত্ত, আখের- সবকিছুই ঘুচিয়ে নিচ্ছে, মাখন সব খেয়ে ফেলছে। স্বাধীন জুমল্যান্ডের দাবী তুলে বাস্তবে তারা চাকমাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দিকে এগুচ্ছে। ০.২২% সামান্য বহিরাগত চাকমাদের জন্য অভূতপূর্ব উন্নয়ন, সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ মর্যাদা, বিশেষ কোটা, প্রতি বাঙালী মুসলমান অপেক্ষা প্রতি উপজাতীয় ব্যক্তি ২১ গুণ বেশি সুবিধা লাভ- এককভাবে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে রিজিওনাল কাউন্সিল, উপজাতীয়দের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে পার্বত্য শাসন, ভূমির উপর সহ অন্যান্য দখলদারির ব্যবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি গমনে বাধা দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনবসতি এলাকা সমূহের ৭০ ভাগই এককভাবে উপজাতিদের দখলে। কেবল অবশিষ্ট ৩০ ভাগে বাঙালীদের সাথে তাদের সহাবস্থান। তাও চাকমারা সহ্য করতে রাজি নয়, যদিও তারা নিজেরাই এ দেশে বহিরাগত।

আলাদা পতাকা ও মানচিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পৃথক পতাকা ব্যবহারের মাধ্যমে হঠাৎ করে পাহাড়িদের আলাদা ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রচারণা শুরু হয়েছে। ইউএনপিও'র ওয়েবসাইটে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের এ পতাকার ছবি দেয়া হয়েছে। প্রতিনিধিত্বহীন জাতি ও জনগোষ্ঠী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে এতে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীন হওয়ার আগে পূর্ব তিমুরও এই সংগঠনের সদস্য ছিল। এতে ১৯৯১ সালের আদমশুমারির বরাত দিয়ে তিন পার্বত্য জিলার ৯ লাখ ৭৪ হাজার ৪৪৫ জনের মধ্যে ৫১.৪৩ শতাংশ পাহাড়ি এবং ৪৮.৬৭ শতাংশ বাঙালি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি মাত্র ৯ শতাংশ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউএনপিও'র ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও অভিবাসী বাঙালিদের সমতলে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ইস্যুটি এখনো নিষ্পত্তি করা হয়নি।[৭৪]

রহস্যময় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে এক রহস্যজনক সংগঠনের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকারের সাথে শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন তদারকির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা হয়। ২০০৮ সালে ড. ফখরুদ্দীনের

---

৭৩. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

৭৪. এবনে গোলাম সামাদ, পাহাড়িরা স্বতন্ত্র জাতি নয়, অন্য দিগন্ত, মার্চ ২০১০, পৃ.৩৩।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এটি পুনর্গঠিত হয়। ২০০৮ সালের ৩১ শে মে ও ১লা জুন ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে বাংলাদেশ ও বাইরের বিভিন্ন দেশের ১২ জনকে এর সদস্য করা হয়। ব্রিটিশ লর্ডসভার সদস্য লর্ড এরিক অ্যাভবারি, বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলাতানা কামাল চক্রবর্তী ও ডেনমার্কের ড. ইদা নিকলেইসেনকে কো-চেয়ার করা হয় কমিশনের। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমিশন পার্বত্য তিন জিলা থেকে সেনা প্রত্যাহার, অভিবাসী বাঙালিদের সরিয়ে এনে সেখানে পাহাড়িদের পুনর্বাসন, চুক্তি অনুযায়ী পাহাড়ি প্রধান স্থানীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও পাহাড়িদের ভূমির মালিকানার বিষয়টি ল্যান্ড কমিশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করার সুপারিশ করে। কমিশন বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসের মতো সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়ার জন্যও সুপারিশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালি বসতি স্থাপনকারীরা সেখান থেকে স্বেচ্ছায় সমতলে চলে আসতে না চাইলে তাদের রেশনসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিতে বলেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন। কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের তাদের সম্মতি নিয়ে সমতলভূমিতে পুনর্বাসনের ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া হাতে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, যেসব বসতি স্থাপনকারী স্বেচ্ছায় সমতলভূমিতে নতুন করে বসতি স্থাপন করতে রাজি হবে, তাদেরকে তিন বছরের জন্য নতুন স্থানে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করা হবে। এর পাশাপাশি তাদেরকে নগদ অর্থসহায়তা, চাকরি, প্রশিক্ষণ ও পরিবহনের সুবিধা দিতে হবে। একই সাথে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের কিংবা নবাগতদের জন্য নতুন কোনো সুযোগ-সুবিধা কিংবা বৈষয়িক প্রণোদনা দেয়া যাবে না। যারা স্বেচ্ছায় সমতল ভূমিতে পুনর্বাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না এবং বর্তমান স্থানে থেকে যেতে চাইবে তাদের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

কমিশন পার্বত্য জোনের বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের জমিকে অবৈধভাবে দখলকৃত বলে উল্লেখ করে বলেছে, ভূমি ল্যান্ড কমিশন এসব জমি 'প্রকৃত' পাহাড়ি মালিকদের ফিরিয়ে দিলে তা 'স্বেচ্ছায়' বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র পুনর্বাসিত হতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে। কমিশন উল্লেখ করেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার ধরন মূলত রাজনৈতিক। তাই এ সমস্যার সামরিক সমাধানের চেয়ে রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য। যথাশিগগির সম্ভব শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। কমিশন বলেছে, উপজাতীয়দের মধ্যে বরাদ্দকৃত ভূমির স্বত্ব রেকর্ড, রিসেটেলমেন্ট ও প্রত্যাবাসিত পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিধি-বিধান বাস্তবায়ন, বাঙালিদের 'অবৈধভাবে' দখল করা ভূমি বাতিলের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং পাহাড়ি লোকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করে অযথা ভূমি অধিগ্রহণসহ বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শান্তিচুক্তিতে প্রস্তাবিত ল্যান্ড কমিশনকে দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। এই ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

সম-অধিকার আন্দোলন অভিযোগ করেছে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল রাঙ্গামাটি জিলার বাঘাইহাটের গঙ্গারামমুখ এলাকায় কিছু সশস্ত্র 'উপজাতীয় সন্ত্রাসী'দের সাথে গোপন বৈঠক করেছে। প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়ি জিলার ইউএনডিপি, ডব্লিউএফপি'র কর্মকর্তাদের সাথেও গোপন সভা করে।

এখনো অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম

নিবিড় পাহাড়, নিশ্চুপ জলাধার আর নির্দোষ প্রাকৃতিক উপস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণে যে বিশাল পার্বত্য অঞ্চল তাকে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ জনপদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির ইতিহাস বেশ দীর্ঘ, মর্মান্তিক এবং রক্তাক্ত। ড. মাহফুজ পারভেজ লিখেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পারতো বাংলাদেশের শান্তির সুইজারল্যান্ড; হয়ে গিয়েছে তীব্র অশান্তির লেবানন। অশান্তি কাউকে রক্ষা করেনি; কোন পক্ষকেই বিজয়ী করেনি। বাড়িয়েছে হিংসা, রক্তপাত ও বিভেদ। সংঘাত নিরসনে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনাও চলেছে পাশাপাশি। এবং সে ধারায় ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।[৭৫] 'শান্তিচুক্তি' শান্তি আনতে পারেনি। 'শান্তিচুক্তি' জন্ম দিয়েছে নতুন উত্তেজনার। সেখানে আজো প্রবাহিত হচ্ছে হিংসার ঝরনাধারা। সেখানে চলছে Internal War। অভ্যন্তরীণ লড়াই, সংঘাত হানাহনির করাল গ্রাসে পার্বত্য ভূমি ও মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত; সমগ্র দেশবাসী উদ্বিগ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যের সংঘাত এখন জাতীয় রাজনীতিকেও গ্রাস করেছে।

পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম আকস্মিকভাবে অশান্ত হয়ে উঠেছে। গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ প্রথম ঘটনা ঘটে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজিলার সাজেক[৭৬] ইউনিয়নের বাঘাইহাটে। সাজেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এল থাঙ্গা পাঙ্খো বলেছেন, বাঘাইহাটের সহিংসতার জন্য দায়ী চাকমা পাহাড়িরা। তারা বিনা উস্কানিতে হামলা করেছে। চাকমারা নিজেদের ঘর নিজেরা পুড়ে দিয়ে বাঙালিদের ওপর দোষ

---

৭৫. ড. মাহফুজ পারভেজ, বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি, সন্দেশ, শাহবাগ, ঢাকা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃ.২০। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম (The Management of Ethic conflicts in South Asia: The case of Chittagong Hill Tracts) বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. আমেনা মহসীন।

৭৬. বাঘাইছড়ি উপজেলার একটি দুর্গম ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনপদের নাম সাজেক। প্রায় ২০ হাজার জনবসতি নিয়ে ৬শ' বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ভারতের মিজোরাম সংলগ্ন এলাকাটি ৩৬নং সাজেক ইউনিয়ন নামে পরিচিত। এটি একটি সাধারণ জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন গহীন পার্বত্য অঞ্চল।

www.pathagar.com

চাপিয়েছে।[৭৭] চাকমারা অতি বাড়াবাড়ি করছে বলেও তার অভিমত।[৭৮] ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০ আবার সংঘর্ষ ঘটে খাগড়াছড়িতে।[৭৯] রক্তক্ষয়ী এসব সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছে- এদের দু'জন বাঙালি। সেনাবাহিনীর একজন সদস্যসহ আহত হয়েছে কয়েকশ'। শত শত বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার দিন রাতে খাগড়াছড়ি শহর ও তার আশপাশের এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়। এরপর অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়। ১৪৪ ধারা তুলে নেয়ার ৫২ ঘন্টা পর পূর্ব শালবনের আদর্শপাড়া গ্রামের চারটি বাঙালি বাড়ি উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। হামলার শিকার বাঙালীরা এখনও হামলা আতংকে ভীত সন্ত্রস্ত। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীও নামানো হয়। হঠাৎ কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে উঠেছে এটা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এ সংঘাতময় জনপদ থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে যে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজেই বুঝা যায়। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার পর সরকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে বিরাজমান বিরোধ, বিশেষত ভূমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ- আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, পাহাড়ি-বাঙালির বিরোধের মূল কারণ যে ভূমির মালিকানা তা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়।

এ ছাড়া পার্বত্য জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) চুক্তি পক্ষ ও চুক্তি বিপক্ষের ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) মধ্যে সংঘাত লেগেই আছে। বর্তমান এ সংঘাত বেড়ে গিয়ে অশান্ত হয়ে উঠেছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম। বিবদমান উপজাতীয় দুই গ্রুপের সদস্যরা আধিপত্য বিস্তার ও একে অন্যকে নির্মূল করতে পরস্পরের ওপর সশস্ত্র হামলা জোরদার করেছে। প্রতিনিয়ত রাঙ্গামাটির কোনো না কোনা গ্রামে দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছেই। পাশাপাশি চাঁদাবাজি, অপহরণ, খুন বেড়ে গেছে। সশস্ত্র এ সংঘাতে হতাহতের প্রকৃত হিসাবও অজানা থেকে যাচ্ছে। গহিন জঙ্গলে বন্দুকযুদ্ধে শত শত রাউন্ড গুলি বিনিময়ে হতাহত হলেও তাদের সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। ঘটনার পর তল্লাশি করে হতাহতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি পাহাড় থেকে সেনাক্যাম্প সরিয়ে নেয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাহাড়ের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সুযোগে অব্যাহত সন্ত্রাস আর খুনাখুনি বাড়ছে। চলছে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া।

---

৭৭. সংসদীয় কমিটির পার্বত্য রিপোর্ট নিয়ে তোলপাড়, দৈনিক নয়াদিগন্ত ১১ মার্চ ২০১০ পৃ.১।

৭৮. দেখুন দৈনিক ইনকিলাব এল থাঙ্গা পাঙ্খোর সাক্ষাৎকার, ৮ মার্চ, ২০১০। মি. পাঙ্খো সাক্ষাৎকারে আরো অনেক তথ্য দিয়েছেন। নিজের নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন; ৪১টি বাঙালী পরিবারের জায়গা দখল করে নিয়েছে চাকমারা, বাঙালিরা কোন ত্রাণ পাচ্ছে না।

৭৯. খাগড়াছড়িতে বাঙালীদের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ৬ জন নাগরিক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে রয়েছে। দেখুন দৈনিক সংগ্রাম, ২৫ মে ২০১০, পৃ.-৪।

www.pathagar.com

সারণী -২

পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় জেএসএস ও ইউপিডিএফ-এর আধিপত্যের তুলনামুলক চিত্র-

সূত্র : গ্লোব নিউজ ম্যাগাজিন, মার্চ ১৬-৩১, ২০০৪

গত ১৫ মে ২০১০ জেএসএস ও ইউপিডিএফ এর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে জুরাছড়িতে দুইজন নিহত ও দুইজন আহত হয়। ১৭মে রাজস্থলী উপজিলায় এ দুই উপজাতি সংগঠনের বন্দুকযুদ্ধে মারা যান একজন ও আহত হয় একজন। ২০ মে জুরাছড়িতে দুই গ্রুপের মধ্যে আবারো বন্দুকযুদ্ধ হয়। এই ঘটনায়ও দুইজন নিহত ও দুইজন আহত হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

এসব ঘটনায় মানুষের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়েছে। লোকজনের চোখে ঘুম নেই। মানুষ বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উপায়

দুর্গম পাহাড়ে সৌন্দর্যের অপার লীলার ভেতরে বেড়ে উঠা বর্তমান পাহাড়ি ও বাঙালি প্রজন্ম পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চান। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারন মানুষ চান শান্তি, তারা সংঘাত-সহিংসতা চান না। চাঁদা না দিয়ে তারা নির্বিচারে জীবন কাটাতে চান। সেই সাথে চান সামনে এগিয়ে যেতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান জরুরী হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ চায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান।

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং এর সামাধানও করতে হবে রাজনৈতিকভাবে। শান্তিচুক্তিকে রাজনৈতিক সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে ধরে নিলেও তা যে কোনো সমাধান দিতে পারেনি, এটাই দেখা যাচ্ছে, এর একটা বড় কারণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হয়েছে নির্বাহী ক্ষমতাবলে, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত থাকলেও তা সংসদে আলোচিত ও অনুমোদিত হয়নি। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে যে সমঝোতা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে উপজাতিগুলোর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেছিলেন বান্দরবন জিলার বোমাং রাজা সহ ১৭ জন বিশিষ্ট নেতা, রাঙ্গামাটি জিলার ২১ জন বিশিষ্ট নেতা আর খাগড়াছড়ি জিলার ২৭ জন বিশিষ্ট নেতা। তখন জনসংহতি সমিতি বা শান্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে কেউ এই সমঝোতা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেনি। বস্তুত এ সময় থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের শুরু। সমঝোতা ঘোষণাপত্র উপেক্ষা করে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা সরকার কেবল সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। তাঁর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের বাঙালি করার চেষ্টা করে যে ভুল করেছিলেন, শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিসহ

www.pathagar.com

অন্যান্য উপজাতিকে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব না দিয়ে কেবল শান্তিবাহিনী প্রভাবিত চাকমাদের সাথে শান্তিচুক্তি করে আরেকটি ভুল করলেন। কারণ এ শান্তি চুক্তি বাঙালিদের কল্যাণে না এসে তাদের যেমন বঞ্চিত করেছে তেমনি বঞ্চিত করেছে

নং	এলাকা	জেএসএস	ইউপিডিএফ	নং	এলাকা	জেএসএস	ইউপিডিএফ
১	রাঙ্গামাটি (সদর)	১০০%	০%	১৪	মাটিরাঙ্গা	৫০%	৫০%
২	বাঘাইছড়ি	৯০%	১০%	১৫	রামগড়	৩০%	৭০%
৩	লংগদু	১০০%	০%	১৬	মানিকছড়ি	৫০%	৫০%
৪	বরকল	৫০%	৫০%	১৭	মহালছড়ি	২০%	৮০%
৫	নানিয়ারচর	১০%	৯০%	১৮	লক্ষ্মিছড়ি	০%	১০০%
৬	কাউখালী	০%	১০০%	১৯	বান্দরবান(সদর)	*	০%
৭	জুরাইছড়ি	১০০%	০%	২০	রোয়াংছড়ি	৯০%	১০%
৮	কাপ্তাই	৫০%	বাঙালিদের আধিপত্য	২১	রুমা	**	**
৯	রাজস্থালি	০%	০%	২২	লামা	*	০%
১০	বিলাইছড়ি	১০০%	০%	২৩	থানচি	**	**
১১	খাগড়াছড়ি (সদর)	৫০%	৫০%	২৪	আলিকদম	*	০%
১২	পানছড়ি	৫০%	৫০%	২৫	নাইক্ষংছড়ি	০% (বাঙালি আধিপত্য)	০%(বাঙালি আধিপত্য)
১৩	দিঘিনালা	২০%	৮০%				

* জেএসএস এর কার্যক্রম সামান্য এবং ইউপিডিএফ-এর কোনই কার্যক্রম নেই।

** এখানে জেএসএস এবং ইউপিডিএফ প্রভাব নেই। এগুলো বাঙালি আধিপত্যপূর্ণ এলাকা।

অন্যান্য উপজাতিদের। সুতরাং শান্তিচুক্তি সংশোধন করে তাতে বাঙালিসহ সব উপজাতিকে আনুপাতিক হারে ক্ষমতার অংশীদার করতে হবে, যাতে তাদের অধিকার নিশ্চিত হয় এবং নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। রাজনৈতিক সমাধান বা শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারণ পাহাড়ী-বাঙ্গালী কারো দ্বিমত নেই।

২. সংবিধান সংশোধন না করায় শান্তি চুক্তি সংবিধানিকভাবে অবৈধ থেকে গেছে। এ চুক্তির মাধ্যমে সংবিধানে বর্ণিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়েছে। শান্তি চুক্তি সাংবিধানিক বৈধতার জন্য এখনো সংসদে উত্থাপিত ও অনুমোদিত হতে পারে। নয়তো আদালতে এর সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নে রায় হলে গোটা চুক্তিই বাতিল হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য শান্তি চুক্তির বৈধতা প্রশ্নে চ্যালেঞ্জ গড়িয়েছে আদালতে। আদালতের রায়ে পুরোটা চুক্তি বাতিল না হলেও এর আওতায় গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সম্পূর্ণ এবং পার্বত্য জিলা পরিষদের কয়েকটি ধারা অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। দেশের

www.pathagar.com

বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে সংবিধানের আওতায় সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। নীতিগত প্রশ্নে ছাড় দেয়ার কোন অবকাশই নেই।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার সম্ভব নয়, যুক্তি সংগতও নয়। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হলে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হবে তাতে পার্বত্য অঞ্চলে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে উগ্র উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। অবৈধ অস্ত্র ও উগ্র উপজাতীয়দের সন্ত্রাস পার্বত্য চট্টগ্রামকে গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ বাঙালি ও উপজাতিরা বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতির জন্য দায়ী নয়।

৫. প্রত্যাহারকৃত সেনাক্যাম্প গুলো পুনঃস্থাপন করতে হবে।

৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন সেখানে সেনাবাহিনী বহাল রাখা ছাড়া উপায় নেই। সেনাবাহিনী না থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ থাকত না।[৮০] সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিয়োজিত। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সেনাবাহিনী এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে যে ভাবে নিয়োজিত রয়েছে, একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও নিয়োজিত রয়েছে এবং থাকবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বও তাদের। সেখানে সেনাবাহিনী না রাখার বাস্তব অর্থ দাঁড়াবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের গোপন তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং উন্নয়ন সংস্থার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের গোপন তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

৮. নতুন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতি গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. দ্রুত ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সবার জন্য ভূমি বন্টন করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালীদের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। একজন উপজাতীয় নেতা এল থাঙ্গা পাঙ্খো বলেছেন বাঙালি ও পাহাড়িরা মিলেমিশেই যুগ যুগ ধরে সেখানে বসবাস করে আসছেন। সমস্যা সেখানে এতদিন হয়নি। এখন হচ্ছে কেন? পাঙ্খোর কথার মধ্যেই সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। আর

---

৮০. গত ১ মার্চ ২০১০ বনানীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব সংহতির বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় পার্টি (জাপা) চেয়ারম্যান এইচ. এম. এরশাদ এ মন্তব্য করেন। দেখুন মোহাম্মদ মতিন উদ্দিন, এইচ এম এরশাদের মন্তব্য নিয়ে কিছু কথা, আমার দেশ ৯ মার্চ ২০১০, পৃ.৬।

www.pathagar.com

তা হচ্ছে 'স্ট্যাটাস কো' অর্থ্যাৎ যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে। কাউকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এটি উপলব্ধি করতে হবে ইতিহাস পাহাড়ী ও বাঙালীদের ভৌগলিক সান্নিধ্যে এনেছে, রাজনৈতিক বিভেদের দেয়াল তুলে অমানবিক বিয়োগান্ত নাটকের অবতারণা কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে না।

১১. পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়েই ঐক্যবদ্ধভাবে মুকাবিলা ও সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। এখানে বসবাস করছে হতভাগ্য ভূমিহীন এক জনগোষ্ঠী, যারা এক টুকরো জমি ও একটু জীবিকার আশায় প্রতিকূল পরিবেশে আস্তানা গড়তে গিয়েছে। এদের নিয়ে 'রাজনীতি'র খেলা করা উচিত হবে না। সংবিধানের ৩৬, ৩৭ ও ৪২ নং ধারা অনুযায়ী একজন বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস, সম্পত্তি অর্জন ও চলাফেরা করার অধিকার রাখেন। তথকথিত গণশুনানির আয়োজন করে বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। গত ৩৮ বৎসরে পাহাড়িরা জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীদের সাংবিধানিকভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তাদের ইচ্ছা ছিল পাহাড়কে বাঙালীমুক্ত করা।

১২. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-সীমানার ভেতরে বসবাসরত বাঙালী জনগোষ্ঠীকে তাদের বর্তমান দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার হাত থেকে মুক্তির জন্য সুযোগ করে দিতে হবে। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালীদের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

১৩. গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত প্রায় ৩০,০০০ বাঙালী পরিবারকে তাদের পুরনো গ্রামে বসতভিটায় ফিরিয়ে নিতে হবে অথবা নতুনভাবে চিহ্নিত খাস জমিতে তাদেরকে বসতি করতে দিতে হবে।

১৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বন্দ্বটা হলো উপজাতীয় বনাম অ-উপজাতীয়, সংঘর্ষের সময় রাজনৈতিক দল বিচার হয় না। সেজন্য দলমত নির্বিশেষে পার্বত্য রাজনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা থীম হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা, বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নেয়া-শরণার্থী হওয়া বন্ধ করা এবং আর্থ-সামাজিকভাবে এমন পরিবেশ বজায় রাখা যাতে করে শান্তি প্রক্রিয়া মাঝে মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেলেও পুনরায় চালু করা যায়।

১৫. পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি গুলোর সামগ্রিক বিকাশ এবং মূল জাতীয় স্রোতধারার সঙ্গে তাদের কার্যকর ও অর্থবহ সংযোগ সাধন করতে হবে।

১৬. পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্তর ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ভূমি জরিপের সাথে এই অঞ্চলে অভিবাসিত বাঙালীদের বর্তমান ও ভবিষ্যত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জরীপে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাসজমি বেরিয়ে আসবে যাতে করে বর্তমানে অবস্থানরত বাঙালিদেরকে খাস জমি দেয়া যাবে। বিবিধ কারণে বাঙালিদের পার্বত্য এলাকার সীমারেখার ভেতরেই খাস জমি দিয়ে বা পুনর্বন্টন

www.pathagar.com

করে এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত বা উপকরণগত সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে উপজাতীয়দের সাথে পাশাপাশি অবস্থানে রাখতে হবে।

১৭. সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড- অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে তুলতে হবে এবং রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে পার্বত্যবাসী উপজাতীয়দের বাংলাদেশের জাতীয় সত্তায় বা রাষ্ট্রীয় সত্তায় সমন্বিত (Integrated) করতে হবে। এটি একান্তভাবে সম্ভব না হলেও তা সম্ভব করার জন্য গঠনমূলক প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে।

১৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ঘরে-বাইরে একশ্রেণীর শক্তি যেভাবে ষড়যন্ত্র করছে, যেভাবে মাথা তুলেছে, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে বিবেচনায় নিতে হবে। একমাত্র কূটনীতিক ও বিদেশের বৈধ কোন প্রতিনিধি ছাড়া খৃস্টান মিশনারী, সাম্রাজ্যবাদের আশির্বাদপুষ্ট এনজিও, বিদেশী সাহায্য সংস্থার সকল বিজাতীয় বিদেশীর পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৯. সীমান্ত পাহারা জোরদার করতে হবে। সুদূর মায়ানমার থেকে রামগড় পর্যন্ত পাহাড়ি সীমান্ত শুধু বিডিআর দ্বারা তদারকি করা সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। চোরাচালান ও দুস্কৃতিকারীদের অনুপ্রবেশ রোধে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য।

উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানকার ইস্যু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এখানে বাংলাদেশের সব নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। এ অঞ্চলে কোন গ্রুপ বা গোষ্ঠীকে একক মনোপলি দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে কোনো বহিঃশক্তির কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা-সংগঠনের হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই। যদি বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে কারো ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতা সরকার কামনা করে, কেবল তখনই নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে এবং যথানিয়মে বাইরের কেউ সহায়তা করতে পারে। কিন্তু তা কিছুতেই বাংলাদেশের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে না। সন্দেহ নেই, গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। সেখানে অনেক রক্ত ঝরেছে। মরেছে অনেক নিরীহ প্রাণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন প্রয়োজন সহাবস্থান, শান্তি ও উন্নয়ন। এই অঞ্চলে আর যেন কোন রক্ত না ঝরে। নিঃশেষ হয় না যেন নিরীহ প্রাণ। সন্তু লারমা অতীতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও, এদেশের মানুষ তাকে একজন পাহাড়ি নেতা হিসেবে সম্মান করে। এ সম্মান তাকে রাখতে হবে। তিনি যদি বর্ণবাদী আচরণ করেন, তাহলে তিনি শুধু বিতর্কিতই হবেন। বিদেশী সহযোগিতার একটি তথাকথিত 'চাকমা রাষ্ট্র (?) প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন তা বাংলাদেশের মানুষ কোনদিনই হতে দেবে না। এ দেশের মানুষ পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে

১৩—

www.pathagar.com

একদিন যুদ্ধ করেছিল। সেই যুদ্ধে চাকমারা এদেশবাসীর সাথে শরীক হয়নি সত্য; কিন্তু যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশটির জন্ম হলো, তার এক দশমাংশ এলাকা আজ বিচ্ছিন্ন (?) হবে যাবে সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হবে, এটা এদেশবাসী কিছুতেই হতে দেবে না। ১৯৯৭ সালের চুক্তির পরও পরিস্থিতির প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটেনি এবং এই ইস্যুর সুষ্ঠু, স্থায়ী ও যথাযথ সুরাহার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ববোধ, আন্তরিক সততা ও সংযম অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইইউসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দাতা ও উন্নয়ন সহযোগীরূপে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু অন্যায় ও অযাচিত নাক গলানোর মাধ্যমে কূটনৈতিক সীমা লঙ্ঘন করার অধিকার নেই কারো। কিভাবে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মাঝে বৈষম্য-বিভ্রান্তি দূর হয়ে পার্বত্যাঞ্চলে প্রকৃত শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেটাই হতে হবে সবার অভীষ্ট। আর বাংলাদেশের উন্নয়ন আর নিরাপত্তার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি অত্যন্ত জরুরী। ■

লেখক-পরিচিতি : জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম– বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং প্রাবন্ধিক।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

'বঙ্গভঙ্গ' না 'বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন?'

ড. মাহফুজ পারভেজ

১.

'বঙ্গভঙ্গ' (১৯০৫) এবং 'বঙ্গভঙ্গ রদ' (১৯১১) শব্দদ্বয় নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ আছে, যথেষ্ট পরিমাণে বিতর্কের সুযোগও রয়েছে। একইভাবে 'বঙ্গভঙ্গ' এবং 'বঙ্গভঙ্গ রদ' নামক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ভিন্ন ভিন্ন পর্যালোচনা এবং উপসংহার প্রণীত হওয়াও খুবই স্বাভাবিক।[১]

এটা ঠিক যে, তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে বঙ্গকে বিভক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বঙ্গ ও আসামকে নিয়ে আলাদা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা তাদের জন্য 'বঙ্গভঙ্গ' বটে।

---

১. কারণ, ১৯০৫ সালে 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি' ভাগ করে যে এলাকা নিয়ে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, সে এলাকা একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে উপস্থাপিত হয় ১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাব'-এ। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গমাতার অখণ্ডতা' রক্ষার নামে প্রবল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে যারা ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেছিল, তাদেরই প্রবল দাবির মুখে ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বি-খণ্ডিত হয়ে ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগের সময়কালের আদলে ঔপনিবেশিক ইংরেজের কবল মুক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে পূর্ণ রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করে। ৪০০ বছর পরে ঢাকা আবার রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়।

www.pathagar.com

যেজন্য তারা ১৯০৫ সালের এ বিভক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি এবং কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের স্বার্থ হানি হয়েছে বিধায় হিন্দু ধর্মাশ্রিত তীব্র ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক-সন্ত্রাসবাদী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করাতে সমর্থ হন। তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল: বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে কলকাতা থেকে ঢাকায় রাজধানী করে নতুন প্রদেশ হতে না দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা থেকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে:

"বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি আজও বাঙালি (সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তা নয়, হিন্দু বাঙালি পড়তে হবে) গর্ব ভরে মনের মধ্যে লালন করে। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গরদ কেন্দ্রিক আন্দোলন শুধুমাত্র প্রতিবাদী ছিল না, এর সঙ্গে ছিল আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী আকাঙ্ক্ষা। এই অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালি পরিচালিত ব্যাঙ্ক, স্বদেশী ভাণ্ডার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসুওরেন্স, বাঙালি পরিচালিত বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। সর্বোপরি বাঙালি পেয়েছিল জাতীয় চেতনা ও জাতীয় বিদ্যালয়। বাংলার শিল্প-সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রভাব অভূতপূর্ব। আবেগ ও মননের যৌথ সন্মিলনে, শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি তা আন্দোলনকে বেগবান করতেও সাহায্য করেছিল। সাহিত্যের প্রতিটি শাখা, গান, নাটক, চিত্রকলার অনন্য সৃষ্টিময়তা দীর্ঘ বিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি সাধনকে প্রভাবিত করেছে, পুষ্ট করেছে।"

অর্থাৎ প্রতিটি কাজই হয়েছে কলকাতাকে ও হিন্দু-বাঙালিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং ঢাকাকে এবং পূর্ববঙ্গে মুসলিম-বাঙালি অধিকারের গলা টিপে ধরবার জন্য।[২]

কিন্তু আজকের বাংলাদেশের দিক থেকে সমগ্র বিষয়টির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে নতুন রাজধানী ও প্রদেশ প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে 'বঙ্গভঙ্গ' বলার যৌক্তিকতা খুব বেশি স্পষ্ট নয়। বরং মধ্যযুগের সুলতানি আমলের সোনারগাঁ এবং মুঘল আমলের ঢাকা থেকে ঔপনিবেশিক ইংরেজরা যে রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে নতুন রাজধানী কলকাতা তৈরি করেছিল, সেটা প্রায় দুই শ বছর পর আবার ঢাকাতেই ফিরে এসেছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যে সময়কালকে বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের নামে কলকাতায় হিন্দু-বাঙালি জাতীয়তাবাদের জঙ্গি ও ধর্মান্ধ-সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও আবেগে ঢেকে রেখেছে, সে সময়কালটিই ঢাকার জন্য রাজধানীর গৌরববহ এবং উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির স্মারকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। অতএব, ঢাকা বা পূর্ব বঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশের দিক থেকে ১৯০৫-১৯১১ সময়কালকে বঙ্গভঙ্গ বলা উচিত, নাকি স্বাধীন বিকাশের পর্যায় বলা ভালো, সেটাও বিবেচনা করে দেখা দরকার।

২. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৬.

www.pathagar.com

কলকাতার জন্য যা বঙ্গভঙ্গ, ঢাকার জন্য সেটা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, জনগণের ক্ষমতা মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসা, যা ছিল কলকাতার ইংরেজ ও তাদের স্থানীয় দোসর-জমিদারদের হাতে বন্দি। বঙ্গভঙ্গ যে আসলে একটি আবেগের ফানুস এবং কলকাতাওয়ালাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার আবেগি-রাজনৈতিক স্লোগান, সে প্রমাণও রয়েছে। যারা ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হল বলে রক্ত ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিল, তারাই ১৯৪৭ সালে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার মাধ্যমে হিন্দুত্বের স্বার্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে কোন কিছুকেই তারা স্বীকারও করলেন না: তারা নিজেদেরকে পরিচিত ও সনাক্ত করলেন প্রথমে হিন্দু এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় হিসাবে। শেষ পর্যন্ত বাংলার অস্তিত্বকে রক্ষা করতে ঢাকাকেই এগিয়ে আসতে হয়, যার ধারাবাহিকতার ফল আজকের বাংলাদেশ। ফলে কলকাতা বা ভারতীয় হিন্দু-বাঙালির কাছে ১৯০৫ সালের ঘটনাবলী তথাকথিত বঙ্গভঙ্গ হলেও বাংলাদেশের জন্য স্বদেশে, স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনই। বস্তুত, ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে বাংলাকে ভাগ করে (যার মধ্যে আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশও যুক্ত ছিল) নতুন প্রদেশ স্থাপনের ঘটনা এবং এর বিরোধিতার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণেই সম্ভব হয়েছিল বাঙালি-মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশ আর মানসিক-রাজনৈতিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঠামোর। ফলে বাংলাদেশ ও এর অন্তর্গত জাতিসত্তার জন্য ১৯০৫ এবং ১৯১১-এর ঘটনাবলী খুবই শিক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গত, 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'বঙ্গভঙ্গ-রদ'-এর মতো একই ধরনের শব্দগত সমস্যা দেখা যায় ১৯৪৭ প্রসঙ্গেও। সাধারণভাবে এবং ব্যাপক ব্যবহারে বলা হয় '১৯৪৭-এর দেশভাগ' শব্দটি। 'দেশভাগ যথাযথ' নাকি ১৯৪৭ সালে দুই'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে 'উপমহাদেশ তথা পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ' বলাটা যৌক্তিক? এখানেও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গটি এসে যায় এবং পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

তার মানে কি, যখন ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা পায়, তখন 'বঙ্গভঙ্গ' হয়ে যায়? আর যখন বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তিকে সরিয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভ হয়, তখন 'দেশভাগ'[৩] হয়ে যায়?

---

৩. দেশভাগও যদি ধরি, তাহতে সেটাও তো ন্যায্যভাবে হয় নি। মুসলমান জনসংখ্যানুপাতে অবিভক্ত বঙ্গের প্রাপ্য অংশ আমরা পাই নি। মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ, মালদহ, আসামের কাছাড়, করিমগঞ্জ, গোয়ালাপাড়া, হাইলাকান্দি আমাদের পাওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল, কলকাতা, যা পূর্ববঙ্গের রক্ত শোষণ করে গড়ে ওঠেছে, তারও অর্ধেক অংশ পাবে ঢাকা বা পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশ। কিন্তু দিল্লিতে র‍্যাডক্লিফ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে পূর্ববঙ্গকে বঞ্চিত করে। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আবুল হাশেম, আমার জীবন ও বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কলকাতা: চিরায়ত, ১৯৮৮.
আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস,

www.pathagar.com

২.

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে তথাকথিত বলে উল্লেখের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তথাকথিত এই জন্য যে, বাংলাকে ভাগ শুধু ১৯০৫ সালেই যে হয়েছে, তা নয়। ১৯০৫ সালের আগেও বাংলা ভেঙে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে। তখন বাংলা বিভক্ত হয় নি? যখন ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন একটি প্রদেশ হল তখন বাংলা বিভক্ত হয়ে গেল? ইতিহাসের দিকে তাকালে এই ফাঁক ও ফাঁকিটুকু ধরা পড়বে।

১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ,উড়িষ্যা ও আসাম 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বছরই আসামকে চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসাবে পৃথক করা হয়। এমন কি, বাংলা ভাষাভাষি সিলেট জিলাকেও আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তখন কিন্তু বাংলার অঙ্গচ্ছেদ ঘটছে মর্মে রাজধানী কলকাতা থেকে টু শব্দটিও উচ্চারিত হয় নি। একই রহস্যজনক নিশ্চুপ দেখতে পাওয়া যায় কলকাতা ও তার বিচক্ষণ অধিবাসীদেরকে ১৯৪৭ সালেও। বরং তখন তাদের কণ্ঠস্বর ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতাত্মক।[৪]

ইতিহাসে ১৮৭৪-এর মতো দেখি যে, ১৮৯৭ সালে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চলও আসামের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে কলকাতা তখনও নিশ্চুপ। এগুলো কোন ভাগ-বিভক্তি-অঙ্গহানি নয়? ভাগটা ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গ, আরো স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের পক্ষে হলেই যত বিপত্তি, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর হট্টগোল!

বস্তুত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াত সমস্যা এবং প্রদেশের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব বাংলার বিস্তৃর্ণ এলাকা দীর্ঘ দিন যাবত অবহেলিত ছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামের জনগণের সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য মূলত প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম

১৯৮৫.

৪. মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল, তখন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার প্রস্তাব করে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে সকল হিন্দু নেতা বাংলাকে ভাগ করার দাবির প্রথম উত্থাপক। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে এ বিভক্তির পক্ষে হিন্দু-বাঙালি নেতৃত্ব সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে দাবিতে তারা অখণ্ড ভারতের প্রস্তাব করে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনে বাধা প্রদান করছিলেন, বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার দাবি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতার নামেই তারা ভারত-বিভক্তি রোধ করতে চেয়েছিলেন; অথচ সেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই তাদেরকে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মতো সঙ্কীর্ণ ও ধর্মান্ধ দাবির পথে টেনে নিয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি প্রচার করা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনীও আরেকটি বিবৃতিতে 'বঙ্গভঙ্গ'-এর দাবি জানান। বিস্তারিত দেখুন, জয়া চ্যাটার্জি, বাংলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও পার্টিশান, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৯.

www.pathagar.com

বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদহ জিলাকে চিফ কমিশনার শাসিত আসামের সঙ্গে যুক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামের একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়।[৫] আর তখনই শুরু হয় বাংলার রাজনীতিতে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাভোগী হিন্দু উচ্চশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ ও সশস্ত্র-সন্ত্রাসবাদী প্রতিরোধ আন্দোলন।[৬]

৩.

মূলত বাংলার পূর্বাঞ্চলের পশ্চাৎমুখীতার সূচনা ঢাকা থেকে বৃহৎ বঙ্গের কেন্দ্রীয় রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই হয়েছিল। ১৭০০ থেকে ১৭২৭ পর্যন্ত বাংলার দেওয়ান এবং পরে দেওয়ান ও সুবাদার ছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি ঢাকা থেকে নতুন স্থাপিত শহর মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ সমূহের মধ্যে একটি ছিল--"প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মুর্শিদাবাদের তুলনায় ঢাকা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল না এবং মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার কমে যাওয়ায় প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে ঢাকার গুরুত্ব অনেক কমে যায়।"[৭] এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয় এবং এটাই রাজধানী সরানোর প্রধান কারণ ছিল না। কারণ সুবেদার মুর্শিদ কুলি খান ক্রমশ নিজের ক্ষমতা দৃঢ় করছিলেন এবং দিল্লির দুর্বল কর্তৃত্বের কারণে নিজেকে স্বাধীন নৃপতিতে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিলেন। যে কারণে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় একটি নতুন শক্তিকেন্দ্র ও রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। যারই বহিঃপ্রকাশে ঢাকা থেকে সরে আসা এবং মুর্শিদাবাদের জন্ম। এর প্রমাণ হলো এটাই যে:

> "মুর্শিদ কুলি খাঁন তাঁর সঙ্গে ঢাকার সমস্ত উচ্চ পদস্থ রাজস্ব কর্মচারী, সম্পদশালী ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদেরকেও নিয়ে আসেন এবং তাঁরা স্থায়ীভাবে মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপন করেন। বহু সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মচারী, অফিসার, কেরানী, পিয়ন ও অন্যান্য সহকারীসহ সেক্রেটারিয়েট স্থানান্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজধানী (তথা ক্ষমতা কেন্দ্র) পরিবর্তন ভূম্যাধিকারী, ব্যবসায়ী ও রাজধানীর উপর নির্ভরশীল সব শ্রেণীকে এ অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদমুখী করে তোলে। (পরবর্তীতে) ইংরেজ কোম্পানির অধীনে

---

৫. S. Ahmad, Muslim Community in Bengal 1884-1912, S. Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, K. K. Aziz, Britain and Muslim India, N. Ahmad, An Economic Geography of East Pakistan.

৬. বিস্তারিত জানতে, দেখুন,
অমর দত্ত, উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, কলকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৪.
মাহফুজ পারভেজ, "বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাস: কতিপয় ঐতিহাসিক সূত্র", সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা: বিআইসি, ২০০৯.

৭. A. Karim, Dacca the Mughal Capital.

www.pathagar.com

কলকাতায় রাজধানী স্থাপন ও পরবর্তীকালে কলকাতাকেন্দ্রিক অগ্রগতি হওয়ায় বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জিলাগুলো অধিকতর অবহেলিত হতে থাকে।"[৮]

পরবর্তীতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প-অর্থনীতির শ্বাস নিঙড়ে, কোটি কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর কঙ্কাল-করোটি দিয়ে পত্তন করল কৃত্রিম শহর কলকাতা। ইংরেজ বণিক জব চার্নক তৃতীয়বার সুতানুটীর ঘাটে অবতরণ করেন ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট। এই জায়গাটি কৌশলগত কারণে আগেই তার খুব পছন্দ হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র ঢাকার সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ আজিমুদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে স্থানীয় সাবর্ণ চৌধুরীর কাছ থেকে সুতানটী-কলকাতা-গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ১৩০০ টাকার বিনিময়ে ইজারা নেয়। ইজারা লাভের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ গড়ে তোলে। এ সম্পর্কে নারায়ণ দত্ত লিখেছেন:

> "জন্মের সেই পরম লগ্নেই কলকাতার অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির মানুষ এক অসুস্থ খেলায় মেতেছিল। তাতে স্বার্থবুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, দুর্নীতিই একমাত্র নীতি, ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফিসানিই একমাত্র আলাপের ভাষা।"[৯]

নতুন পরিস্থিতিতে ঢাকা যখন মৃত্যুর পথে আর মুর্শিদাবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজছে, তখন অতি সন্তর্পণে কলকাতায় বসে ইংরেজরা নিজেদের প্রস্তুত করতে থাকে এবং তাদের স্থানীয় দোসর হিন্দুদের[১০] নিয়ে পাকাপোক্ত শাসন-শোষণ পরিচালনা করতে শুরু করে। শোষক শ্রেণী বাংলার তাঁত ও বস্ত্র শিল্প ধ্বংস করে। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে দেয়। কলকাতার আশেপাশে কলকারখানা আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পূর্ববঙ্গকে শোষণ করে। পরে এখানে ঘাঁটি তৈরি করে জমিদারগণ, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মাধ্যমে ইংরেজদের কাছ থেকে ক্ষমতার ভাগ পায়। পূর্ববঙ্গের ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করে কলকাতায় বিলাসে ভাসানো হয়। তৈরি হয় তাবেদার উকিল, কেরানিসহ হিন্দু মধবিত্ত 'বাবু বাঙালি' শ্রেণী। প্রতিষ্ঠা পায় স্কুল, কলেজ, পত্রিকা, সমিতি। কলকাতাকে তাবেদার ব্যক্তিবর্গ আর শোষনের উপযুক্ত

---

৮. K.M. Mohsin, A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765-93.

৯. নারায়ণ দত্ত, জন কোম্পানির বাঙালি কর্মচারি, কলকাতা।

১০. বিমলানন্দ শাসমল লিখেন, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য করতেই এসেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। এতে এক শ্রেণীর হিন্দুদের ও বিশেষত বাঙালি-হিন্দুদের উৎসাহ, প্ররোচনা এবং সক্রিয় সাহায্য ছিল সবচেয়ে বেশি। যে মুসলমান প্রভুত্ব হিন্দুরা নিজেদের আয়াসে ধ্বংস করতে পারেনি, ইংরেজের সাহায্যে এবং বুদ্ধিতে তারা সেই উদ্দেশ্যে সফল হলেন। ধীরে ধীরে মুসলমান প্রভুত্ব লোপ পেল। ইংরেজ হয়ে উঠল দেশের প্রভু।" বিস্তারিত দেখুন,
বিমলানন্দ শাসমল, ভারত কী করে ভাগ হলো, কলকাতা: হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, ১৯৯১, পৃ. ১৬-৭.

www.pathagar.com

সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করা হয় বাংলাকে চুষে খাওয়ার জন্য এবং ঢাকাকেন্দ্রিক আদি ও অকৃত্রিম বাংলার মূল শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিবাদের ক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য। এহেন কলকাতাকে ইংরেজ ও হিন্দুরা শোষনের ঘাঁটি হিসাবে তৈরি করে, যা পরবর্তীতে বাংলার অন্যান্য অংশের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা পর্যায়েও এই শহর ও শহরবাসীর ভূমিকা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কলকাতা সর্বশক্তি নিয়ে ইংরেজের পক্ষে দাঁড়ায়।[১১] পরবর্তীতেও এ চরিত্র অক্ষুণ্ন থাকে। বিশেষত ১৯০৫-১৯১১ এবং ১৯৪৭ সালের ভূমিকা অত্যন্ত কলঙ্কজনক। কলঙ্ক শুধু রাজনৈতিকই নয়--ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কলকাতার মতো বিশ্বের অন্য কোন শহরে এত নির্মম রক্তপাত, দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডসহ মানবতার অপমান হয়নি।

৪.

ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে বলা যায় যে, সুলতানি ও মুঘল আমলের রাজধানী ও তাবৎ বঙ্গের শক্তিকেন্দ্র পূর্ববঙ্গ তথা ঢাকা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলে এসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে হয়ে যায় দুর্বল, অদক্ষ এবং সুপরিকল্পিতভাবেই অকার্যকর ও অসক্রিয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ। একজন বিশিষ্ট গবেষক দেখতে পান যে:

> "জনকল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো তা ছিল বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা নিতান্তই অপ্রতুল। এমনকি, এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান সমস্যাকেও উপেক্ষা করা হতো--শিক্ষা ছিল অবহেলিত, যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষকরা সাধারণত কলকাতায় বসবাসকারী জমিদার এবং তাদের এজেন্ট ও কর্মচারীদের হাতে অত্যাচারিত হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও এ অঞ্চল দারুনভাবে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের কোন উন্নতি না হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার বড় বড় নদীগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি। অথচ গঙ্গা অববাহিকার সঙ্গে উত্তর ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এবং কলকাতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমের পশ্চাৎভূমির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।"[১২]

---

১১. বিস্তারিত জানতে, দেখুন,
মাহফুজ পারভেজ, "১৮৫৭: সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম", সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বিআইইসি, ২০১০.

১২. পূর্ব বাংলার অবহেলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, A. R. Mallick, "The Muslim and the Partition of Bengal", in History of Freedom Movement, Part-3.

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলা তথা ঢাকার পশ্চাৎপদতা আর অবহেলার মুখে অচিরেই কলকাতা ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রত্যাশা এবং কলকাতার নব্যশিক্ষিত-ইংরেজভক্ত-হিন্দু-বাঙালিদের[১৩] যৌথ উদ্যোগে উপমহাদেশের ব্রিটিশ সংস্কৃতি, আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারের জন্য একটি অগ্রভূমিতে পরিণত হয়। ইংরেজ প্রণীত নতুন প্রশাসন ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হন, তারা হল কলকাতাকেন্দ্রিক-নব্যশিক্ষিত-ইংরেজভক্ত-হিন্দু-বাঙালি, কলকাতার ব্যবসায়ী মহল এবং অধিকাংশই ইংরেজ কোম্পানির সমর্থনপুষ্ট। বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জণ শুরু থেকেই এরা নতুন শাসকদের নিঃশর্ত সমর্থন ও আনুগত্য করার মাধ্যমে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে একটি অধিক প্রভাবশালী গ্রুপ হিসাবে গণ্য করা হয়। এরা অর্থনীতি ছাড়াও কংগ্রেস রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদকে সম্প্রসারিত করে।[১৪]

ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের অবক্ষয়ের চিত্রটি হাল আমলের গবেষণাতেও ধরা পড়েছে। একজন বিদেশী গবেষক জানাচ্ছেন:

> "Colonial Kolkata was more than Bengal's prime administrative and cultural city. It also emerged as its commercial and economic hub. Valuable cash crops such as opium (for the Chinese market) and indigo and tea (for the European market) were transshipped in its ports, and jute from the field of eastern Bengal was processed in its many jute factories before being exported."[১৫]

ঢাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও গুরুত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের চিত্রও গবেষকরা উপস্থাপন করেছেন:

> "At the same time, however, many industrial centers in eastern Bengal declined or stagnated. the most dramatic example was Dhaka, which, till the early eighteenth

---

১৩. এরা পলাশী বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা যে কোন ইরেজবিরোধী স্বাধীকার আন্দোলনের সময় প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা ও আনুগত্যের নির্লজ্জ নমুনা প্রদর্শন করে। এদের কার্যক্রম জানতে, পড়ুন, মাহফুজ পারভেজের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭) সংক্রান্ত প্রবন্ধ, সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

১৪. J. Long, Adam's Report on Vernacular Education in Bengal, Behar (1835, 1836 and 1838).

১৫. Willem Van Schendel, A History of Bangladesh, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.65.

www.pathagar.com

century, had been the capital of Bengal and, till the British take-over, a major textile-exporting city. By 1800, however, British commercial policies and the rise of Kolkata had led to a sharp decline."[১৬]

বিদ্যমান শোষণ ও অবহেলায় ঢাকা কিভাবে মানবশূন্য হয়ে যায়, তার বিবরণ বড়ই মর্মান্তিক:

"Dhaka's exports of fine textile had halved and would soon disappear; its population had shrunk to about 200,000 and would dwindle to about 50,000 in the 1840s, Dhaka's lowest point."[১৭]

Willem Van Schendel, *A History of Bangladesh* গ্রন্থে আরো জানাচ্ছেন যে, ঢাকা ব্রিটিশ আমলে জনশূন্য বিরান শহর থেকে আবার জমজমাট হয় তথাকথিত বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে এবং এর ক্ষমতা পুরোপুরি ফিরে পায় ১৯৭০-এর দিকে:

"After the Dhaka began to recover gradually, mainly as a result of the jute trade and administrative expansion, but it did not recover the population level of 1800 till the 1930s and did not regain its industrial power till the 1970s."[১৮]

৫.

বাস্তবতা যদিও দাবি করছিল যে, একটি মুসলিম-বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করে পূর্ববঙ্গ ও ঢাকার ঐতিহাসিক অবস্থান ফিরিয়ে দেওয়ার এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দু প্রভাব থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ঢাকা-পূর্ববঙ্গ ও এ অঞ্চলের মানুষদের রক্ষা করার। কিন্তু এমন মহতী উদ্যোগ নেওয়া ঔপনিবেশিক শোষক ইংরেজদের চিন্তা ও কাজে স্থান পায়নি। তারা যা করেছে, তা তাদের প্রশাসন ও শোষণের প্রয়োজনে। কিন্তু এহেন প্রশাসনিক বিন্যাসে ঢাকা, পূর্ববঙ্গ এবং স্থানীয় জনগণ কিছু কাঠামোগত ও শাসন ও তৎসংশ্লিষ্ট সুবিধার অধিকারী হওয়ায় সেটাও

---

১৬. Iftikhar-ul-Awwal, "State of Indigenous Industries", in Sirajul Islam (ed.), History of Bangladesh 1704-1971. Vol.II: Economic History, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

১৭. Ahmed, Dhaka: Recalling the Forgotten City, Dhaka: Bangla Academy, 1993.

১৮. Willem Van Schendel, A History of Bangladesh, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.66.

www.pathagar.com

কলকাতা আর সেখানকার হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদীগণ মেনে নিতে পারেনি। বরং তীব্র রক্তাক্ত, ধর্মান্ধ, সহিংস আন্দোলন আর বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই-এর মাধ্যমে তারা সেটাকে বানচাল করে দেয়। অতএব এ পর্যায়ে আমাদের দেখা দরকারঃ ক) প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশের পটভূমি ও রূপরেখাটি কেমন ছিল; আর খ) ঢাকা ও পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠনকে 'বঙ্গভঙ্গ' নাম দিয়ে কলকাতার হিন্দু বাঙালি শ্রেণীর আন্দোলন ও সন্ত্রাসের স্বরূপ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল।

(ক)

১৮৬৬-এর উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ মুকাবিলায় ব্যর্থতা থেকে সাধারণত এই রাজনৈতিক কাহিনীর সূত্রপাত ধরা হয়। বঙ্গদেশ ছাড়াও তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম। দুর্ভিক্ষের মতো জরুরি অবস্থা সামলানো এত বড় একটা অঞ্চলের পক্ষে প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। এই যুক্তিতে স্যার স্টাফোর্ড নর্থকোট ১৮৬৮ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিশাল আয়তনের দিকে সরকারের দৃষ্ট আকর্ষণ করেন। ১৮৭৪ সালে আসামকে একটি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসাবে তৈরি করা হয়, যার সঙ্গে বাংলাভাষী সিলেট অঞ্চলকেও জুড়ে দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা (কুমিল্লাসহ পার্বত্য ত্রিপুরা) নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম বিভাগকেও আসামের সঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব নিয়েও নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে কথা হয় । ১৮৯৬ সালে আসামের চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাকেও আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা তোলেন। পরবর্তী চিফ কমিশনার স্যার হেনরি কটন পূর্ববর্তী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং শুধু লুসাই পাহাড়কে আসামের অন্তর্গত করার পক্ষে মত দেন। ১৮৯৭ সালের ২৯ এপ্রিল ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হয় যে, তখনকার মতো শুধুমাত্র দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চল আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৯] বাংলার ভাগাভাগি নিয়ে কলকাতা কোন উদ্বেগ প্রকাশ করেনি এবং শান্তিপূর্ণভাবেই সবকিছু সম্পন্ন হয়।

এর পরের পর্যায়ের শুরু ১৯০১ সালে। এবারের প্রশ্ন সম্বলপুর নিয়ে। মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার সম্বলপুর সমেত উড়িষ্যাকে বঙ্গ থেকে সরিয়ে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। ১৯০৩ সালের ২৮ মার্চ ফ্রেজার ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব বাংলার লাট লর্ড কার্জন[২০] গ্রহণ করেন এবং ১৯০৩ সালের ভাইসরয়ের মিনিটে (আলোচ্যসূচিতে) তা অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ভিত্তিতে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত সচিব এইচ.এইচ. রিজলে বাংলা সরকারের প্রধান সচিবকে এক চিঠিতে ঢাকা,

---

১৯. বিভিন্ন সময়ের নানামুখী প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে দেখুন, জয়া চ্যাটার্জি, বাংলা ভাগ হলঃ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও পার্টিশান, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৯.

২০. ১৮৯৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রশাসনিক যোগ্যতার প্রতীক লর্ড কার্জন ভারতের ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয়ের পদে সমাসীন হন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন। এই অবস্থায় প্রদত্ত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব প্রসঙ্গে সরেজমিনে মতবিনিময়ের জন্য ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করেন। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আর ২০ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে নবতর প্রসাশনিক বিন্যাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন এবং ব্যাপক মত বিনিময় করেন। তারপর তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চতর পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করেন। পুরো পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে কার্জন ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সচিবকে প্রদেশের নতুন বিন্যাস সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠান। ৯ জুন এক বার্তা মারফত ভারত সচিব এ ব্যাপারে সরকারের সম্মতির কথা জানান। ১৯ জুলাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ ও আসাম নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নবতর প্রাদেশিক কাঠামোর কথা জানানো হয়। ঢাকা এই নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় আর চট্টগ্রাম দ্বিতীয় সদর দফতর। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, যার লোকসংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ, তন্মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ মুসলমান আর এক কোটি কুড়ি লক্ষ হিন্দু। এখানে একটি আইন পরিষদ এবং একটি রাজস্ব বোর্ড থাকবে। এ পুনর্বিন্যাসে সমগ্র চা শিল্প এলাকা, পাট, ধানসহ কৃষি উৎপাদনের বিশাল অঞ্চল নতুন প্রদেশভুক্ত হয়।[২১]

(খ)

ঢাকা ও পূর্ববঙ্গ যখন একটি নতুন প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এবং বিকেন্দ্রিকৃত সুবিধার মধ্যে কাজ করার জন্য তৈরি, তখন কলকাতায় অঙ্গহানির আর্তনাদ শোনা যায়। এটা হল নতুন, প্রগতি আর আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার উজ্জ্বল নমুনা। কার্জন যখন বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রশাসনিক বিষয়ে মানুষের সঙ্গে মত-বিনিময় ও সভা-সমাবেশ করছেন, তখনই কলকাতার পত্র-পত্রিকায় তীব্র বিরোধিতার সূচনা করেন হিন্দু-বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ, যাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু ও মুসলিম--উভয় বাঙালি মহলে সমাদৃত, যদিও তাদের তৎকালীন অবস্থান সমগ্রকে নয় নিজস্ব ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল[২২] ক্রমে ক্রমে আন্দোলন তীব্র সশস্ত্র পথে এবং হিন্দু ধর্মীয়

---

২১. A.R. Mollick.

২২. এই প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক খোদ রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেন। এছাড়া যারা চরম সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করে ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ স্থাপনের বিরোধিতায় লিপ্ত হন, তারা হলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তার 'বেঙ্গলি' পত্রিকা এক্ষেত্রে তীব্র ভূমিকা পালন করে), মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ সেন, আনন্দমোহন বসু। যারা হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও ভারতের জাগৃতির জন্য স্বসমাজে নন্দিত। তাদের দর্শনে বাঙালিত্ব বলতে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বের সংমিশ্রণ বুঝানো হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথের নিজের লেখা A Nation in the Making এবং

www.pathagar.com

উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজ স্মরণকালে সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং বাংলা তথা ভারতে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির উদ্ভব ঘটায়।[২৩] একজন ইতিহাসকার জানাচ্ছেন যে:

> "পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ কংগ্রেসের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ (বঙ্গভঙ্গের বদলে আসলে পাঠ করা উচিত 'ঢাকায় নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা') রহিত করার এক সর্বাত্মক আন্দোলনে এগিয়ে আসে। বঙ্গভঙ্গ প্রতিহত করতে গিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের (হিন্দু জঙ্গিবাদ[২৪]) সূত্রপাত হয়। নবগঠিত পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, এ আশঙ্কায় কলকাতার হিন্দু সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা বিশ্বাস করে যে, শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের তড়িৎ উন্নতিতে বাধা প্রদান করার জন্য সরকার পূর্ববঙ্গে মুসলিম ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভার সভাপতি জমিদার মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বলেন, 'নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। হিন্দুরা স্বদেশেই আগন্তুক হবে। এর সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ভীত এবং স্বজাতীয়দের ভবিষ্যতের চিন্তায় মুহ্যমান।' এ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যারিস্টার, উকিল, ব্যবসায়ী; আরো ছিলেন কেরানি, স্কুল শিক্ষক, বড় বাজারের মাড়োয়াড়ি, চাঁদনিচকের দোকানদার–সবাই হিন্দু।"[২৫]

কলকাতা থেকে কেন তারা (উপরের উদ্ধৃতিতে তারা কারা, সেই পরিচয় সুস্পষ্ট) একাট্টা হয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশের বিরোধিতায় কোমর বেধে নেমে পড়ে, সেটার অনেক কারণ রয়েছে। প্রধান কারণগুলো হলো:

- কলকাতার জমিদারদের স্বার্থে আঘাত, কারণ তারা এই শহরে বসে পূর্ববঙ্গে জমিদারির খাজনা আদায় ও নানাবিধ শোষণে মত্ত ছিল।
- কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার নষ্ট হওয়া। অর্থাৎ কলকাতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নতুন রাজধানী ঢাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজারের সম্প্রসারণ ও বিকাশের কারণে কলকাতার হিন্দু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী মহলের ভীতি।
- নতুন প্রদেশে কোর্ট-কাচারি চলে যাবে, তাই কলকাতার হিন্দু আইনজীবী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা।

সম্পাদিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকার রচনাসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

২৩. বিস্তারিত দেখুন, আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রীক শতবর্ষের রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ঢাকা: কথামেলা, ২০০৮.

২৪. অমর দত্ত, ঊনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, কলকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৪.

২৫. S. Ahnad, p. 246.

www.pathagar.com

- হিন্দু মালিক ও সাংবাদিকগণ পত্রিকার বাজার ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য হারাবে ঢাকার কাছে। ফলে তারাও বিরোধিতায় লিপ্ত।
- ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের স্বতন্ত্র বিকাশ হলে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় তাদের বিরোধিতা।
- নতুন প্রদেশে বঞ্চিত মুসলমান কৃষক-প্রজারা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেইজন্য বাধা প্রদান।

কলকাতার হিন্দু স্বার্থবাদী গোষ্ঠী প্রতিরোধের স্বরূপ ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে একজন গবেষক জানাচ্ছেন যে:

> "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন এই আন্দোলনকে উৎসাহ যোগানোর জন্য এবং বাংলাভাষাভাষীদের একতাবদ্ধ করে বঙ্গভঙ্গ রহিত করার জন্য তাঁর বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা' রচনা করেন। গানটি কোলকাতা টাউন হলের জনসভায় ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট প্রথমবারের মতো গাওয়া হয়।[২৬]

রবি ঠাকুর এ সময় নতুন প্রদেশ ঠেকানোর জন্য আয়োজিত অন্তত দুটি জনসভায় খোদ সভাপতিত্ব করেন। এসব সভায় ঢাকাকেন্দ্রিক 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ কার্যকর করার দিন, অর্থাৎ ১৬ অক্টোবরকে 'রাখিবন্ধন' দিবসরূপে ঘোষণা করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর 'মহালয়া'-এর দিনে কলকাতা শহরের কালিঘাটের বিখ্যাত কালিমন্দিরে হিন্দুরা বাংলাকে ভাগ করার কারণে (ঢাকায় নতুন প্রদেশ গড়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে) ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার 'রক্ত শপথ' নেয়।[২৭] পুরো পরিস্থিতিটি বিশ্লেষণ করে একজন বিশিষ্ট গবেষক, যিনি নিজে ধর্মনিরপেক্ষ ও কমিউনিস্টও বটে, লিখছেন:

> "উচ্চবর্ণভুক্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর (কলকাতার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়) নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও 'স্বদেশী'[২৮] ধর্মীয় চরিত্র আন্দোলনের ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুঙ্কারে পরিণত হয়েছিল। ভদ্রলোক শ্রেণীর শক্তিপ্রতীক ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ স্বদেশীকে হিংস্রতা অবলম্বনে সাহায্য করেছিল, সন্দেহ নেই।"[২৯]

---

২৬. কাজী আনওয়ারুল হক, তিন পতাকার তলে, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮.

২৭. বিস্তারিত দেখুন, আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রীক শতবর্ষের রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ঢাকা: কথামেলা, ২০০৮.

২৮. বিদেশী পণ্য বর্জন এবং হিন্দুত্বের আদর্শে সংগ্রামের শপথ ছিল স্বদেশীদের মন্ত্র। বিস্তারিত দেখুন, আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রীক শতবর্ষের রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ঢাকা: কথামেলা, ২০০৮.

২৯. আসহাবুর রহমান, "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভদ্রলোক শ্রেণীর ভূমিকা". বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১.

www.pathagar.com

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ কিরূপ চরম অবস্থান গ্রহণ করেছিল ঢাকাতে নতুন প্রদেশ স্থাপন করতে না-দেওয়ার কাজে, সে সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য:

> "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরেই চরমপন্থীদের প্রাধান্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ১৮৯৭ সালে মারাঠা নেতা তিলক আয়োজিত 'শিবাজি উৎসব'-এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ তথা কোলকাতায় 'শিবাজি উৎসব' শুরু করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৯০৪ সালে। ১৯০৬ সালে কলকাতায় 'শিবাজি উৎসব'-এর আয়োজন করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই উৎসবে অন্যতম অঙ্গ ছিল 'ভবানী পূজা'। 'শিবাজি উৎসব' ও 'ভবানী পূজা' উপলক্ষে মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জেকে কলকাতায় আনা হয়।[৩০] লোকমান্য তিলক এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিলক একদিন ত্রিশ হাজার লোক নিয়ে গঙ্গাস্নানে যান, সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিল একখানি ভারতমাতার (বঙ্গমাতা বা বাংলা মায়ের নয়!) ছবি। বস্তুত এই আন্দোলনের নেতা তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধবদের জাতীয়তাবোধ পৌরানিক হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই পথ বঙ্কিম প্রদর্শিত ও অনুপ্রাণিত। অরবিন্দ ও তার দলের জাতীয়তার মূলে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভাবনাই প্রধান। তাই 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'স্বদেশী আন্দোলন', 'শিবাজি উৎসব' বা 'ভবানী পূজা'র রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এ কারণেই বাংলার মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গ্রহণ করতে পারেনি।...প্রতিক্রিয়ার শেষ এখানেই হয়নি, ১৯০৭ সালেই বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। পূর্ব বাংলার নানা স্থানে, যেমন জামালপুর, কুমিল্লা, পাবনায় দাঙ্গা হয়। ১৯০৭ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা 'অনুশীলন সমিতি' ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে। আর এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজবিরোধী ছিল না, তারা মুসলিম বিরোধীও ছিল।"[৩১]

৬.

অথচ নতুন প্রদেশ মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। মুঘল রাজধানী ঢাকা নিজের লুপ্ত গৌরব ফিরে পায় এবং দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রতি ক্ষেত্রেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৩২]

নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেনেন্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সচেতন ছিলেন যে,

---

৩০. এইসব আন্দোলনের দর্শন বাঙালিত্ব ছিল না, ছিল হিন্দুত্ব। দার্শনিক নেতারাও বাঙালি ছিলেন না, ছিলেন বিশিষ্ট ভারতীয় হিন্দু। বঙ্গভঙ্গরদ করার জন্য বাঙালি হিন্দুদের হাতে বাঙালিত্বের কোন তত্ত্ব ছিল না; ছিল ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বের ধ্বজা।

৩১. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮১.

৩২. Bradley Birt, Dacca: Romance of an Eastern Capital, p. 21.

www.pathagar.com

মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং সরকারি চাকুরিতে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। অতএব নতুন প্রদেশের উন্নয়নের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নবান হন। তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সড়ক পথের উন্নতি সাধনের জন্য এক বছরের মধ্যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে স্থানীয় বণিক ও বাণিজ্যিক পণ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নৌ-পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। গ্রামের সঙ্গে শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের সংযোগের জন্য পুরাতন রাস্তাসমূহের সংস্কার এবং নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।[৩৩]

নতুন প্রদেশের মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার সাধন করা হয়। মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারে মঞ্জুরীকৃত বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়--এতে অল্পকালের মধ্যেই স্কুল কলেজের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যায় এবং বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্যও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসাবে বেশি সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক ও স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।[৩৪]

মাত্র ছয় বৎসর (১৯০৫-১১) অসম্ভব কিছু সাধন করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু এ অল্প সময়েই যা কিছু করা সম্ভব হয়েছিল, সেটা মূল্যায়ন করে এবং যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতেই নতুন প্রদেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।[৩৫]

১৯০৫ থেকে ১৯১১ মাত্র ৫-৬ বছর সময়কালে রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশের যে ব্যাপক এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয় উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তা রাজধানী-কলকাতার অধীনে ইংরেজ শাসনের ১৭৫৭ থেকে ১৯০৪ সাল এবং ১৯১২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কয়েক শ বছরের কাল-পর্যায়ে ভাবনাতীত ছিল। এর কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে:

- **প্রোভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন:** ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর প্রদেশের প্রথম দিনেই জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সংস্থাটি গঠিত হয় নথব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক সভার মাধ্যমে।

---

৩৩. S. Ahmad, ibid. p. 399-410.
৩৪. ibid
৩৫. M. K. Molla, PhD thesis "New Province of Eastern Bengal and Assam", (University of London), 1966.

১৪—

www.pathagar.com

- **সিমলা ডেপুটেশন ও সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেন্সি গঠনের খসড়া প্রস্তাব:** ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর নবাব সলিমুল্লাহর অসুস্থতার কারণে তার প্রতিনিধিরূপে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও আবুল কাশেম ফজলুল হক আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে নবাব সলিমুল্লাহ প্রণীত সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেন্সি গঠনের খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।

- **সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাদের ঢাকা সম্মেলন:** নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম নেতারা অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স-এ যোগ দেন।[৩৬]

- **উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠন:** ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয় উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্দোলনের জন্য।

- **ফজলুল হকের রাজনৈতিক জন্ম** হয় নতুন প্রদেশের ঢাকাকেন্দ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে।

- ঢাকায় সূচিত হয় নবনির্মাণের নতুন যুগ: নির্মিত হয় গভর্নর হাউস (বঙ্গভবন), রমনা এলাকায় সরকারি ভবনাদি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বর্ধমান হাউস (বাংলা একাডেমি), হুদা হাউস, কাকরাইল ও বেইলি রোড এলাকায় সার্কিট হাউসসহ বহু অফিস ও আবাসস্থল।[৩৭]

- রোমান্স অব ইস্টার্ন ক্যাপিটাল: ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত সময়কালে আবার সুলতানি ও মুঘল আমলের গৌরব ফিরে এসেছে মর্মে উল্লেখ করেন এফ. ব্রাডলি বার্ট তাঁর রোমান্স অব ইস্টার্ন ক্যাপিটাল গ্রন্থে।

- **শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে জাগরণের ঢেউ:** ইংরেজ আমলে শিক্ষা, চাকরিসহ সর্বক্ষেত্রে মুসলমানরা সহনাগরিক হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে যায়। ১৯০১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ অঞ্চলে প্রতি দশ হাজার মুসলমানের

---

৩৬. নবাব সলিমুল্লাহ উদীয়মান মুসলিম ব্যারিস্টার জিন্নাকে সম্মেলনে আনার জন্য একে ফজলুল হককে বোম্বে পাঠান। কিন্তু জিন্না কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় নীতিগতভাবে সম্মেলনে আসতে রাজি হননি।

৩৭. মুন্সি আবদুর রহমান আলী তায়েশ তার বিখ্যাত তাওয়ারিখে ঢাকা গ্রন্থে লিখেন: "ঢাকা এক সময় ছিল ইসলামি রাজধানী। ব্রিটিশ শাসন আমলে অনেক কাল পর তা আবার রাজধানীতে পরিণত হলো। এখন নবযুগের সূচনা হয়েছে। ঢাকাবাসীর সুপ্ত ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। এখন উন্নতির ধারা বয়ে চলেছে। ঢাকাতে একটি সিভিল সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে যে সব স্থানে জাঁকালো সৌধ এবং শাহি প্রাসাদ দণ্ডায়মান ছিল, আল্লাহর শুকুর, সে সব জায়গায় আবার নতুন করে নির্মাণ কাজ চলছে। এইসব উচ্ছন্ন স্থানে নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত এলাকাকে বলা হয় 'নিউ টাউন'।

www.pathagar.com

(শতকরা বা হাজারে নয়, দশ হাজারে!) মধ্যে ইংরেজি জানতেন মাত্র ২২ জন!! হিন্দুদের মধ্যে এর সংখ্যা ছিল ১১৪ জন। সরকারি উঁচু পদে মাত্র ৪১ জন মুসলমান ছিলেন। তার বিপরীতে হিন্দুরা জনসংখ্যায় মুসলমানদের অর্ধেকের চেয়েও কম হওয়ার পরেও ১২৩৫টি পদ দখল করে রেখেছিল। ঢাকায় নতুন প্রদেশ শিক্ষা ও চাকরির দ্বার খুলে দেয় এবং স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণ এক্ষেত্রে ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকেন।

- **শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি:** ১৯০৭-১৯১২ সময়কালে স্থবির পূর্ববঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় গড়ে ৩৭%ভাগে। এ সময়কালে, অর্থাৎ ঢাকায় রাজধানী ও প্রশাসনিক সুবিধা বিস্তারের কল্যাণে পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮২.৯% ভাগ পর্যন্ত উঠেছিল, যা সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে রেকর্ডস্বরূপ। ১৯০৬ সালে নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে কলেজিয়েট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬৯৮ জন এবং কলেজিয়েট শিক্ষার জন্য ব্যয় হতো ১,৫৪,৯৫৮ টাকা। ১৯১২ সালে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৬০ জনে এবং শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৮৩,৬১৯ টাকায়, যা বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে নতুন প্রদেশ বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে আবার কমতে থাকে। একই চিত্র দেখা যায় সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ১৯০৫ সালে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,৯৯,০৫১ জন। তা ১৯১০-১১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৯,৩৬,৬৫৩ জনে। এ সময় প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা খাতের ব্যয় ১১,০৬,৫১০ টাকা থেকে ২২,০৫,৩৩৯ টাকায় বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় শিক্ষা ব্যয়ও ৪৭,৮১,৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩,০৫,২৬০ টাকায় বৃদ্ধি পায়।
- **শিক্ষার ব্যাপ্তি ও উন্নতি:** শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি প্রমাণ সে সময়ে ভৌগোলিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গে নারী শিক্ষারও বিপুল অগ্রগতি হয়। ১৯০৮-০৯ সাল নাগাদ ৮১৯টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৫,৪৯৩ জনে। ঢাকার প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ১৯১০-১১ সাল নাগাদ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৫০টিতে। আর ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় ১,৩১,১৩৯ জন। নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষারও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। ১৯০৭-০৮ সালে পূর্ববঙ্গে মক্তব ছিল ১২৯৯টি। ১৯১১-১২ সালে তা ১৫৪৮টিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ সময় মক্তবগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০,১৮৮ থেকে ৫৪,৭০৩ জনে উন্নীত হয়। এ সময় বহু মাধ্যমিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃত্তির সংখ্যাও বাড়ানো হয়। অনেকগুলো মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মিত হয় স্কুল ও কলেজকে কেন্দ্র করে। পূর্ববঙ্গে ১৯১১-১২ সালে ৮২টি মুসলিম ছাত্রাবাস ছিল।

www.pathagar.com

- **শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা বৃদ্ধি:** নতুন প্রদেশ গঠনের আগে স্কুল ও কলেজগুলোর প্রায়-সকল শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। লে. গভর্নর ফুলার এক আদেশে মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা কমপক্ষে ৩৩% বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এর ফলে ১৯১২ সালে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ১৪,৬৫৬তে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগে মুসলমান অফিসারের সংখ্যা ছিল প্রায়-শূন্যের কোঠায়। এ সংখ্যা যুক্তিযুক্ত করার জন্য প্রাদেশিক সরকার প্রতিটি জিলায় মুসলিম জনসংখ্যানুপাতে উপ-পরিদর্শক নিয়োগের নির্দেশ দেয়। ১৯১২ সালে উপ-পরিদর্শকের সংখ্যা ১১৪ জনে উন্নীত হয়।

- **নতুন জীবন ও সম্ভাবনার হাতছানি:** নতুন প্রদেশ জনগণের সামনে নতুন ও সম্ভাবনাময় জীবনের দ্বার উন্মোচিত করে। নবাব সলিমুল্লাহর ভাষায় "বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে।"[৩৮] লর্ড কার্জন বলেন "The new province advanced in education, in good governance, in every mark of prosperity." লর্ড হার্ডিঞ্জ অন্য ভাষায় নতুন প্রদেশ স্থাপনের ফলে অর্জিত উন্নতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

- **পেশাগত দিগন্তের উন্মোচন:** নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠার আগে পূর্ব বাংলার সরকারি চাকুরিতে বিভিন্ন দফতরে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ছয় ভাগের মধ্যে এক ভাগেরও কম। পুলিশ বিভাগে মুসলমানরা ছিল সবচেয়ে বঞ্চিত। মোট জনসংখ্যার ৬০% ভাগের বেশি হওয়া সত্ত্বেও ৫৪টি পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদের মধ্যে বাঙালি মুসলমান ছিলেন মাত্র ৪ জন! ৪৮৪টি সাব-ইন্সপেক্টর পদের মধ্যে ছিলেন মাত্র ৬০ জন! আর ৪৫৯৪ জন কনস্টেবলের মধ্যে মুসলমান ছিলেন ১০২৭ জন। নতুন প্রদেশে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের চাকরিগত বৈষম্য অনেক কমে আসতে থাকে।

- **সোনালি আঁশের সৌভাগ্য ও অর্থনৈতিক সুদিন:** নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার কারণে বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব জনগণের অর্থনৈতিক ভাগ্যের চাকা গতিশীল করে। এ সময় নতুন প্রদেশে নিজস্ব বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধান অর্থকরী ফসল পূর্ব বাংলার সোনালি আঁশ পাটের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পায়। ১৯০৪ সালের চেয়ে ১৯০৬-১৯০৭ সালের পাটের দাম প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়, যা পরবর্তী কয়েক বছর স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৬-১৮৯৭ সালে প্রতি বেল পাটের মূল্য ছিল ৩০ টাকা। তা ১৯০৬-১৯০৭ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৯ টাকায়। আন্তর্জাতিক বাজারের সুফলও বৃদ্ধি পায় এবং সেটা পূর্ব

৩৮. মুন্সিগঞ্জের এক জনসভায় তিনি এ উক্তি করেন।

www.pathagar.com

বাংলার কৃষকগণ সরাসরি লাভ করেন। কারণ, কলকাতার ফড়িয়া, ব্যবসায়ী সে সময় কমিশন ও বাড়তি লভ্যাংশ নিজেদের কব্জায় নেওয়ার মওকা পায় নি।

- **শিল্প ও অন্যান্য:** ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার শিল্প, কল-কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদনসহ সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক ব্যাপক উন্নয়ন ও নবজাগরণের সূচনা ঘটে। সাহিত্য, চিত্রকলা, নন্দনতত্ত্ব, বিনোদন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে আসে নতুন প্রাণাবেগ। ঢাকার সঙ্গে কেবল ভারতের প্রধান প্রধান শহরেরই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের বীজ তখনই অঙ্কুরিত হয়।**

একজন বিশিষ্ট গবেষক মূল্যায়ন করেছেন যে, "তাছাড়া এটা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, একটা পশ্চাৎপদ অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে কতখানি উন্নয়ন সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আরো অগ্রগতি সম্ভব হতো, যদি এ বিভাগ বিলুপ্তির জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা না হতো।"[৩৯]

৭.

ব্যাপক রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও হিন্দু ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতায় জানমালের প্রভূত ক্ষতির মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা তুলে নেওয়াকে বঙ্গভঙ্গ-রদ বলা হলেও আমরা এমনটি বলতে নারাজ। আমরা বলতে পারি যে, ঢাকার রাজধানীর মর্যাদা ও পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে আবার কলকাতার অধীনস্থ করা হলো। আম্বেদকরের মতো পণ্ডিতও বলতে বাধ্য হলেন:

> "সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এমন কি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি। এ সবগুলো প্রদেশের সিভিল সার্ভিসই তারা দখল করে নিয়েছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল এ চারণভূমি হ্রাসকরণ। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ব বাংলার বাঙালি-মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে বাধা দেয়া।"[৪০]

এর ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে একজন গবেষকের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য:

> "বাংলার মুসলমানগণ তাদের স্বার্থের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা[৪১]

৩৯. কেএম মোহসীন, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১, পৃ. ৯.

৪০. B. R. Ambedker, Pakistan or Partition of India, p.11.

৪১. ইংরেজ সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত মুসলমানদের মনে এমন নিদারুণ আঘাত হানে যে, এটাকে তারা সত্যিকারার্থে একটি বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করে। হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেস দলের সম্মিলিত বিরোধিতামূলক আন্দোলনের জবাবে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা প্রবল প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ আয়োজনে সক্ষম ছিল এবং কলকাতা থেকে বেরিয়ে নতুন প্রদেশের মাধ্যমে তাদের

www.pathagar.com

এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কথা ভুলতে পারেনি। তারা বুঝতে সক্ষম হন যে, একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় এবং অপরদিকে বিদেশী শাসকশ্রেণী–এ দুই শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায়সঙ্গক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কেবলমাত্র তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্ভব।"[৪২]

আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে চলমান এই সংগ্রাম কি শেষ হয়েছে?[৪৩] ■

উন্নতির ব্যাপারেও তারা সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আশ্বাসের কারণে তারা আইনমান্যকারী সুশৃঙ্খল প্রজার ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে, এমন কি, তাদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা ও মতামত গ্রহণ না-করেই এক তরফাভাবে নতুন প্রদেশটি উঠিয়ে নিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে। আর হিন্দুরা প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হয়। এই অবস্থায় বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ ও বাঙালি হিন্দুদেরকে প্রতিপক্ষরূপে দেখতে পায়।

৪২. কেএম মোহসীন, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১, পৃ.১২.

৪৩. বিস্তারিত জানতে, পড়ুন

মুহাম্মদ নূরুল আমিন, "ইন্ডিয়া ডকট্রিন", সেমিনার স্মারক ২০০৮, ঢাকা: বিআইসি।

আজিজুল হক বান্না, "বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং আমাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম", সেমিনার স্মারক ২০০৮, ঢাকা: বিআইসি।

মাহফুজ পারভেজ, "বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ", সেমিনার স্মারক ২০০৮, ঢাকা: বিআইসি।

আজিজুল হক বান্না, "ভারত-উৎসারিত বাংলাদেশবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাস", সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বিআইসি।

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, "বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্ক: অভিন্ন নদীগুলোর পানি বন্টন", সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বিআইসি।

সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, কলিকাতা: পত্রপুট, ১৯৮৩.

P. Hardy, The Muslims of India, Cambridge: The Cambridge University Press, 2002.

লেখক-পরিচিতি : ড. মাহফুজ পারভেজ- কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২৪শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

সার্ক ঃ সূচনা ক্রমবিকাশ ও সাফল্য-ব্যর্থতার পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নূরুল আমিন

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নিজেদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠিত হয়েছে। উন্নয়ন আঞ্চলিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে সার্ক স্থাপিত। এটি মূলত একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার আঞ্চলিক সংগঠন। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রদানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই দর্শনকে সামনে রেখেই ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীণ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে এ মর্মে বাংলাদেশের একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্ভাবনা দৃঢ় হোক।

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানরা এ প্রস্তাবে প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সাড়া দেন। ১৯৮১ সালের ২১ থেকে ২৩ এপ্রিল কলম্বোতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রথম পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে কাঙ্ক্ষিত সংগঠন গঠনের ব্যাপারে কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরপরই ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসে এ অঞ্চলের সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা দিল্লিতে তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে মন্ত্রিবর্গ একীভূত বা যৌথ কর্মসূচী বা Integrated Programme of Action (IPA) নামে একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির আওতায় সার্কভুক্ত রাষ্টগুলোর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকা সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কের (SAARC- South Asian Association for Regional Co-operation) বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় এবং তার যাত্রা শুরু হয়।

সার্ক ৭টি রাষ্ট্র নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৮। এ পর্যন্ত সার্কের ১৬টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্কের সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

সার্কের সদস্য রাষ্ট্র

দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ১৯৮৫ সালে শুরু হওয়া সার্ক ইতিমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সার্কে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তির ফলে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটে। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হচ্ছেঃ ১. বাংলাদেশ, ২. ভারত, ৩. পাকিস্তান, ৪. নেপাল, ৫. শ্রীলংকা, ৬. ভুটান, ৭. মালদ্বীপ, ৮. আফগানিস্তান।

সার্কের পর্যবেক্ষক দেশসমূহ

চীন ও জাপানের মতো উন্নত প্রযুক্তিশীল রাষ্ট্র সার্কের পর্যবেক্ষক। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইরান ও মরিশাসকে সার্কের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়।

সার্কের অবকাঠামো

সার্ক সনদে এ সংস্থার জন্য একটি পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিধান রাখা হয়েছে। এই কাঠামো হচ্ছেঃ

১. সদস্য দেশসমূহের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন: সার্ক সনদ অনুযায়ী প্রতি বছরই এই শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা। নিয়ম অনুযায়ী সব সদস্য রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হতে পারে না। প্রতিষ্ঠার পর এ

www.pathagar.com

পর্যন্ত সার্কের ১৬ টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন: সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সাধারণত বছরে দু'বার মিলিত হন। সম্ভব না হলে বছরে অন্তত একবার মিলিত হবেন। এ সম্মেলনগুলোতে বিভিন্ন এজেন্ডা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হয়।

৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি: সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত। সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন, তদারকি ও সমন্বয় সাধন এ কমিটির প্রধান কাজ। এ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময় বৈঠকে বসবেন এবং সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে স্বস্ব দেশের মন্ত্রিপরিষদের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করবেন।

৪. টেকনিক্যাল কমিটি: সার্কের সব কর্মসূচি কতোগুলো নির্দিষ্ট সহযোগিতার ক্ষেত্রের মাধ্যমে পরিচালিত। এসব কর্মসূচির টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে এ কমিটি গঠিত।

৫. সচিবালয়: সার্ক সনদের ৮নং ধারায় সার্ক সচিবালয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সার্কের দ্বিতীয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নেপালের কাঠমান্ডুতে সার্ক সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়। সার্কের কর্মকান্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে সচিবালয় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সার্কের মূলনীতি

সার্কের মূলনীতিগুলো হলো:

১. সার্কের যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে।

২. দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না।

৩. প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র পরস্পরের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, কেউ কারুর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। তদুপরি তারা পারস্পরিক লাভালাভের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

৪. এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্খার প্রতি লক্ষ্য রেখে সার্ক ভূমিকা পালন করবে।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে:

১. কৃষি, ২. পল্লী উন্নয়ন, ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ৪. নারী উন্নয়ন, ৫. পরিবেশ ও আবহাওয়া, ৬. বনায়ন, ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, ৯.

www.pathagar.com

পরিবহন ও যাতায়াত, ১০. পর্যটন, ১১. ডাক ও তার, ১২. শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ১৩. মাদক পাচার ও ব্যবহার রোধ, ১৪. শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি।

সার্ক সনদ

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই অনুমোদিত হয় সার্ক সনদ। এ সনদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে-

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ দ্রুততর করা।
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতার প্রসার ও শক্তিবর্ধনে সাহায্য করা।
৪. পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বুঝাপড়ায় সাহায্য করা।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি।
৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৭. সম স্বার্থ বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের মুকাবিলায় নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার।
৮. অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।

সার্কের সচিবদের নাম ও মেয়াদকাল

১. আবুল আহছান, ১৬ জানুয়ারি ১৯৮৭-১৫ অক্টোবর ১৯৮৯
২. কান্ট কিশোর বারগেভা, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১
৩. ইবরাহিম হোসাইন জাকি, ১ জানুয়ারি ১৯৯২-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩
৪. যাবদ কান্ট সিলওয়াল, ১ জানুয়ারী ১৯৯৪-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫
৫. নাঈম ইউ হেসাইন, ১ জানুয়ারি ১৯৯৬-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮
৬. নিহাল রডরিগো, ১ জানুয়ারি ১৯৯৯-১০ জানুয়ারী ২০০২
৭. কিউ এ এম এ রহিম, ১১ জানুয়ারী ২০০২-২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
৮. চেনকিয়া দরজি ১ মার্চ ২০০৫-বর্তমান কাল পর্যন্ত।

সার্কের সফলতা

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক তৃতীয় দশকে পদার্পণ করেছে। সময়টা খুব দীর্ঘ না হলেও একটি আঞ্চলিক সংগঠনের পরিপক্বতার জন্য যথেষ্ট। এদিক থেকে সার্ককে মোটামুটিভাবে সফল বলা যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য

www.pathagar.com

দেখিয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের জন্য এটি একটি প্লাটফরম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্লাটফরম এ অঞ্চলে অরাজনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেছে যা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এর একটি আনুষ্ঠানিক সনদ রয়েছে এবং কাঠমান্ডুতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সার্ক এ অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতাদের থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাইকে একে অপরের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছে। এর ফলে একে অন্যের সমস্যা, আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে জানতে পারছে। এতে অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটানোর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সার্কের সাফল্যগুলো নিম্নরূপ

- প্রতিষ্ঠার পর থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বড় কোনো সংঘাত হয়নি। এর কারণ সার্কের মূল্যবোধ।
- সদস্য রাষ্টগুলোর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায়ই আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সার্কের আওতায় কৃষিতথ্য কেন্দ্র (Agricultural Information Centre), খাদ্য সুরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কমিশন গঠন সার্কের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাফ গেমস সার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক বিষয়।
- সার্ক সদস্য দেশগুলো সন্ত্রাস দমন সংক্রান্ত একটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এটি কার্যকর হলে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তবর্তী সন্ত্রাস হ্রাস পাবে।
- সার্ক দেশগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে UNCTAD-এর সঙ্গে সার্কের একটি সমঝোতা স্মারক, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ESCAP ও UNDP এর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাপানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক, শিশুদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের জন্য ইউনিসেফের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপ সার্কের অন্যতম সাফল্য।
- SAFTA চুক্তি সম্পাদন সার্কের একটি বড় ধরনের সাফল্য। সার্কভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণ এবং দক্ষিণ এশীয় বাণিজ্যে পারস্পরিক পক্ষপাতমূলক

www.pathagar.com

কাঠামো রচনার আলোকে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৯৩ সালে SAPTA স্বাক্ষরিত হয় যা ১৯৯৫ সালে কার্যকর হয়। SAFTA-এর আওতায় প্রতিটি পণ্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যাচাই করে শুল্কহার কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। চাহিদাভিত্তিক একটি উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে একাধিক দেশের উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের একটি নতুন পরিবেশ তৈরি এবং একটি অভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে সার্ক স্বীকৃতি দিয়েছে। SAFTA -এর একটি উদ্দেশ্য হলো ক্রমান্বয়ে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের উদারীকরণ, যার মাধ্যমে SAFTA (South Asian Free Trade Area) বা মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। ১৯৯৭ সালের ১২ থেকে ১৪ মে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত নবম শীর্ষ সম্মেলনে ২০০১ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়াকে একটি মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল এবং একটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। SAPTA এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সম্পদ, সেবা , বিনিয়োগ এবং জনগণের মুক্ত যাতায়াত নিশ্চিত করবে। অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে SAPTA-এর আওতায় ২২৬ পণ্য এবং দ্বিতীয় দফায় ২০০ পণ্যের ১০% থেকে ৫০% শুল্ক কমানো হয়।

- সার্কের উদ্যোগে সার্ক টিউবারকিউলোসিস সেন্টার (SAARC Tuberculosis Centre), সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার (SAARC Documentation Centre), সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SAARC Meta Research Centre) প্রভৃতির মাধ্যমে এ অঞ্চলে উল্লিখিত বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।
- চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক পাসপোর্ট প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে অবাধ চলাচল বৃদ্ধি পাবে। বিভেদের দেয়াল অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জনবসতি ঘনত্বের সমতা আসবে। এছাড়া সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি অভিন্ন 'সার্ক মুদ্রা' চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। অভিন্ন সার্ক মুদ্রা চালু হলে উন্নত দেশের মুদ্রানীতির আধিপত্য থেকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ রেহাই পাবে।
- সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চতুর্দশ সম্মেলনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এ ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হবে নয়াদিল্লিতে, বাংলাদেশে হবে একটি শাখা ক্যাম্পাস। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সার্কভুক্ত অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার ঘটবে।
- জরুরি খাদ্য সঙ্কট, খাদ্য ঘাটতি এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্ক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ব্যাংকে থাকবে ২ লাখ ৪১

www.pathagar.com

হাজার ৫৮০ মেট্রিক টন চাল ও গম।

- দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পণ্য ও জনগণের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে সার্ক দেশগুলোর রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্দশ সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল কানেক্টিভিটি বা যোগাযোগ।
- চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলনে সার্কের অবয়বগত পরিবর্তন ঘটেছে। কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তি সার্ককে দক্ষিণ এশিয়ার পরিচিতির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে। সার্ককে পূর্ণ অবয়বে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আফগানিস্ত ানের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।
- দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলোতে উৎপাদিত ও বাজারজাত করা পণ্যের অভিন্ন মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্কের দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এর সদর দপ্তর ঢাকায়।
- নারী ও শিশু উন্নয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, দরিদ্রতা দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ২০০৪ সাল থেকে সার্ক অ্যাওয়ার্ড দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সার্ক কার্যক্রমের একটি বিশ্লেষণ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত প্রায় আড়াই দশকে সার্কের আওতায় ২১টি চুক্তি এবং অনেকগুলো ঘোষণা আসলেও তার অধিকাংশই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। ২০০০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সার্ক যে অঙ্গীকার করেছিল তা যেমন বাস্তবায়িত হয়নি তেমনি ২০০২ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়াকে দারিদ্র্যমুক্ত করার ঘোষণাও এখনো স্বপ্নই রয়ে গেছে। বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে SAPTA ও SAFTA-র মতো চুক্তি করা হলেও গত ২৫ বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেড়েছে মাত্র ৫.৮ শতাংশ। সন্ত্রাস দমনে একযোগে কাজ করার কথা থাকলেও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিস্তার ও উৎস নিয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের বেড়াজাল। পক্ষান্তরে সদস্য দেশগুলোর সাধারণ মানুষ মনে করে যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সার্ক নেতৃবৃন্দ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ এশিয়ার চেহারা পাল্টে যেত। অনেকে মনে করেন সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, তাদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সার্ককে অনেকটাই অকার্যকর করে তুলেছে।

বাংলাদেশের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ২০০৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আফগানিস্তানকে অষ্টম সদস্য দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে গত ২৫

www.pathagar.com

বছরে সার্কের আওতায় ২১টি চুক্তি এবং ১৬টি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য সাপটা চুক্তি এবং সন্ত্রাস দমন সংক্রান্ত সনদ সার্কের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হলেও তা এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ২০০৪ সালে ইসলামাবাদ সম্মেলনে সাফটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরের বছর থেকে তা কার্যকর করার কথা থাকলেও স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকা নিয়ে দুই প্রভাবশালী সদস্য রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চুক্তিটির বাস্ত বায়ন আটকে আছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভারতের বেনিয়া ও সংরক্ষণনীতি। এছাড়াও আছে স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পরস্পর পরস্পরকে ছাড় না দেয়ার প্রবণতা। ফলে আন্তঃবাণিজ্য সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। ১৯৮৫ সালে সার্ক যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের হার ছিল ৩.২ শতংাশ। ২৫ বছর পর এখন এই হার মাত্র ৫.৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে আসিয়ানের (ASEAN) ক্ষেত্রে আন্তঃবাণিজ্যের হার ২৫ শতাংশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তা ৬০ শতাংশের বেশী, সার্কের আওতায় প্রথমে সাপটা (SAPTA) ও পরে সাফটা (SAFTA) স্বাক্ষরের পরও আন্তঃবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আসেনি। বস্তুতঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগের কথা বলা হলেও সার্ক দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড এখনও খুব কম। এর আগের কয়েকটি শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির অঙ্গীকার করা হলেও আশানুরূপ তেমন অগ্রগতি আসেনি। নিকট প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও সার্ক দেশগুলোর সাধারণ মানুষ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হতে পারেনি।

প্রায় প্রতিটি সম্মেলনে সন্ত্রাস দমনে সার্ক নেতারা জোরালো অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ কোনও পদক্ষেপের অভিব্যক্তি ঘটেনি। বরং বড় একটি সদস্য দেশ প্রতিবেশী দেশগুলোতে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মদদ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং মাওবাদী সন্ত্রাসে জর্জরিত এই দেশটি নিজ দেশে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়ে তা অন্যদেশে রফতানী করে ভার লাঘবে এখন বদ্ধপরিকর। প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় দেশটি সন্ত্রাসকে এখন পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। সন্ত্রাসের বিস্তার ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয় নিয়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ চলছে।

২০০৮ সালে শ্রীলঙ্কায় পঞ্চদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিল গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ২০০৯ সাল থেকে কার্যকর হবার কথা থাকলেও তার বাস্তবায়ন অবস্থা অত্যন্ত নড়বড়ে। তিনশ’ মিলিয়ন ডলারের এই উন্নয়ন তহবিলটি দু’বছরের মধ্যেও পূর্ণতা না পাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক।

www.pathagar.com

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ-সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এসডিএফ গঠনের ধারণাটি গৃহিত হয়। পরে ১৯৯৬ সালে সার্ক ফান্ড ফর রিজিওনাল প্রজেক্টস (SFRP) ও সার্ক রিজিওনাল ফান্ড (SRF) একীভূত করে এসডিএফ গঠন করা হয়। সার্ক দেশগুলোর গৃহিত উন্নয়ন কর্মসূচী বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্যই এসডিএফ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০০৪ সালে পাকিস্তানের করাচীতে এসডিএফ-এর গভর্নিং বোর্ডের অষ্টম সভায় সার্কের সদস্য দেশগুলোর প্রস্তাবিত সকল কর্মসূচী অনুমোদন করা হয়। এছাড়াও এই অঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে সার্ক মহাসচিবের সমীক্ষা প্রস্তাব ও তখন গৃহিত হয়েছিল। ২০০৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং প্রস্তাবিত এসডিএফ-কে ১০০ মিলিয়ন ডলার দেয়ার ঘোষণা দেন। এর পর থেকে এসডিএফ সক্রিয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পরে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে উন্নয়ন তহবিলে ভারত ২০০ মিলিয়ন দেয়ার প্রস্তাব করে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ৩৪ মিলিয়ন ডলার দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। ২০০৪ সালে ইসলামাবাদ শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় ফুড ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব করা হয়। সদস্য দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা এবং আপৎকালীণ সময়ে খাদ্য ঘাটতির দেশগুলোতে খাদ্য সরবরাহ এই ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য। তবে সব দেশ এখনো ফুড ব্যাংকের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে। প্রস্ত াবিত ফুড ব্যাংকে ২,৪১,৫৮০ টন চাল ও গম মওজুদ রাখার কথা বলা হয়েছে। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্কের আওতায় দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। কয়েক দফা স্থান পরিবর্তনের পর এখন কোলকাতার শান্তি নিকেতনে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে।

প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অবনতি, পণ্য মূল্য, ঋণের বোঝা, বহিঃসম্পদের সীমিত অবস্থা, অসম বাণিজ্য এবং উন্নত বিশ্ব কর্তৃক সংরক্ষণ নীতি অনুসরনের ব্যাপারে সার্ক নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে নারীদের অংশ গ্রহনের অনুকূলে ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশনসহ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বেতার কর্মসূচী গ্রহণ, পর্যটন, ছাত্র শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও উন্নয়ন বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য ডকুমেন্টশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তৃতীয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি খাদ্য ভান্ডার গড়ে তোলা, রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে অভিযোগকারী দেশের হাতে তুলে দেয়া এবং পরিবেশ রক্ষায় আঞ্চলিক

www.pathagar.com

সহযোগিতার অঙ্গীকার করা হয়। সার্কভুক্ত দেশগুলোর সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করা এবং পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক দেশসমূহের সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি ও পার্লামেন্টের সদস্যদের বিশেষ সার্ক ভ্রমণ দলিল দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পঞ্চম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র্য দূরীকরনের লক্ষ্যে কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন ১৯৯২ সালে তাদের রিপোর্ট পেশ করে এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সম্মেলনে তা অনুমোদিত হয়। এই রিপোর্টে ১০ বছরের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রস্তাব করা হয়। ষষ্ঠ সম্মেলনে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাপটা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। পরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সাপটা স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৫ সাল থেকে সাপটা কার্যকর হয়। এর আওতায় ২২৬টি পণ্যের ক্ষেত্রে শূণ্য থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক রেয়াত ঘোষণা করা হয়। সপ্তম সম্মেলনে ঢাকা ঘোষণায় সার্ক তৎপরতার ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মসূচীকে আরো সংহত ও জোরদার করা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও অবক্ষয় রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকসহ সব রকমের কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অষ্টম শীর্ষ সম্মেলনে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানানো হয়। মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত নবম শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দশম সম্মেলনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ত্বরান্বিত করা, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা বিধান, বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ এবং সন্ত্রাস ও মাদক চোরাচালান বন্ধের অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া ২০০২ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে সার্কের অঙ্গীকার অব্যাহত রাখা এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার দৃঢ় অঙ্গীকার, অবাধ বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। ২০০৫ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলনে ৪৩ দফা ঘোষণায় খাদ্য নিরাপত্তা কার্যকর, এইডস প্রতিরোধে ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণসহ অভিন্ন স্বার্থে বহুপাক্ষিক ফোরামে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেয়ার কথা বলা হয়। এই সম্মেলন থেকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগনের জীবন মানের উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সার্ক সামাজিক সনদ এবং সন্ত্রাস দমনে অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠনের অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতা, দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সন্ত্রাস নির্মূল ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিন্ন চ্যালেঞ্জ

www.pathagar.com

মোকাবেলায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ২০০৭ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলনে সন্ত্রাস দমন ও যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দিল্লী সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং আঞ্চলিক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

২০০৮ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলনে বহুমুখী যোগাযোগ ও ট্রানজিট সুবিধা, বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এতে সন্ত্রসীদের ব্যাপারে তথ্য বিনিময় ও আইনগত সহায়তা প্রদান, এসডিএফ সনদ অনুমোদন, দক্ষিণ এশীয় ষ্ট্যান্ডার্ড টেষ্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা এবং সাফটার আওতায় আফগানিস্তানকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সার্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐক্যবদ্ধভাবে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ৭টি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবেলা এবং সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সাতটি দেশ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা আসিয়ানের ন্যায় তাদের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের হার বৃদ্ধি পায়নি, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নতুন বাজার সৃষ্টি, দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। এই শর্ত পূরণে আঞ্চলিক এই সংস্থাটির ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত বলে প্রতীয়মান হয়। সদস্য দেশগুলোর উপর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সার্কের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের সমস্যাও রয়েছে। একটি বড় ও শক্তিধর দেশ হিসেবে ভারত অন্যান্য দেশগুলোকে সার্কের সম অংশীদার বলে মনে করে না। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব, প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ভারতের সম্পর্কের তিক্ততা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা আঞ্চলিক এই জোটের ঐক্য ও সংহতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এর ফলে বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের ফলপ্রসূ বাস্ত বায়ন কঠিন হয়ে পড়েছে। এতে করে সদস্য দেশগুলোকে জোট ও চুক্তির বাইরে এসে একক ও দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করে স্ব স্ব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে দেখা যায়।

সার্কের দুই দশকের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ার আর্থ সামাজিক নীতির স্থপতি হিসেবে নয়, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনের মাধ্যমে আঞ্চলিক আলাপ-আলোচনা উৎসাহিত করার একটি ফোরাম হিসেবেই সার্কের কর্মকান্ড বেশী পরিচিত লাভ করেছে। একটি আঞ্চলিক সংস্থা বা জোট হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা কতিপয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

১৫—

www.pathagar.com

সার্কের কাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক সহযোগিতার অনুকূল নয়। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনই হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ। শীর্ষ সম্মেলনের অংশীদার যে কোনও একটি দেশ অনীহা প্রকাশ করলে সম্মেলন পন্ড হয়ে যেতে পারে। কার্যতঃ হয়েছেও তাই। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ২৫টি বছরে এর সনদ অনুযায়ী ২৫টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও হয়েছে মাত্র ১৬টি। অবশিষ্ট ৯টি হয়নি। এর প্রধান কারণ ভারতের বিরোধিতা। ভৌগোলিক আয়তন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব এর সব ক'টি দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি শক্তিধর দেশ। এ প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী একটি শক্তি হিসেবে ভারতের সম্ভাবনা আসিয়ানের তুলনায় সার্ককে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জোটে পরিণত করেছে। সার্ক ভারতীয় আধিপত্যবাদের খপ্পরে পড়ে যাবে এই ভয়ে প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তান এতে যোগ দিতে চায় নি। ভারত সার্ককে তার স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের একাধিক নজিরও ইতোমধ্যে স্থাপন করেছে। এর ট্রানজিট ও আঞ্চলিক হাইওয়ে এবং কানেক্টেভিটি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ছিল ভারত-প্রভাবিত। বাংলাদেশের উপর দিয়ে তার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সংঘাত মুখর রাজ্যগুলোতে সৈন্য ও অস্ত্র সম্ভার পরিবহন এবং এই রাজ্যগুলোতে উৎপাদিত পণ্যের আনা নেয়া নিশ্চিতকরণই ছিল এর লক্ষ্য। প্রতিবেশী প্রত্যেকটি সদস্যদেশ সার্ক এর উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরোধী; তাদের ধারণা এর ফলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। আবার ভারতের তরফ থেকে কয়েকটি প্রতিবেশী দেশকে নাম মাত্র কয়েকটি প্রস্তাব দেয়া ছাড়া দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর ভয় ও আশংকা দূর করার কোনও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাদের প্রতি ভারতের আচরণ কখনো বন্ধুসুলভ ছিল না, এখনো নেই। অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে ভারত বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র ধ্বংসের সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানও তার আগ্রাসনের শিকার। বাংলাদেশের সাথে ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ, ছিটমহল বিনিময়সহ স্থল সীমানা নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি ভাগাভাগি ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মান, সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক হর হামেশা বিনা উষ্কানিতে গুলি বর্ষণ, বাংলাদেশীদের হত্যা ও তাদের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢুকে ভারতীয়দের জমি দখল, চাষাবাদ, লুটপাট প্রভৃতি। এই সমস্যাগুলো জিইয়ে রেখে ভারত কৌশলে বাংলাদেশের ভারতপন্থী সরকারের কাছ থেকে বন্দর, করিডোর, ট্রানজিট ও গ্যাস, কয়লা ব্যবহারের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে যা দেশের ১৫ কোটি মানুষ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। সাধারণ মানুষের এই প্রতিক্রিয়া উভয় দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে রয়েছে যা সার্ক-এর দর্শনকে দুর্বল করছে।

www.pathagar.com

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে বিশাল ঘাটতি। আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যে এই ঘাটতির পরিমাণ গড়ে বছরে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য বিশেষ করে চোরা কারবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে এর পরিমাণ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করে। সার্ক এর সাপটা, সাফটা কিংবা উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত কোনও প্রকার বাণিজ্য চুক্তিই এই ব্যবধান হ্রাস করতে পারছেনা। ভারতের শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভুত বিধি নিষেধ এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এ ক্ষেত্রে তাদের গৃহিত ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতাও নেই। শুল্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস নিয়ে বিরোধ, রাসায়নিক পরীক্ষা ও ইন্ডিয়ান কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মূল্যায়নের উপর গুরুত্বারোপ রুলস অব অরিজিন সার্টিফিকেট গ্রহণে অস্বীকৃতি, একতরফাভাবে ট্যারিফ মূল্য চাপিয়ে দেয়া, আইএসআই সার্টিফিকেট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা, বিএসটিআই সনদ গ্রহণে অস্বীকৃতি, কোয়ারেন্টাইন সনদের বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশকে অসম্ভব করে তুলেছে। ফলে সার্ক-এর বাণিজ্যিক কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় একই রকমের অবস্থা অন্যান্য দেশেও বিরাজ করছে। আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ দেশটিকে প্রতিবেশীদের প্রতি উদ্ধত ও আপোসহীন করে তুলেছে। দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারতের সাথে প্রতিবেশী দেশসমূহের দীর্ঘ মেয়াদী বিরোধ সার্ক-এর কার্যকারিতার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে। আবার দ্বিপাক্ষিক বিষয় সার্ক ফোরামে না আনার নীতি বিরোধকে আরো গভীরতর করছে। আঞ্চলিক বাণিজ্যের উপর এর প্রভাব পড়ছে। বস্তুতঃ আঞ্চলিক বিরোধসমূহকে নিষ্পত্তির চেষ্টা না করে আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সার্ক-এর একটি দুর্বলতম দিক। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সার্কের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা শাস্তির বিধান নেই। বিরোধ কিভাবে সার্কের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় এলটিটিআই বিদ্রোহীদের দমনের ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অবনতির সৃষ্টি করেছিল তা সার্কের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে শ্রীলঙ্কার মধ্যে উন্নাসিকতার সৃষ্টি করেছিল। সদস্য দেশগুলোর উপরও এর প্রভাব পড়েছিল।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ এর দ্বিতীয় উদাহরন। নূতন দিল্লীর সাথে বাণিজ্যিক বিষয়ে আলোচনার পূর্বে পাকিস্তান ভারতের সাথে তার দ্বিপাক্ষিক বিরোধসমূহ বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার উপর গুরুত্বারোপ করে এসেছে। কিন্তু ভারত সে পথে এগোয়নি। বরং পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। পরমাণু শক্তিধর এ দু'টি দেশ অস্ত্র প্রাতিযোগিতায়ও নেমেছে। পাকিস্তানের মোকাবেলায় ভারত সার্ক এলাকায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের সমন্বয়ে গঠিত একটি

www.pathagar.com

উপ-আঞ্চলিক গ্রুপে যোগদান করেছে। তারা নেপালের সাথে একটি বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তিও করেছে। দেশটি বাংলাদেশের রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করছে এবং তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন রাজনৈতিক দল/দলসমূহকে অর্থবিত্তের প্ররোচনা ও প্রলোভন দেখিয়ে কাবু করে এবং প্রত্যক্ষ মদদ দিয়ে ক্ষমতায় এনে স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছে। ২০০৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশে বিডিআর বিদ্রোহ ও সেনা হত্যাকান্ডের সময় ভারত কর্তৃক ঘটনার সার্বক্ষণিক মনিটরিং, তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন শেখ হাসিনা সরকারকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও সেনা প্রেরণের প্রস্তাব এই অঞ্চলে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠারই ইঙ্গিত বহন করে। একইভাবে সম্প্রতি ঢাকায় চূড়ান্তকৃত সার্ক গণতন্ত্র সনদ ও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রশ্নের অবতারনা করেছে। এই সনদে সদস্য দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন হলে অন্য দেশের হস্ত ক্ষেপের বিধান রাখা হয়েছে যা সার্ক দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। এই বিধান ভারতীয় আধিপত্যবাদকে উৎসাহিত করবে। মজার ব্যপার হচ্ছে এই বিধানটি এমন একটি সরকারের উদ্যোগে সংযোজন করা হয়েছে যে সরকার তার দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ভারত তাদের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

সার্ককে যদি টিকে থাকতে হয় তাহলে তার সদস্য দেশগুলোর জনসাধারণের সমস্যাবলী সমাধানের পথ ধরেই টিকে থাকতে হবে। জোটবদ্ধ উন্নয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই এটা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আসিয়ান ও ইইসি থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

ইইসি একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক অবস্থায় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ এই জোট গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জোটটি ইউরোপীয় কৃষক ও শিল্প মালিকদের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সমস্যার নিরসন এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। এই জোটের সদস্যপদ এখন ২৫ এ এসে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ বন্টন ও রফতানীর ক্ষেত্রে ইইসি তার সদস্য দেশগুলোর সমবায় সমিতি গুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। ইইসির কয়েকটি নির্বাচিত সদস্য দেশের কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সমবায়ের হিস্‌সা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৮ সালে জার্মানীর কৃষি পণ্য বিশেষ করে খাদ্য শস্যের ৬৭ শতাংশ, ফ্রান্সের ৬৬ শতাংশ, ইতালির ২৬ শতাংশ, ইংল্যান্ডের ৭০ শতাংশ, বেলজিয়ামের ২৫ শতাংশ, লুক্সেমবার্গের ৯০ শতাংশ, ডেনমার্কের ৬০ শতাংশ এবং আয়ারল্যান্ডের কৃষি পণ্যের ৬৫ শতাংশ বাজারজাতকরণ সমবায়ের মাধ্যমে হয়েছে। একইভাবে দুগ্ধপণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও ইইসি দেশগুলো ব্যাপকভাবে সমবায়ের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সমবায়ের উপর জার্মানীর নির্ভরশীলতা হচ্ছে ৭৮

www.pathagar.com

শতাংশ, ফ্রান্সের ৫৮%, ইতালীর ৪৫%, ইংল্যান্ডের ৮৭% বেলজিয়ামের ৬৮%, লুক্সেমবার্গের ৯০%, ডেনমার্কের ৮৭% এবং আয়ারল্যান্ডের নির্ভরশীলতা হচ্ছে ৯০%।

ইইসি দেশগুলো কর্তৃক গৃহিত সাধারণ কৃষি নীতির আওতায় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রোডাকশন, মার্কেটিং ও কনজুমার কোঅপারেটিভগুলোকে ব্যাপক ভিত্তিতে তাদের সার্বিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। আশির দশকের পর থেকে এসব দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা কমতে শুরু করেছে এবং বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে ইউরোপে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে কিংবা সমবায়ের উপর থেকে ইউরোপবাসী আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সমবায়ের ক্ষেত্রে ইইসি দেশগুলোতে এখন amalgamation, absorption ও reconstruction কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। Economies of Scale-কে সামনে রেখে তারা ছোট ছোট সমবায়গুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে বড় সমিতিগুলোর সাথে একত্রিভুত করছে। একত্রিভুতকরণের এই প্রক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় সীমানাকেও অতিক্রম করছে। ড্যানিস ডেইরী কোঅপারেটিভের সাথে নরওয়ে ও সুইডেন তাদের ডেইরী সমিতি একত্রিভুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে তারা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা গিল্ড গঠনে ঐকমত্য প্রকাশ করছে। দুধ উৎপাদন, গম উৎপাদন, আলু উৎপাদন, গোশত উৎপাদন সর্বক্ষেত্রে তারা কৌটা প্রথা চালু করেছে। বাজারের স্বার্থে কৌটার অতিরিক্ত উৎপাদন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কায়েমের মাধ্যমে এশিয়ার উদীয়মান দেশগুলো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দেয়া তাদের প্রধান লক্ষ্য। ইইসিতে কয়েক বছর আগে নতুন আরো ১০টি দেশের সদস্য পদ প্রদান ইইসি ও ইউরোপীয় কমন মার্কেটের লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করেছে।

উপসংহার

প্রযুক্তির উৎকর্ষ বিশাল দুনিয়াকে এখন মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এই প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোকে অনুন্নত দেশগুলোর উপর প্রাধান্য দিয়ে Survival of the fittest নীতিকে জোরদার করতেও সহায়তা করছে। এ প্রেক্ষিতে বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর মোকাবেলায় ক্ষুদ্র অর্থনীতিগুলোকে টিকে থাকতে হলে ক্ষুদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোর ঐক্য ও জোট গঠনের বিকল্প নেই। সার্ক এ ক্ষেত্রে একটি প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। সস্ত া শ্রম শক্তি, সস্তা কাঁচা মাল, উর্বর কৃষি ভূমি ও অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়ন ও বাইরের অর্থনৈতিক আগ্রাসন মুকাবিলার জন্য সার্কের সূচনাও এই অঞ্চলের মানুষের মনে একটি অঙ্গীকারের সূচনা করেছিল। কিন্তু ভারতের মোড়লিপনা ও ভারত-পাকিস্তান Cross Cultural Conflict এর শিকার হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি

www.pathagar.com

তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সার্ককে তৎপর ও শক্তিশালী করতে হলে নিম্নোক্ত দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

১) সার্ক সনদ সংশোধন করে সার্কের বিদ্যমান শীর্ষ সম্মেলনকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা জরুরী। এর উচ্চতর কক্ষে থাকবে সকল সদস্য দেশ এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়ন ও পরিধারণ হবে তার কাজ। সামিট এর নিম্ন কক্ষে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। এই কক্ষের সদস্য দেশগুলো বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি বছর একবার শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবেন। শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সকল দেশের ১০০ ভাগ সম্মতির বিধানটিও রহিত করতে হবে। ভারতীয় আধিপত্য ও ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বকে যদি সার্কের কাঠামোতে গৌণ করে তোলা যায় তা হলে এই প্রতিষ্ঠানটির গতিশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

২) উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার্ক দেশগুলো ইইসি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সমবায়সহ স্ব স্ব দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'- এই নীতির অনুসরণে সার্ক বহির্ভূত দেশসমূহের পরিবর্তে তারা তাদের আমদানী-রফতানী বাণিজ্য যথাসম্ভব নিজেরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ও সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান Tarrif-Non-Tarrif বাধাসমূহ অবশ্যই দূর করতে হবে। ভারত-পাকিস্তান যদি এক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায় আপত্তি নেই। তবে তারা যাতে বাধা না হতে পারে সে জন্যই সনদ সংশোধন জরুরী। ■

লেখক-পরিচিতি : জনাব মুহাম্মাদ নূরুল আমিন– বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ১৩ই নভেম্বর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

কাশ্মীর : ভারতের তৈরি আরেক ফিলিস্তিন

আজিজুল হক বান্না

ভূমিকা-কথন

১৯৪৭ সালে যখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা এ উপ-মহাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়, তখন তারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের হাতে ভারতকে প্রধানতঃ দুটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র অর্পণ করে যায়। এর একটি ভারত, অপরটি পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুটি অংশের পূর্বাংশ-তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে এক রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এতে ভারতের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক ভূমিকা ছিল।

শত শত বছর জম্মু ও কাশ্মীর ছিল একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশীয় রাজ্য। উপ-মহাদেশ বিভক্তির ভিত্তি হচ্ছে, দ্বি-জাতি তত্ত্ব। ভারতের মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে মুসলিমদের জন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ গঠনের সিদ্ধান্ত ত্রি-পক্ষীয়ভাবে মেনে নেয়া হয়। একটি পক্ষ কংগ্রেস, অপর পক্ষ মুসলিম লীগ এবং তৃতীয় পক্ষ বৃটিশ সরকার। এ সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ, যা রাজা দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল এবং যেসব রাজ্য ভৌগোলিক ও প্রশাসনিকভাবে বৃটিশ-শাসিত ভারতভুক্ত ছিল না, তা ভারতে বা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে। অথবা স্বাধীন থাকতে পারবে।

www.pathagar.com

এ হিসেবে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভাগ্য ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্ধারণের পূর্ণ এখতিয়ার তাদের জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকে। এককভাবে কাশ্মীর উপত্যকার বা সাধারণভাবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিমরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় এবং ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে কাশ্মীর উপত্যকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে যেহেতু বৃটিশ শাসকদের নিযুক্ত একজন বহিরাগত ডোগরা রাজা হরিকিষেণ সিং বহাল ছিলেন, সে কারণে কাশ্মীর যেমন পাকিস্তানভুক্তির প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের অন্ত র্ভুক্ত হয়নি, তেমনি ভারতেরও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

তবে ইতিহাসের এক নাজুক মুহূর্তে পাক-ভারতের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের উপজাতীয় পাঠান মুজাহিদরা কাশ্মীর দখল করে নিচ্ছে, এই অজুহাতে আতংকিত মহারাজা হরি সিংকে ভারতের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য করা হলে ভারত জম্মু ও কাশ্মীরে তার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে রাজ্যটি দখল করে নেয়। মুজাহিদদের অগ্রাভিযান ভারতের আবেদনে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় মাঝপথে থেমে যায়। মোট উপত্যকার এক-তৃতীয়াংশ 'আজাদ কাশ্মীর' হিসেবে ভারতের দখলমুক্ত হয়। বাকী দুই-তৃতীয়াংশ জম্মু ও কাশ্মীর ভারত বিপুল সেনাবাহিনী দিয়ে আজ অবধি দখল করে রেখেছে।

পাক-ভারত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার সিদ্ধান্ত এবং কাশ্মীরের জনগণের মতামত উপেক্ষা করে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীনতাকামী মুসলিম জনপদের ওপর ভারত ১৯৪৭-৪৮-এ যে সামরিক দখল প্রতিষ্ঠায় নগ্ন আগ্রাসন চালিয়েছে, তা আজও বহাল আছে। তবে তা কোন স্থায়ী ভিত্তি বা স্থিতিশীলতা পায়নি। জাতিসংঘের দলিলে আজও কাশ্মীর একটি বিরোধপূর্ণ অমীমাংসিত ইস্যু। জাতিসংঘের তদারকীতে কাশ্মীরে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই যুদ্ধবিরতি বলবৎ হয় এবং জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকে ভারতই প্রথম স্বাগত জানায়। বরং ভারতই জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়ে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু 'শান্তি-শৃঙ্খলার উন্নতি না হওয়া' এবং অনুকূল অবস্থা তৈরি না হবার অজুহাতে ভারত ছয় দশকেরও বেশী সময় ধরে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠান বাস্ত বায়ন করেনি। এর মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তাতে যুদ্ধবিরতি তথা 'লাইন অব কন্ট্রোল' রেখার কোন হের-ফের হয়নি। অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যদিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়নি। আঞ্চলিক উত্তেজনা বরং বেড়েছে। তবে ভারত 'Instrument of Accession'-এর অজুহাতে কাশ্মীরকে তার সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের অবিচ্ছেদ্য একটি রাজ্য হিসেবে ক্রমশঃ অন্তর্ভুক্তকরণের এক নোংরা সামরিক-রাজনৈতিক আধিপত্যবাদী জুয়াখেলা চালিয়ে আসছে। Instrument of Accession সত্ত্বেও ভারত জম্মু-কাশ্মীরের Special Status স্বীকার করে তাদের সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের দ্বারা কাশ্মীরের স্বাধীন সত্তা

www.pathagar.com

সংরক্ষণের অংগীকার করে। যা অন্য কোন দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে তারা করেনি। এমনকি হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, মানভাদর, গোয়া, দমন, দিউ সহ আরও অনেক দেশীয় রাজ্যকে জোর করে দখল করে নিলেও তাদের ভারত কাশ্মীরের মতো সাংবিধানিক বিশেষ মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি, সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র-ভূটানকে গ্রাস করে ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্যের অবস্থানে অবনয়ন করা সত্ত্বেও ভূটানকে এ ধরনের কোন সাংবিধানিক স্টেটাস দেওয়া হয়নি। কিন্তু ভারত তাদের সংবিধানের ৩৭০-অনুচ্ছেদকেও অকার্যকর করে কাশ্মীরের বিশেষ সংরক্ষণ ও মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে। অর্থাৎ কাশ্মীরকে গ্রাস করলেও ভারত তাকে তার সাংবিধানিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুরোপুরি অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিতে পারেনি। অথবা কাশ্মীরের জনগণ, রাজা কিংবা শেখ আবদুল্লাহ কেউই এটা মেনে নেননি। তবু ভারত বলছে, কাশ্মীর তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং কাশ্মীর ইস্যুতে তারা তৃতীয় পক্ষ বা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর নাক গলানো মেনে নেবে না। এমনকি তাদের মতে, কাশ্মীর নিয়ে অন্যের কথা বলার এখতিয়ার তারা মানতে চায় না।

ইতিহাসের গতিধারা

ইতিহাস কখনও কোন একক জাতি বা পরাশক্তির খেয়ালীপনা বা নিষ্ঠুরতার অনুবর্তী নয়। ইতিহাস আবর্তিত হয় তার আপন গতিপথে। ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক প্রকৃতি। আর প্রকৃতির নিয়ন্তা হচ্ছেন অদৃশ্যমান মহাশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অবশ্যই ইতিহাসের উপাদান মানুষ ও তার পরিপার্শ্ব। অতি সম্প্রতি কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে ইতিহাসের অগ্নিগর্ভ দোলাচল আবার দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। পাঁচ লাখ নিয়মিত সেনাবাহিনী এবং আরও কয়েক লাখ নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করেও দিল্লী উপত্যকার আগুন নেভাতে পারছে না। ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল ভি.কে. সিং বলেছেন, কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর এখন কিছু করণীয় নেই। তাঁর মতে, কাশ্মীর সমস্যা রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবেই তার মীমাংসা করতে হবে।

কাশ্মীরে সম্প্রতি ভারতীয় দখলদার বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে এক কিশোরের নির্মম মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে উপত্যকা জুড়ে। এতে এ পর্যন্ত ১১১ জন অসামরিক শান্তিপ্রিয় কাশ্মীরি শাহাদাৎ বরণ করেন। গণ-বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঠেকাতে ভারত সরকার ও তার বশংবদ রাজ্য সরকার উপর্যুপরি উপত্যকা জুড়ে কার্ফ্যু জারী করে জনতার বিক্ষোভ ঠেকাতে পারেনি। বন্দুক-বেয়োনেটের নির্বিচার ব্যবহার ও দেখামাত্র গুলির নির্দেশকে উপেক্ষা করে কাশ্মীরের তরুণ-কিশোর, যুবক-নারীরা প্রতিবাদে-বিক্ষোভে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছেন। তারা ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার, গণহত্যা বন্ধ এবং ভারতীয় সেনার দখলদারিত্ব তুলে দিয়ে কাশ্মীরের অপহৃত 'আজাদী' ফিরিয়ে দেবার উচ্চকিত শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলেন। এবারই প্রথম কাশ্মীর উপত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠনগুলোর পরিচিত নেতাদের

www.pathagar.com

সাংগঠনিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক নির্দেশনা ছাড়াই জম্মু-কাশ্মীরের নতুন জেনারেশন ভারতীয় দখলদার সেনা ও দিল্লীর বশংবদ সরকারের বিরুদ্ধে আজাদীর লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছেন। এবারই প্রথম পাকিস্তান বা ভারত কথিত 'ক্রস বর্ডার' ইসলামী মুজাহিদ-জঙ্গিদের কোন ভূমিকা ছাড়াই উপত্যকার সাধারণ মানুষ স্ব-প্রণোদিত হয়ে আজাদীর দাবীতে রাজপথে নেমে এসেছেন। এটা কাশ্মীরের চলমান আজাদী সংগ্রামকে নতুন ডাইমেনশন দিয়েছে।

কাশ্মীর উপত্যকার সবচেয়ে প্রধান ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ৮১ বছর বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী হুররিয়াত নেতা সাইয়েদ আলী শাহ গিলানীকে গৃহবন্দী করে রাখা সত্ত্বেও কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে অতীতের চেয়ে বেগবান ও দুর্বার আজাদী আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অপর শীর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা মাসারাত আলমকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। আজাদী আন্দোলনের একমাত্র মহিলা নেত্রী আয়েশা আন্দ্রাবীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে নির্যাতন-নিপীড়ন-ধর্ষণ-লুণ্ঠন-গুম-অপহরণ এবং প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসন সত্ত্বেও ভারত কাশ্মীরের নবীন প্রজন্মকে আজাদীর স্বপ্ন ও চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তবে ভারত সামরিক পথ ছেড়ে এই প্রথম কাশ্মীরে একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে, সকল স্তরের মানুষের মতামত নিয়ে দিল্লী সরকারের নির্দেশে একটি রাজনৈতিক সমাধান সুত্র খুঁজে বের করতে। এটাও সমাধানের পথ নয়। কাশ্মীরে গিয়ে এই প্রতিনিধি দলটি জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হন। তারা জনমতের উত্তেজনা প্রশমন করার পথ খুঁজেছেন ভারতীয় সংবিধানের আওতায়। বিশেষ করে, ভারত সরকার সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কাশ্মীরের জনগণকে যে "Special status" দিয়েছেন, এই প্রতিনিধি দল তা পুনর্বহালের প্রশ্ন পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। এমনকি দফায় দফায় ভারত সরকার তার বশংবদ ও পুতুল রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ৩৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনে সম্মতি আদায় করে 'বিশেষ মর্যাদার' বিকৃতি ঘটিয়ে কাশ্মীরকে যেভাবে কাগজে-পত্রে প্রায় ভারতীয় রাজ্য বানানোর প্রক্রিয়া শেষ করে এনেছে, তা প্রত্যাহারের বিষয় নিয়েও সর্বদলীয় রাজনৈতিক টিম মাথা ঘামায়নি। অর্থাৎ দিল্লী সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি দলের মিশন বিরাজমান ভারতীয় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করে জনগণের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ, মানবাধিকার পুনর্বহাল, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সংস্কার, তথা বেকারত্ব নিরসনের বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। এতে সমস্যার মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

তবে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল কাশ্মীরে গিয়ে 'সবার সাথে' মতবিনিময় করে দিল্লী সরকারের কাছে সংকট নিরসনের যে সুপারিশ তারা করেছেন, তার মধ্যদিয়ে কয়েকটি বিষয় স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথমতঃ ভারত আভ্যন্তরীণ ও জাতীয়ভাবে এই প্রথম স্বীকার করলো যে, কাশ্মীরে সংকট বিরাজমান এবং সেখানে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ

www.pathagar.com

হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জম্মু-কাশ্মীরের জনগণ ভারতের গোলামী মেনে নেয়নি এবং মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তৃতীয়তঃ কাশ্মীর সমস্যার সামরিক সমাধান সম্ভব নয় এবং তারা শঠতা ও ভীতি সঞ্চার করে যে Instrument of Accession অস্ত্র ব্যবহার করে কাশ্মীর দখল-পর্ব সমাধা করেছে বলে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিয়ে আসছিল, তার কোন ভিত্তি নেই। চতুর্থতঃ কাশ্মীর উপত্যকায় যে আজাদীর আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে আসছে, তার পেছনে প্রতিবেশী পাকিস্তানের উস্কানীকে দায়ী করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'ক্রসবর্ডার টেরোরিজমের' যে অভিযোগ উত্থাপন করে ভারত পাকিস্তানকে 'জঙ্গিরাষ্ট্র' হিসেবে একঘরে করতে চেয়েছে, সেই প্রচারণাটিও অসত্য বলে প্রমাণ হলো।

উল্লেখ্য, বেনজির ভুট্টো সরকার, জেনেভার মানবাধিকার সম্মেলনে কাশ্মীরে ভারতের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলেও তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতের কূটচালে। ভারত আজ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল, আন্তর্জাতিক কিংবা স্থানীয় মানবাধিকার গ্রুপকে প্রবেশ করতে দেয়নি। যদিও বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের অবাধ যাতায়াতকে বাংলাদেশ অনুমতি দিয়েছে।

কাশ্মীরের গণহত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন, কথায় কথায় স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরিদের 'পাকিস্তান চর' বা সন্ত্রাসী বানানোর এক বীভৎস অবদমন নীতি চালাচ্ছে দিল্লী সরকার। এ পর্যন্ত ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আজাদী আন্দোলনে কাশ্মীরের ৭০ হাজার থেকে প্রায় ১ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছেন বলে কাশ্মীরি সূত্রগুলো উল্লেখ করেছে। আর কত রক্ত দিতে হবে, কাশ্মীরিরা তা জানেন না। সাম্প্রতিক সময়েও ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ১১১ জন তরতাজা মানুষ জীবন দিয়েও তারা নিবৃত্ত হননি। বরং আজাদীর আওয়াজ আরও দীপ্ত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। কার্ফ্যু প্রত্যাহার, স্কুল-কলেজ খুলে দেওয়া এবং কাশ্মীরে সর্বদলীয় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সফরের পরও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। সেখানে এরপরও দফায় দফায় কার্ফ্যু দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতাকামীদের বিক্ষোভ-জমায়েত ঠেকাতে দফায় দফায় কার্ফ্যু দেওয়া একটা পুরনো রীতি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে যে আজাদীর চেতনা জাগ্রত রয়েছে, তা নিবৃত্ত করার কোন অস্ত্র ভারতের হাতে নেই।

নয়া বিশ্বযুদ্ধের নাভি-কেন্দ্র

কাশ্মীর শুধু পাক-ভারত সমস্যা ও উত্তেজনার মূল কেন্দ্রই নয়। কাশ্মীর হচ্ছে, ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, বিশ্বযুদ্ধের নাভি-কেন্দ্র। উপ-মহাদেশের শান্তি ও স্থিতি এবং নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে কাশ্মীর কেবল পাক-ভারত সমস্যারই কেন্দ্রবিন্দু নয়। পাকিস্তান ও ভারত দুটি পরমাণু অস্ত্রসজ্জিত দেশ হবার কারণে দু'দেশের মধ্যে আর এক দফা যুদ্ধ বেঁধে গেলে তা পরমাণু যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারে। এ কারণে কাশ্মীর নিয়ে বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের অন্য সকল দেশেরও উদ্বিগ্ন হবার প্রশ্ন রয়েছে। বিগত কারগিল যুদ্ধের সময় পাক-ভারত পরমাণু যুদ্ধের কাছাকাছি উপনীত হয়েছিল।

www.pathagar.com

ইরাক-আফগান যুদ্ধের পরাজয় মাথায় নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন-ন্যাটো সামরিক জোট– তাদের অবস্থান বদল করে এশিয়ায় তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও মনযোগ সংহত করতে শুরু করেছে। আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী প্রায় পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েও ভূ-রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজিক কারণে আফগাস্তিান ছাড়তে পারছে না। রাশিয়া, মধ্য এশিয়া, ইরানকে চাপে রাখার সুযোগ হাতছাড়া করার লোভ সংবরণ করতে না পারা, পাকিস্তানের স্ট্রাটেজিক ও পরমাণু শক্তি স্থাপনার ওপর নজরদারি করা এবং ভারতের চীনা ভীতিকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকার চীন বিরোধী সামরিক অক্ষ তৈরির সমরনৈতিক রাজনীতি ক্রমশঃ জোরদার করা হচ্ছে। চীনের সমরশক্তি বৃদ্ধি ও ভারতকে ঘিরে ধরার কৌশল ভারতকে উদ্বিগ্ন করেছে। এই সুযোগে মার্কিন-ইসরাইল পাশ্চাত্য অক্ষ ভারতের কাছে বিপুল অস্ত্র বিক্রির সুযোগ হাতিয়ে নিচ্ছে। চীনারা লাদাখ ও আকসাই চীনে সেনা মোতায়েন করায় এবং ঐ এলাকায় সামরিক নজরদারি বৃদ্ধি করায় ভারতের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজাদ-কাশ্মীর রুটে চীন চাইলে পাকিস্তানে সড়কপথে সামরিক সহায়তা দিতে পারে। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের গদর-এ চীনা সহায়তায় পাকিস্তানের সমুদ্র বন্দর তৈরি ভারতের উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করা কিংবা সীমান্ত বিলোপ করে '৪৭-পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়ে কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভার অখণ্ড' ভারত তৈরির স্বপ্ন বিলাস সংকুচিত হয়ে আসছে। দিল্লী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথেও বৈরীতা হ্রাস করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায়। এতে তার আন্তরিকতার অভাব থাকা সত্ত্বেও এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানোসহ অন্তর্ঘাত পর্যায়ে বৈরীতা অব্যাহত রাখছে ভারত। কাশ্মীরসহ হিমালয়ান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে নয়া সামরিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, ভারত তাকে উপেক্ষা করতে পারছে না বলেই কাশ্মীর পলিসিকে অসামরিককরণ করে কাশ্মীরের জনগণের মন জয় করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হচ্ছে। মানুষের মন জয় ছাড়া যে 'রাজ্য' জয় স্থায়ী হয় না, ইতিহাসের এ সত্যকে ভারত বুঝতে শুরু করেছে কিনা, তারপরও এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও নতুন মেরুকরণ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে। এর কোনটাই দিল্লীর নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের জন্য সুখকর শুভ নয়। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং সহ বাঘা বাঘা নিরাপত্তা বিশ্লেষকও মাওবাদীদের উত্থানকে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড়ো সংকট বলে চিহ্নিত করেছেন। মাওবাদীদের সাথে আলোচনা-সংলাপ যেমন সফল হয়নি, তেমনি তাদের বিরুদ্ধে ঢালাও সামরিক বা আধা সামরিক অভিযান চালিয়েও বিশেষ সুবিধা করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি-চিদাম্বরম ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্তের প্রান্তসীমায় পৌঁছেও পিছু হটে এসেছেন।

www.pathagar.com

মাওবাদীরা সম্প্রতি কাশ্মীরের লড়াকু মানুষের আজাদী সংগ্রাম তথা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীর প্রতি সংহতি ঘোষণা করায় একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোও একই পথ অনুসরণ করলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। মাওবাদীরা তাদের নিয়ন্ত্রিত ৬টি রাজ্যে কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনতার পক্ষে সাধারণ ধর্মঘটের কর্মসূচী পর্যন্ত ঘোষণা করেছে। [Maoists Intensify Activities : call strikes in Six States supporting Kashmir, Shamsuddin Ahmed, Holiday, 10 September, 2010]

Instrument of Accession :

পণ্ডিত নেহেরুর চাণক্য নীতি

১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন। শিখদের সাথে সম্পাদিত 'অমৃতসর সন্ধি'-তে জম্মু-কাশ্মীরের ওপর বৃটিশ শাসকদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছাড়াই ডোগরা রাজাদের হাতে জম্মু-কাশ্মীর ছেড়ে দেওয়ার কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। প্রথমতঃ বৃটিশরা ভারতে তাদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য কোন শক্তিশালী দেশীয় রাজার অস্তিত্ব চায়নি। দ্বিতীয়তঃ কাশ্মীর উপত্যকায় পুরনো পথে বহিরাগতরা এসে যেন তাদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা হানি ঘটাতে না পারে, সে বিবেচনায়ও জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকায় কার্যকর কূটনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেছে। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার কাশ্মীরের ডোগ্‌রা রাজাকে কাশ্মীরের বৃটিশ প্রতিনিধির মর্যাদাকে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধির মর্যাদা স্বীকার করিয়ে নিতে বাধ্য করেন। এর আগে কাশ্মীরের বৃটিশ প্রতিনিধি পাঞ্জাবের শিখ রাজার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।

বৃটিশ সমরবিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করতেন, রাশিয়া উত্তর দিক থেকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হয়ে বারোগহিল ও ইশ্‌ককোমান পার হয়ে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডে হামলা চালাতে পারে। এ কারণে তারা হুনযা, নাগর, চিলাস, পুনিয়াল, ইয়াসিন ও গিলগিট অঞ্চলকে বিপজ্জনক মনে করতো। বৃটিশরা মহারাজার আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ন্ত্রণ ও কোন বৈদেশিক শক্তির সাথে সন্ধি সম্পন্ন রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ছিল। তারা ভারতে নিজেদেরকেই কেবল সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি মনে করতো। দেশীয় রাজাদের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত রাখাই ছিল তাদের রাষ্ট্রীয় পলিসি। এরপর থেকে বৃটিশরা রাশিয়ার সাথে আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণের পদক্ষেপ নেয়। মহারাজা রাশিয়ানদের কাছে নিজেকে স্বাধীন নৃ-পতি হিসেবে প্রমাণ করতে চাইতেন এবং বৃটিশের প্রতি তার আনুগত্যকে "প্রতীকী" বলে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন। এ বিষয়টিও বৃটিশদের শংকিত করে তোলে।

কাশ্মীরে বৃটিশ অনুগ্রহপুষ্ট ডোগ্‌রা মহারাজাকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর তারা

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের একটা আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেন। এর মাধ্যমে তারা বিদেশী শক্তির কাছে সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও নিজেদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছে।

১৯৩০ সালের ভারত শাসন আইনে প্রথম শাসনকার্যে ভারতীয়দের সীমিত অংশীদারিত্ব স্বীকৃতি পায়। কাশ্মীর উপত্যকায়ও এর ঢেউ আছড়ে পড়ে। ভারতের অন্যান্য স্থানে সরাসরি বৃটিশ শাসন বহাল থাকায় স্থানীয়দের শাসনকার্যে অংশীদারিত্ব সরাসরি স্বীকৃতি পায়। কিন্তু যেহেতু কাশ্মীর উপত্যকায় বৃটিশরা অবৈধভাবে একজন অত্যাচারী ও গণবিরোধী স্বঘোষিত রাজা চাপিয়ে দিয়েছে, তার ফলে ভারত-শাসন আইনের সুফল পাওয়া কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের জন্য কঠিন ছিল।

কাশ্মীর দীর্ঘকাল ধরে বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত, শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। সরকারী চাকুরী ও প্রশাসনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভূমিপুত্রদের কোন অধিকার ও হিস্যা ছিল না। ফলে 'কাশ্মীর কাশ্মীরিদের জন্য" উপত্যকায় ক্রমশঃ এই শ্লোগানের ভিত্তিতে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এক পর্যায়ে রাজ্য সরকারের উচ্চপদ ও প্রশাসনে কাশ্মীরিদের নিয়োগের দাবী কিছুটা মেনে নেয়া হয় বটে।

কিন্তু ডোগ্‌রা রাজা তা কার্যকর করেনি। তার রাজ্য প্রশাসনে, রাজস্ব বিভাগ ও সেনাবাহিনীতে কাশ্মীরি পণ্ডিত ও ডোগ্‌রা রাজপুত্র-শিখদের নিয়োগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কাশ্মীরি হিসেবে সরকারী সুযোগের প্রায় সবটুকুই সংখ্যালঘু স্থানীয় অভিজাত কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা দখল করে নিত। সেনা বাহিনীর উচ্চপদগুলো ছিল ডোগ্‌রা-রাজপুত্রদের জন্য সংরক্ষিত। কাশ্মীরি ভূমি পুত্রদের দীর্ঘকাল অসামরিককরণ করে রাখার ফলে তাদের পক্ষে অবৈধ ও বহিরাগত শাসকদের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ ছিল সীমিত। ১৯৪৭-পরবর্তীকালে ভারত সামরিক শক্তিতে জম্মু-কাশ্মীর দখল করে নিলে সেখানে লাখ লাখ ভারতীয় সেনা সদস্যদের পদচারণা দেখা গেলেও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা ভারতের কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীতে কাশ্মীরীদের প্রবেশাধিকার সীমিত করে রাখা হয়। একটি জাতিকে নিরস্ত্র ও অসামরিক করে রেখে গোলামীর শৃঙ্খল পরিয়ে রাখাই এর উদ্দেশ্য।

কাশ্মীর উপত্যকায় ডোগ্‌রা রাজার অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে লাহোরের মুসলিম মিডিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার চালায়। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে লাহোর থেকে আইন ডিগ্রী অর্জনকারী প্রথম কাশ্মীরী নেতা গোলাম আব্বাস সাংগঠনিকভাবে মহারাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে 'আন্‌জুমানে ইসলামিয়া' সংগঠনের ব্যানারে মুসলিম যুবকদের সংগঠিত করেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা মুসলিম গ্রাজুয়েট যুবকরাও এতে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রেমনাথ বাজাজ, গোলাম আব্বাস, মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ প্রমুখ। ১৯৩১ সালে ইউসুফ শাহ তার চাচাকে শ্রীনগরের মীর ওয়াইজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

মহারাজা হরি সিং আবদুল কাদির নামের এক প্রতিবাদী মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ মুসলিমরা কারাগারমুখী মিছিল নিয়ে এগুতে চাইলে হরি সিং বাহিনী নির্বিচার গুলি চালায়। এতে ২১ জন মুসলিম শহীদ হন। উত্তেজিত জনতা লাশ নিয়ে মিছিল করে শহরের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হন। হিন্দুরা ডোগ্‌রা মহারাজার পক্ষ নেয়।

শেখ আবদুল্লাহ : ইতিহাসের নায়ক থেকে খলনায়ক

ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্সে মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে শেখ আবদুল্লাহ কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। মুসলিম হবার কারণে মহারাজা সরকারে তিনি কোন উচ্চপদে চাকুরী পাননি। বিদেশে উচ্চশিক্ষার আশাও তাঁর পূর্ণ হয়নি। ১৯৩০-এর দিকে শেখ আবদুল্লাহর রাজনীতিতে আগমন। শেখ আবদুল্লাহর কোন এক পূর্বপুরুষ হিন্দুব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহীম কাশ্মীরের শাল ব্যবসায়ী। শেখ আবদুল্লাহ ভালো বক্তা ছিলেন এবং মানুষকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু অচিরেই মহারাজার কুনজরে পড়ে তিনি গ্রেফতার হন। ১০ মাস অন্তরীণ থাকার পর মুক্তি পেয়ে তিনি অন্যদের সাথে নিয়ে রাজনৈতিক সংগঠন All India Kashmir Committee গঠন করেন। ১৯৩১ সালের ১৩ জুলাই এর উদ্বোধনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সিমলায়।

এরপর শেখ আবদুল্লাহ তাঁর অপর বন্ধুদের নিয়ে 'মুসলিম কনফারেন্স' দল গঠন করেন। তিনি এর প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং গোলাম আব্বাস সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। শেখ আবদুল্লাহর ওপর আহমদিয়া কাদিয়ানীদের যেমন প্রভাব ছিল, তেমনি প্রভাব ছিল কাশ্মীরী পণ্ডিতদেরও। আর কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহেরু তো তাঁকে বন্ধুত্বের টোপ ফেলে দিকভ্রান্তই করে ফেলেন। ফলে শেখ আবদুল্লাহ মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের রাজনীতির বদলে কংগ্রেসের সেক্যুলার রাজনীতিকেই তাঁর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। দলের নাম থেকে 'মুসলিম' বাদ দিয়ে তিনি 'ন্যাশনাল' যুক্ত করে ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে কাশ্মীরে কংগ্রেসের যমজ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যানারে রাজনীতিতে আবির্ভূত হন।

কাশ্মীর ও ন্যাশনাল কনফারেন্স মুসলিম জাতীয়তাবাদের বদলে সেক্যুলারিজম গ্রহণ করায় কাশ্মীরী পণ্ডিত ও কংগ্রেসী 'সেক্যুলাররা' ন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিপি ধর, আই-কে-গুজরাল প্রমুখ। ডিপি ধর ১৯৭১-এ তার কমিউনিস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডকে কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে ভারতের ২০ সালা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ সরকারের ওপর দিল্লী সরকারের পক্ষে 'মগজ ধোলাই' উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেছেন। আই-কে-গুজরাল প্রথমে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 'গুজরাল ডকট্রিন'-এর উদ্ভাবক হিসেবে খ্যাত হয়েছেন।

www.pathagar.com

কংগ্রেসের সেক্যুলারিজম ইউরোপের সেক্যুলারিজমের কার্বন কপি নয়। যদিও ভারতীয় কংগ্রেসের দুই দিকপাল 'মহাত্মা' গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরু উভয়ই ইউরোপ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। কিন্তু কংগ্রেসের সেক্যুলারিজম হচ্ছে 'হিন্দুত্বের' শোভন সংস্করণ। এতে মুসলিমের মুসলমানিত্ব বিসর্জন দিতে হবে এবং 'ভারতীয়' জাতীয়তার নামে তাঁদের হিন্দুত্বের পূজারী হতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতভুক্ত না হয়ে একটি স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে তখনই অস্তিত্ব লাভ করে টিকে থাকতে পারবে, যখন মুসলিম জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্রকে তার রাজনৈতিক আইডেন্টিটি হিসেবে বুলন্দ করা সম্ভব হবে। কাশ্মীরের বৃহত্তর জনগণ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণগতভাবে মুসলিম বলেই শেখ আবদুল্লাহর মতো রাজনৈতিক নেতাদের উদ্ভব ঘটেছে এবং জনগণ তাঁকে 'শের-এ-কাশ্মীর' হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ কাশ্মীর উপত্যকা কেবল ভৌগোলিক কারণেই নয়, স্বতন্ত্র ও ভারতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এজন্যই থাকবে, যেহেতু কাশ্মীর একটি মুসলিম প্রধান জনপদ। শেখ আবদুল্লাহ কংগ্রেসের সেক্যুলারিজমের ধাঁন্ধায় সেক্যুলার রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে নেতৃত্ব ও দেশ দুটোই হারিয়েছেন। কংগ্রেস সেক্যুলার রাজনীতি করলেও গান্ধী নিজে ছিলেন প্রাচীন বৈদিক হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনবাদী 'মহাত্মা'। তাঁর রাজনীতির পাশাপাশি তাঁর ধর্মীয় আরাধনা-প্রার্থনাও চলেছে। গান্ধী বলতেন : 'আমাকে দ্যাখো, আমি-ই হিন্দু-মন।' হিন্দুত্ব ও হিন্দু বলয়ের সমর্থন বরাবরই কংগ্রেসের নেতাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। কংগ্রেসের সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রীডম' বইয়ে ভারত বিভক্তির জন্য পণ্ডিত নেহেরুর হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ ও হিন্দুত্বের বলয় ভেঙ্গে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উদারতায় তাঁর উত্তরণ না ঘটাকে দায়ী করেছেন। এ উপ-মহাদেশের মুসলিমদের সেক্যুলারিজম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তা, –'যা হিন্দুত্বের মুখোশ' মাত্র, তার কাছে ক্রমশঃ নিজেদের স্বকীয়তা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দেয়ার আত্মঘাতী প্রক্রিয়া বরণ করে নেয়া।

শেখ আবদুল্লাহ আহমাদিয়া কাদিয়ানীদের ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করেছেন, তা নিয়ে বিতর্কের কারণে অনেক মুসলিম নেতা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন মীর ওয়াইজ মোহাম্মদ ইউসুফ শাহ। এদিকে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল কনফারেন্সে গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। শেখ আবদুল্লাহ মনে করেন, জম্মু-কাশ্মীর যদি ভারত ফেডারেশনে যোগ দেয়, তাহলে মহারাজার পক্ষে নয়, কাশ্মীরের জনগণের পক্ষে তিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন। ১৯৩৬ সালর ৮ মে জম্মু-কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স Responsible Governmet Day কর্মসূচী পালন করে।

মীর ওয়াইজ ইউসুফ শাহ শেখ আবদুল্লাহ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর ১৯৩৮-এর ২৬ মার্চ শেখ আবদুল্লাহ মুসলিম কনফারেন্সে এক ভাষণে শিখ-হিন্দুদের সমন্বয়ে

www.pathagar.com

কাশ্মীরে একটি জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার প্লাটফরম গঠন করে জাতীয় আন্দোলন চালানোর মত প্রকাশ করেন। প্রেমনাথ বাজাজ তাঁর মতকে সমর্থন করেন। শেখ আবদুল্লাহ মুসলিম কনফারেন্স-এর নাম পরিবর্তন করে ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে কংগ্রেসের আদলে সেক্যুলার সংগঠন গড়ে তোলেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে মুসলিম লীগ নেতাদের কোন বাণী সংগ্রহের উদ্যোগ না থাকলেও কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহেরু এক বাণীতে তাঁর রাজনৈতিক সংহতি ঘোষণা করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন : "All the world is on the move and India must move with it, not seperately or in isolation. India must attain her full freedom based on unity. I hope that the Coference will view all these events that are happening in true perspective so that the people of Kashmir may attain their freedom in the larger freedom of India. [Kashamir in the Corossfire- P-109]"

ভারতের বৃহত্তর স্বাধীনতার মধ্যেই পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীরের স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করেছেন। তাই কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত রেখেই তিনি তাই বাণী দিয়েছেন।

১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সুপুর সম্মেলনে শেখ আবদুল্লাহর "নয়া কাশ্মীর" মেনিফেস্টো গৃহীত হয়। এই কর্মসূচী সেক্যুলার-সমাজতন্ত্রের মিশেল হিসেবে আলোচিত ছিল। মুসলিম ও হিন্দুদের রক্ষণশীল অংশ থেকে এই কর্মসূচীর প্রবল বিরোধিতা আসে। আই-কে-গুজরাল এবং ডিপি-ধরও তখন কাশ্মীরকেন্দ্রিক শেখ আবদুল্লাহর 'নয়া কাশ্মীর' আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। এঁরা দুজনই সর্বভারতীয় রাজনীতির বিশেষ স্থান দখল করেন। ন্যাশনাল কংগ্রেসকে মুসলিমরা কংগ্রেসের বি-টিম হিসেবেই মূল্যায়ন করেছেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখনও শেখ আবদুল্লাহর অনুকূলে না থাকায় শ্রীনগরে দলের ম্যানিফেস্টো ছাপতে কোন প্রেস রাজী হয়নি। আই-কে-গুজরাল লাহোরে তাঁর এক বন্ধুর প্রেস থেকে এটি ছাপেন। [Inder Gujral, Interview, New Delhi, 9 April, 1994/ প্রাগুক্ত-বই-পৃ. ১১১]

'Mother India' (New york, 1992, P-270) বইয়ের লেখক প্রণয় গুপ্ত দাবী করেছেন যে, শেখ আবদুল্লাহর জন্ম নিয়ে কিংবদন্তী আছে। এতে একটি বিস্ফোরক তথ্য উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন : "...The substantial rumour that Sheikh Abdullah was the llegal son of Moti Neheru."। পণ্ডিত নেহেরুর পিতৃসূত্রে শেখ আবদুল্লাহ তাঁর ভাই।

১৯৩৭ সালে শেখ আবদুল্লাহ রাজনৈতিক ইস্যুতে পণ্ডিত নেহেরুর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। লাহোর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় শেখ আবদুল্লাহ এ সময় নেহেরুর সফরসঙ্গী হন। সেখানে তাঁরা 'সীমান্ত গান্ধী' খান আবদুল গাফফার খানের সাথে রাজনৈতিক ইস্যুতে মতবিনিময় করেন। কাশ্মীরের সেক্যুলার শেখ এবং উত্তর-

১৬—

www.pathagar.com

পশ্চিম সীমান্তের 'সীমান্ত গান্ধী' গাফফার খানকে সাথে পেয়ে পণ্ডিত নেহেরু মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক ও শক্তিশালী প্রচারণা চালান। কাশ্মীরের রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্ডিত নেহেরু ১৯৪০-এ [পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের সময়] খান আবদুল গাফফার খানকে নিয়ে কাশ্মীর সফর করেন। ১৯৪১ সালে গোলাম আব্বাস শেখ আবদুল্লাহর সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করে মুসলিম লীগের রাজনীতির সমর্থক হন। তিনি মীর ওয়াইজ ইউসুফ শাহের সাথে মিলে মুসলিম কনফারেন্স পুনরুজ্জীবিত করেন। এ সংগঠনটি উপমহাদেশীয় মুসলিমদের পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। কাশ্মীরে মুসলিম লীগের সমর্থন থাকলেও জম্মুতে ডোগ্‌রা ও হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল।

১৯৩৫ সালের দিকে ভারতীয় কংগ্রেস কাশ্মীরের ব্যাপারে তাদের নীতি অবস্থান স্পষ্ট করে। এতে তারা প্রকারান্তরে কাশ্মীরকে ভারতের 'রাজ্য' হিসেবেই উল্লেখ করেন। [কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, ২৯ জুলাই-১, অগাস্ট, ১৯৩৫, আকবর রচিত, 'বিহাইন্ড দ্য ভ্যালি, পৃ-৮১, প্রাগুক্ত-১১১]

মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ। তিনি শুধু কাশ্মীরের ব্যাপারেই নন, রাজা শাসিত স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন কোন দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরোধী ছিলেন। এমনকি 'পাকিস্তান' নামকরণকারী চৌধুরী রহমত আলী কাশ্মীরকে পাকিস্তনের অন্তর্ভুক্ত দেখালেও তিনি তা অনুমোদন করেননি। জিন্নাহ সাহেব তাঁর স্বচ্ছ ও নীতিনিষ্ঠ অবস্থান থেকেই বলেছেন : "We do not wish to interfare with the internal affairs of any state, for that is a matter primalrily to be resolved between the rulers and the people of the states. "[Mohammad Ali Jinnah, 17 June, 1947, Speeches and Statements, Government of Pakistan, 1989, P-17, প্রাগুক্ত, পৃ-১১২]

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলিম লীগ বা জিন্নাহ সাহেবের সাথে শেখ আবদুল্লাহর সম্পর্ক কখনও আস্থা ও ওয়ার্কিং রিলেশন্সের অবস্থায় উপনীত হয়নি। ১৯৩৫ সালে জিন্নাহ-কাশ্মীর সফরে গেলে শেখ আবদুল্লাহর সাথে তাঁর প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বখশী গোলাম মোহাম্মদকে নিয়ে দিল্লীতে শেখ আবদুল্লাহ জিন্নাহর সাথে রাজনৈতিক ইস্যুতে আলোচনা করেন। জিন্নাহ সাহেব ১৯৪৪ সালে শেষবারের মতো কাশ্মীর সফর করেন। শ্রীনগরের শেখ আবদুল্লাহ, জি এম সাদিক, মাওলানা মাসুদি তাঁকে ব্যাপক সংবর্ধনায় বরণ করেন। ন্যাশনাল কনফারেন্সে ভাষণ দিয়ে জিন্নাহ সাহেব মুসলিম কনফারেন্সেও বক্তব্য রাখেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন : "If your objective is one, I am a Muslim and all my sympathies are for the Muslim cause." [প্রাগুক্ত, পৃ, ১১২]

www.pathagar.com

তবে শেখ আবদুল্লাহর সাথে জিন্নাহ সাহেবের রাজনৈতিক সম্পর্ক এরপর থেকে তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। কংগ্রেস শেখ আবদুল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক বাড়িয়ে দেয়। মুসলিম কনফারেন্সের নেতারা কাশ্মীরি ভাষাভাষী না হবার সুযোগে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন-পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেসী পণ্ডিতদের সহযোগিতায় শেখ আবদুল্লাহ ভারত ভাগের সময় কাশ্মীর উপত্যকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়ে ওঠেন।

শেখ আবদুল্লাহ নিজেও জানতেন যে, কাশ্মীর ভারতের সাথে যুক্ত হলে পাকিস্তান তা কখনও মেনে নেবে না এবং তাতে কাশ্মীর হবে দু'দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র। [Abdullah, Flames, P-83]। কিন্তু তিনি কাশ্মীরের ভারতভুক্তিও ঠেকাতে পারেননি। আবার কাশ্মীরকে ভারতের সামরিক শক্তি পরীক্ষার রণাঙ্গন থেকেও মুক্ত রাখতে পারেননি। প্রতারিত হয়ে শেখ আবদুল্লাহকে দীর্ঘকাল কারাবরণ করতে হয়েছে। শেষবারের মতো শেখ আবদুল্লাহ যখন মহারাজা শাসিত কাশ্মীরের প্রতিনিধি হিসেবে পণ্ডিত নেহেরুর সাথে দেখা করতে যান, তখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মহারাজা হরি সিংয়ের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক কাশ্মীর জুড়ে সামরিক শাসন জারী করেন।

কাশ্মীরের দুই শীর্ষ নেতা শেখ আবদুল্লাহ ও গোলাম আব্বাস কারাগারে থাকতে ১৯৪৭-এ মহারাজা হরি সিং আইনসভার নির্বাচন দেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স নির্বাচন বর্জন করে। মুসলিম কনফারেন্স নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী দাবী করে। তারা মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সমর্থন আশা করলে মুসলিম লীগ হাইকমান্ড দেশীয় রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতিগত সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ভারত হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্র সফল করেছে প্রায় বিনা বাধায়। মুসলিম লীগের নেতাদের এই নিস্পৃহতাকে কাশ্মীরের জনগণ ভালোভাবে নেননি।

শেখ আবদুল্লাহর মোহমুক্তি

গভর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স ডোগ্রা রাজা গুলাব সিংয়ের সাথে বৃটিশ শাসকদের অনৈতিক ও অবৈধ সম্পর্ক, কাশ্মীর ইজারা দানের ইতিহাস উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন : "We handed it over to the Dogra Rajput, Gulab Singh, who paid up down at once in the hard cash which he had stolen form the Lahore darbar. [UN security council official Records, third year, Doc. 1-15. P-337]

লাহোরের শিখ দরবার থেকে অর্থ চুরি করে গুলাব সিং সেই অর্থ বৃটিশদের ঘুষ দিয়ে কাশ্মীরের ইজারা চুক্তিপত্র খরিদ করেছিলেন।

ডোগ্রা রাজা হরি সিংয়ের দুঃশাসন ও যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকায় আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য থেকে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলনের ধারায় শেখ আবদুল্লাহর রাজনৈতিক উত্থান ঘটে। ক্ষয়িষ্ণু ও গণবিরোধী রাজতন্ত্রের দুর্দিন

www.pathagar.com

আঁচ করেই পণ্ডিত নেহেরু শেখ আবদুল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতার ঐক্য গড়ে তোলেন। তবে পণ্ডিত নেহেরুকে বিশ্বাস করে শেখ আবদুল্লাহ প্রতারিত হয়েছেন এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা হারিয়েছেন। পণ্ডিত নেহেরু ডোগ্‌রা রাজার রোষানলে পড়ে গ্রেফতার হলে পণ্ডিত নেহেরু তাঁর পক্ষে ডোগ্‌রা রাজার বাধার মুখে পড়েন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাহায্যে তিনি শেখ আবদুল্লাহকে মুক্ত করেন। এমনকি এ সময় পণ্ডিত নেহেরুকেও ডোগ্‌রা রাজা গ্রেফতার করেছিলেন। ডোগ্‌রা রাজার বিরুদ্ধে কাশ্মীরের জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমর্থন করে পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীরের রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। অর্থাৎ কাশ্মীরের রাজনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ওপর কংগ্রেস নেতাদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল স্বাধীনতা লাভের কয়েক দশক আগে থেকেই। গান্ধিজীর দৌত্যকর্মে নেহেরু বিরোধী ও মহারাজার পাকিস্তানপন্থী প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক-কে শিখ-বংশোদ্ভূত রাণীর মাধ্যমে অপসারণ করে তার জায়গায় পাঞ্জাবী মেহের চাঁদ মহাজনকে নিয়োগ দেওয়ার মধ্যদিয়ে ভারতের কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন আরও সহজ হয়।

বৃহত্তর স্বাধীন ভারতের মধ্যে স্বাধীন কাশ্মীরের যে ধারণায় ও প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে শেখ আবদুল্লাহ স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ছিল রাজনৈতিকভাবে অবাস্তব এবং কংগ্রেসী নেতাদের মানস- প্রকৃতিরও বিরোধী। ভারতের কংগ্রেস নেতারা যদি ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো মেনে নিতে পারতেন, তাহলে ক্যাবিনেট মিশন প্লানেই উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক সমাধান ঘটতো। বিভাজনের মধ্য দিয়ে দুই রাষ্ট্রের প্রয়োজন হতো না। যারা স্বাধীন ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক হিস্যা দিয়ে অখণ্ড ভারত রাখতে চায়নি, তারা কাশ্মীরের স্বাধীনতা মেনে নেবেন, এটা বিশ্বাস করা ছিল ইতিহাসের শিক্ষাকে অস্বীকার করা। সুতরাং শেখ আবদুল্লাহর প্রত্যাশা : .....Kashmir may attain its freedom in the larger freedom of India. [সূত্র M. J. Akbra, Kashmir Behind the vale, P-77] ছিল একটি মায়া মরীচিকা। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত শেখ আবদুল্লাহ ভারতের বৃহত্তর স্বাধীনতার মধ্যে 'স্বাধীন' কাশ্মীরের স্বপ্ন পোষণ করেছেন। গোয়েন্দা অন্তর্ঘাত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভারত ন্যাশনাল কনফারেন্সে বখশী গোলাম মোহাম্মদ ও মীর কাসিমদের মতো দালাল-বশংবদ তৈরি করে শেখ আবদুল্লাহকে বন্দী করে কারাগারে পাঠায়।

মহারাজার বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে শেখ আবদুল্লাহ প্রকাশ্য জনসভার ভাষণে বলেন : "I never believed in Pakistan Slogan. Pandit Neheru is my freind and I hold Gandhiji in real reverence." [সূত্র : প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-১০৫]। দিল্লীতে শেখ আবদুল্লাহ পণ্ডিত নেহেরুর আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। পাঞ্জাবের মুসলিম প্রধান গুরুদাসপুর জেলার ভারতভুক্তির মাধ্যমে পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীরের সাথে ভারতের যোগাযাগসূত্র স্থাপন করে নিয়েছেন আগেই। এটা ছিল ষড়যন্ত্র এবং কাশ্মীরকে দখলে নেবার ভারতীয় সামরিক স্ট্র্যাটেজির অংশ।

www.pathagar.com

শেখ আবদুল্লাহ এমন সময় ভারতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ান, যখন তাঁর রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার অভাব এবং তাঁর হঠকারী সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত জনমতকে তিনি কাজে লাগিয়ে পণ্ডিত নেহেরু ও স্ব-দলীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সফল হতে পারেননি। নেহেরু-প্যাটেলরা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ মুসলিম নেতৃত্ব, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রফি আহমদ কিদওয়াই, এম সি চাগলা (আসাম) ও 'সীমান্ত গান্ধী' খান আবদুল গাফফার খানের মাধ্যমে শেখ আবদুল্লাহকে ভারতমুখী করে রাখার সর্বাত্মক তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ১৯৫৩-এর অগাষ্টে মার্কিন কূটনীতিক ও পাকিস্তানের সাথে মিলে কাশ্মীর স্বাধীন করার অভিযোগ এনে শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়। ১১ বছর পর ১৯৬৪-এর ৮ এপ্রিল তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর আবার যখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তখন তাঁর কারাবরণ ছিল আরও প্রলম্বিত এবং তিনি যখন মুক্তি পান, তখন তাঁর বয়স ৭৫।

শেখ আবদুল্লাহর কমিটমেন্ট ও পলিটিক্যাল ডাইমেনশন নিয়ে পণ্ডিত নেহেরুর মনে ক্রমশঃ সন্দেহ তৈরি হয়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ যেমন শেখ আবদুল্লাহর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে, তেমনি ভারত যে ক্রমশঃ কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে, তা নিয়েও তাঁর ক্ষোভ বাড়তে থাকে। তিনি মনে করতেন, ভারতের সাথে থাকলেই তারা নিরাপদ থাকবেন এবং সেক্যুলার ভারতের গণতান্ত্রিক সহযোগিতায় কাশ্মীরের জন্য অধিকতর লাভবান হবেন। কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রতিশ্রুতির আড়ালে যে ভারতের হিংস্র আগ্রাসী রূপ লুক্কায়িত ছিল, তা যখন শেখ আবদুল্লাহ বুঝতে পেরেছেন, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরের ক্ষমতায় ছিলেন। তবে রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে দিল্লী শেখ আবদুল্লাহকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিতে মোটেও বিলম্ব করেনি। শেখ অবদুল্লাহর রাজনৈতিক সহযোগী বখশী গোলাম মোহাম্মদ, জি এম সাদিক প্রমুখ রাজনীতিক এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু শিখ সহযোগী তাঁর অপসারণে দিল্লীর সাথে হাত মিলায়। ১৯৫৩ সালের অগাস্ট শেখ আবদুল্লাহর সরকার বরখাস্ত করার পর বখশী গোলাম মোহাম্মদ চীফ মিনিস্টার পদে আসীন হন। ভারত সরকার ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আর তাঁকে রাজনীতিতে ফিরতে দেয়নি। দীর্ঘ দুই দশক তাঁকে ভারত সরকারের মেহমান হিসেবে কারাগারে কাটাতে হয়েছে। শেখ আবদুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে দিল্লী সরকার একদিনের জন্যও তাঁকে মুক্ত রাখেনি। সাথে সাথেই কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

শেখ আবদুল্লাহকে কারাগারে রেখেই ভারত কাশ্মীরের Constituent Assembly-তে Act of Accession এবং ইন্ডিয়ান সংবিধানের প্রতি অনুমোদন আদায় করে নেয়া হয়। যদিও এটা ৩০৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ভারতের সংবিধানের কাশ্মীরকে 'বিশেষ মর্যাদা'-র পরিপন্থী।

www.pathagar.com

১৯৫৮-এর জানুয়ারীতে মুক্তি পেলেও ২ মাসের মধ্যে শেখ আবদুল্লাহকে আবার গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। কংগ্রেসের বিশ্বস্ত বখশী গোলাম মোহাম্মদ সরকারের কঠোর সমালোচনা ছাড়াও শেখ আবদুল্লাহ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে গণভোট দাবী করেন, ভারত সরকার এবার শেখ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী মদদপুষ্ট হয়ে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবী তোলার অভিযোগ আনে।

মহারাজার উভয় সংকট

ভারতের নয়া রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবন এবং কাশ্মীর উপত্যকায় যে নয়া রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটে, মহারাজা হরি সিং তাকে বুঝতে পারেননি বা চাননি। ন্যাশনাল কনফারেন্সকে তিনি যেমন হুমকি মনে করেছেন, তেমনি মুসলিম কনফারেন্সকেও মেনে নেননি। তাঁর ক্ষমতা রক্ষার দুটি শর্ত তিনি উপেক্ষা করেছেন। প্রথমতঃ তিনি নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দাবী করে সকল দলের সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে পারতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি উপত্যকার স্বাধীনতা রক্ষায় জাতীয় ঐক্যের ডাক দিতে পারতেন। রাজনৈতিক বিবর্তনের দিকে নজর না দিয়ে মহারাজা মধ্যযুগীয় রাজতান্ত্রিক কৌশলে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে টিকে থাকতে চেয়েছেন। ভারতের কাশ্মীর আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার মতো সামরিক শক্তি মহারাজার ছিল না। উপরন্তু কাশ্মীরের শক্তিশালী হিন্দু পণ্ডিতরা কাশ্মীরের ভারতভুক্তির জন্য কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছে। মহারাজা ও তার ডোগ্‌রা জনগোষ্ঠী কাশ্মীরের ভূমিপুত্র নন, তারা বহিরাগত এবং তার পূর্ব পুরুষের ক্ষমতারোহণের ইতিহাস প্রতারণা ও ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে অবৈধ দেশ বিক্রির সাথে যুক্ত।

মহারাজা হরি সিং-এর পুত্র করন সিং তাঁর পিতা সম্পর্কে লিখেছেন : "He was hostile to the Indian National Congress, led by Gandhi, Neheru and Patel, partly because of close freindship with Abdullah." [Kashmir in Crossfire-Victoria schofield. অন্যদিকে মহারাজা হরি সিং মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বেরও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। করনসিং লিখেছেন : "when the crucial moment came, ... he found himself alone and friendless." Singh, Heir Apparent, P-42/প্রাগুক্ত-পৃ-১১৭]

করনসিং জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীনতা নস্যাতের পেছনে স্বামী সন্ত দেব-কে সরাসরি দায়ী করেছেন। এই ধর্মীয় নেতার প্ররোচনায় মহারাজা এক ইউটোপিয়ান হিন্দু রাজ্যের মরীচিকায় অন্ধ ছিলেন। করন সিং লিখেছেন : "The Swami encouraged the Maharaja's feudal ambitions 'planting in my father's miind vision of an extended kingdom sweeping down to Lahore itself where our ancestors Maharaja Gulab Singh and Raja Suchet Singh had played such a crucial role a century earlier." [ibid, P-38]

www.pathagar.com

লর্ড মাউন্টব্যাটেন চাইলে ভারত ত্যাগের আগেই কাশ্মীর উপত্যকায় গণভোট অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সেখানকার সমস্যার নিষ্পত্তি করে দিতে পারতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা ছাড়াও সিলেটের পাকিস্তান ভুক্তির ব্যাপারে যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে, তাহলে কাশ্মীরের গণভোট অনুষ্ঠানকে কেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করেননি? এখানেই কংগ্রেসের চাতুরী ও মাউন্টব্যাটেনের সাথে তাঁদের গোপন আঁতাতের বিষয়টি উঠে আসে। সবাই জানেন, মাউন্টব্যাটেন ছিলেন পণ্ডিত নেহেরুর বন্ধু এবং তার স্ত্রী এডুইনা ছিলেন পণ্ডিত নেহেরুর প্রণয়ী। ভারতের কাশ্মীর দখলের পর পণ্ডিত নেহেরু যখন প্রথমবার কাশ্মীর সফর করেন, তখন এডুইনা লন্ডন থেকে এসে কাশ্মীরে তাঁকে সঙ্গ দেন। তাছাড়া মাউন্টব্যাটেনকে ভারত বিভক্তির সময় ভারতের ভাইসরয় হিসেবে নিযুক্ত করার ব্যাপারে লন্ডনে রাণীর কাছে কংগ্রেসী নেতারা দেন-দরবার করেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রেখে ভারতকে গ্রাস করার জন্য কাশ্মীরকে অরক্ষিত রেখে দেন। এমনকি মাউন্টব্যাটেন চাইলে হিন্দুপ্রধান মুসলিম নিজাম-শাসিত হায়দ্রাবাদের সাথে মুসলিম প্রধান হিন্দু রাজা শাসিত কাশ্মীরকে বিনিময় করে পাকিস্তানের ভাগেও কাশ্মীরকে ফেলতে পারতেন।

কাশ্মীর যাতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় অথবা কাশ্মীর যাতে ভারতে যোগ দিতে বাধ্য হয়, লর্ড মাউন্টব্যাটেন সে লক্ষ্যেই কাজ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুন ভাইস রয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন শ্রীনগর সফর করেন। তিনি পণ্ডিত নেহেরুর ব্রীফ এবং কাশ্মীর সংক্রান্ত লিখিত গাইড লাইন সাথে নিয়ে শ্রীনগর আসেন। তার লক্ষ্য ছিল, মহারাজাকে ভারতে যোগদানে সম্মত করানো। নেহেরু মহারাজাকে চাপে রাখতে শেখ আবদুল্লাহকে লাইমলাইটে নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স ইন্ডিয়ান কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল। পাকিস্তান মুসলিম লীগ, জিন্নাহ এবং দ্বি-জাতি তত্ত্ব নিয়ে শেখ আবদুল্লাহর অনীহা ও অশ্রদ্ধা ছিল সুবিদিত।

কিন্তু মহারাজা হরি সিং ভারত বা পাকিস্তান কারও সাথেই যুক্ত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মহারাজার পুত্র করন সিং বলেছেন : 'My father wanted neitter to accede to India nor to Pakistan. He was thinking in terms of an Indepemdent kashmir, which would have stayed as a zone of peace between India and Pakistan." [Interview with Aouthor Omkar Razdan, at Delhi, on 25th April, 1997].

মহারাজার প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক-কে ভারতের পক্ষে ওকালতির জন্য ব্যবহার করা হয়। মাউন্টব্যাটেন মহারাজার প্রতি পাকিস্তানের সাথে যোগ না দিতে রীতিমতো হুঁশিয়ারী দেন। [সূত্র : V.P. Menon, The Story of The Intigration of the Indian States, Calcutta, 1936, p-394/প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২২]

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের শ্রীনগরে অবস্থানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহারাজা

www.pathagar.com

অবহিত ছিলেন বলেই তিনি দারুণ অস্বস্তিতে ছিলেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে মাছ শিকারসহ নানা স্থূল ও বিনোদনমূলক কর্মসূচীতে ব্যস্ত রাখেন। মাউন্টব্যাটেনের চাপ নাকচ করতে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে আড়াল হতে একদিন সময় নিলেন। কিন্তু পরদিন অসুস্থতার অজুহাতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে রাজা দেখা দেননি।

ব্যর্থ হয়ে মাউন্টব্যাটেন দিল্লী ফিরে গেলে নেহেরু হতাশ হন। পণ্ডিত নেহেরু মাউন্টব্যাটেনের কাছে এক লিখিত পত্রে জানান : "There was considerable disappoitnment at the lack of results of your visit." [Neheru to Mount Batten 27 July, 1947, In Transfer, Vol-XII. Doc. 249, P-368/প্রাগুক্ত পৃ-১২২]

মাউন্টব্যাটেন মহারাজার কাছে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি প্রসঙ্গ উত্থাপনের সুযোগ নিতেই মহারাজা অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। ভিপি মেনন, যিনি স্বাধীনতা পূর্বকালে ভারত সরকারের সাংবিধানিক উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁর মতে, মহারাজা স্বাধীন জম্মু-কাশ্মীর গঠনের বাইরে আর কোন চিন্তা করেননি। যদিও মাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণের চাপে মহারাজা পাকিস্তানে যোগ দিলে তাকে 'an unfairly act' – হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ভারতের প্রতি মহারাজাকে নমনীয় করতে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলও পত্র যোগাযোগ করেছেন। [সূত্র : Patel to Harri Singh, 3 July 1947, in Transfer, Vol-Xll, Doc-34, P-33/প্রাগুক্ত-১২৩] প্যাটেল ছিলেন কংগ্রেস তথা ভারত সরকারের পক্ষে 'দেশীয় রাজ্য' সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মাউন্টব্যাটেনের মিশন সফল না হলেও কংগ্রেস নেতারা, বিশেষ করে পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীর দখল করার অভিসন্ধি ত্যাগ করেননি। পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীরের ব্যাপারে এতটাই অন্ধ ছিলেন যে, তাঁকে কাশ্মীর ও দিল্লীর মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বললে তিনি হয়তো কাশ্মীরের উপরই বাজি ধরতেন। প্যাটেলকে এক পর্যায়ে নেহেরু বলেছেন : 'Kashmir meant more to him than anything elese.' [প্রাগুক্ত-পৃ-১২৩] ভারত স্বাধীন হবার অব্যবহিত পর পণ্ডিত নেহেরু নিজেই কাশ্মীর সফরের উদ্যোগ নিলে সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে মাউন্টব্যাটেন তাকে নিবৃত্ত করেন। কাশ্মীরের বৃটিশ রেসিডেন্ট উলফ্রেডকেও মাউন্টব্যাটেন এ নিয়ে পত্র লিখেন। [সূত্র : Mount Batten to Webb, 28 June, 1947, Transfer, vol-Xll, Doc-302, P-449/প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-১২৩]

মাউন্টব্যাটেন লিখেন : '....a visit by him to Kashmir at this moment could only produce a most explosive situation.'। এ কারণে মাউন্টব্যাটেন নেহেরুর বদলে গান্ধীকে কাশ্মীর পাঠাতে পরামর্শ দেন।

www.pathagar.com

পণ্ডিত নেহেরুকে মহারাজা হরি সিং শুধু অপছন্দই করতেন না, প্রচণ্ডভাবে ঘৃণাও করতেন। এর আগে মহারাজা নেহেরুকে শ্রীনগরে গ্রেফতারও করেছিলেন। ভারত থেকে বৃটিশ শাসকের বিদায়কালে পণ্ডিত নেহেরু অযাচিতভাবে কাশ্মীর গেলে একটা বড়ো ধরনের গোলযোগ ঘটতে পারে এবং এমনকি নেহেরুকে আবারও মহারাজা গ্রেফতার করতে পারেন। সবদিক বিবেচনায় কাশ্মীর মিশনে গান্ধিজীকে পাঠানোই উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়।

যদিও কোন মুসলিম লীগ নেতা বিরোধপূর্ণ হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় বা কাশ্মীর সফরে যাননি। পণ্ডিত নেহেরুর ব্যক্তিগত আবেগকে ব্যবহার করে ভারত কাশ্মীর সম্পর্কে একটা 'মীথ' তৈরি করেছে। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালিনী পর্যন্ত পাঞ্জাবের পাতিয়ালা, ফরিদকোট, কাপুরথালা সফর করে ঐসব এলাকাকে ভারতে যোগ দিতে প্রচার চালান।

১৯৪৭ সালের ১ লা অগাস্ট, ভারত স্বাধীন হবার দু'সপ্তাহ পূর্বে দিল্লীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে 'অহিংসার অবতার' গান্ধিজী কাশ্মীরি জনগণের স্বাধীনতা হরনের মিশন নিয়ে শ্রীনগর যান। পথে বারমূলায় গান্ধীজি কাশ্মীরি জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে পড়েন। এমনকি বিক্ষোভকারীরা তাঁর গাড়ির কাঁচ ভেংগে ফেলে। কিন্তু গান্ধিজী তাঁর এ সফরকে 'শান্তির লক্ষ্যে অরাজনৈতিক সফর' হিসেবে উল্লেখ করে ধোঁকা দিয়ে শ্রীনগর প্রবেশ করতে সক্ষম হন। শ্রীনগরে মহারাজা হরি সিং ও তার রাণীর সাথে গান্ধিজী সাক্ষাৎ করেন। অনেকে মনে করেন, শিখ রাণীর মাধ্যমে গান্ধিজী মহারাজার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। গান্ধিজী তাঁর সফরকে যে অরাজনৈতিক ধারায় সীমাবদ্ধ রাখেননি, বৃটিশ সূত্রও তা স্বীকার করেছে।

ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী শহীদ হামিদ লিখেছেন : 'In reality it was to presesurise the Maharaja to accede to India and to remove Kak.' [প্রাগুক্ত-পৃ.১২৪] প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক-কে অপসারণ এবং মহারাজার ওপর কাশ্মীরকে ভারতের সাথে যুক্ত করার ব্যাপারে মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি করাই ছিল গান্ধিজীর কাশ্মীর সফরের লক্ষ্য। তাঁর এ সফরের পরই মহারাজা হরি সিং তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরি পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক-কে অপসারণ করে কংগ্রেস বান্ধব মেহেরচাঁদ মহাজনকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন।

জিন্নাহ সাহেব বার বার মহারাজার কাছে কাশ্মীরের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। [সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪] জিন্নাহ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন : 'Wisdom demands that the feelings and sentiments of the Muslims who form 80 percent of the population should not ignored, much lees hurt' [প্রাগুক্ত]

এমনকি জিন্নাহ সাহেব জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার

www.pathagar.com

প্রতিও সম্মতি জানিয়েছেন। [সূত্র : Mohammad Ali Jinnah, 17 June, 1947, Speches and Statesments, p-17, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫]

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪৭ সালের ৫ জুন পাকিস্তানের অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতে বলা হয় : 'The resolution went on to say that once presnet positions had subsided the false doctrine of Two Nations theory will be descried and discarded by all.' [প্রাগুক্ত, পৃ-১৩১]

১৯৪৭ সালের ১২ অগাস্ট মহারাজা হরি সিং পাকিস্তানের সাথে একটি 'stand still' চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তান বৃটিশ শাসন মুক্ত হয়ে একটি নয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ সত্ত্বেও কাশ্মীরের সাথে যে বাণিজ্য, পর্যটন, যোগাযোগসহ অন্যান্য সম্পর্ক ছিল তা অব্যাহত থাকবে। ভারত এ চুক্তিতে খুশী ছিল না। কাশ্মীর নিয়ে ভারতের আগ্রাসী দুরভিসন্ধি মুকাবিলায় পাকিস্তানী নেতারা দূরদর্শী পরিকল্পনা নেননি। মহারাজার সাথে তারা যে stand still চুক্তি সম্পাদন করেছে, ভারত কাশ্মীর দখল করে নিলে সে চুক্তিই শুধু অকার্যকর হবে না, পাকিস্তানের নিরাপত্তাও চাপের মুখে পড়বে। পরিস্থিতি এবং কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের আলোকে পাকিস্তানের কাশ্মীর ইস্যুতে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার প্রত্যাশা ছিল। পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর কাশ্মীরের মুসলিমরা পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করেন। তবে মহারাজার পুলিশ তা নামিয়ে ফেলে। পাকিস্তানপন্থী সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উপজাতীয় মুসলিমদের গণ-অভ্যুত্থান

বৃটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মিতে কর্মরত সৈনিকদের মধ্যে ৭০ হাজারেরও বেশী সদস্য ছিলেন, যারা জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের অধিবাসী। এদের মধ্যে মুসলিম সৈনিকদের সংখ্যা ৬০ হাজারেরও বেশী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মহারাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেলে মহারাজা উপজাতীয় মুসলিমদের সেনাবাহিনীতে রিক্রুট বন্ধ করে দেন। যুদ্ধশেষে এসব সৈনিক কর্মস্থলে যোগ দিতে না পেরে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে হতাশ হয়ে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যান। এদিকে পুঞ্চ এলাকার মুসলিম উপজাতীয়রা মোটামুটি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন। মহারাজার পুঞ্চের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ঐ এলাকার মানুষের ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যুদ্ধ ফেরৎ বেকার সৈনিকদের অসন্তোষ একত্র হয়ে মহারাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের পটভূমি তৈরি হয়।

১৯৪৭-এর বসন্তকালে পুঞ্চ-এ কর প্রদান বন্ধের আন্দোলন শুরু হয়। মহারাজা শিখ ও হিন্দু সেনাদের ব্যবহার করে কর প্রদানে জনগণকে বাধ্য করতে চান। সরদার মোহাম্মদ ইব্রাহীম কয়েক হাজার উপজাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী নিয়ে মহারাজার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। তার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তারা

www.pathagar.com

স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সূত্র থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য, পুঞ্চ এলাকায় মুসলিম অধিবাসীদের ওপর প্রতিবেশী জম্মু থেকেও ডোগ্রা মহারাজার সেনাদল দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার-নির্যাতন-লুণ্ঠন চালিয়ে আসছিল। পাকিস্তানের সাথে মহারাজার 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' থাকা সত্ত্বেও মহারাজা ঝিলাম নদীর তীর পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এতেও উত্তেজনা ও অবিশ্বাস বেড়ে যায়। বৃটিশ মেজর জেনারেল স্কট ছিলেন ডোগ্রা মহারাজার কমান্ডার ইন চীফ। কিন্তু মহারাজা তার ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। তার জায়গায় একজন ভারতীয় সেনা কমান্ডার নিয়োগ করা হয়।

এদিকে কাশ্মীর উপত্যকায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ রুট পরিহার করে পাঠানকোট রুটে ভারত-শ্রীনগরে সৈন্যবাহিনী পাঠায়। সেনা পারাপারের জন্য তারা রাভী নদীতে দ্রুত নৌকাব্রীজ তৈরি করে। মহারাজা নিজেও দিল্লীর সাথে বিকল্প সামরিক যোগাযোগ উন্নয়নে ইচ্ছুক ছিলেন। যাতে পাকিস্তান বাধা দিলেও তার অসুবিধা না হয়। তবে ভারতীয় দখলদার বাহিনীর প্রথম দলটি বিমান যোগে শ্রীনগরে অবতরণের আগেই ভারত অবৈধভাবে অতিদ্রুতগতিতে কাশ্মীরকে তাদের কেন্দ্রীয় পোস্টাল সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসে। ভারত মহারাজা হরি সিং-কে শেখ আবদুল্লাহর সাথে সন্ধি করে চলার পরামর্শও দেয়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৭-এর ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহারাজা শেখ আবদুল্লাহকে বন্দী করে রাখেন। পাক-ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ও তিনি কারাগারে। কারামুক্তির পর শেখ আবদুল্লাহ ভারতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র দেখতে পান। এতে কাশ্মীরের রাজনৈতিক স্টেটাস নিয়ে তিনি অনিশ্চয়তায় পড়েন।

শেখ আবদুল্লাহ দাবী তুললেন : '... We the people of Kashmir must now see to it that our long cherished dream is fulfilled. The dream of freedom, welfare and progress. [Abdullah, Speeches at Huzuribag, 2 October, 1947, in Flames, P-86]

শুরুতে শেখ আবদুল্লাহ ভারতের আগ্রাসী পরিকল্পনার ভয়ংকর রূপ অনুধাবন করতে পারেননি। পণ্ডিত নেহেরু ১৯৪৭-এর অক্টোবরে অল ইন্ডিয়া স্টেটস পিপলস কনফারেন্সের সেক্রেটারী দ্বারকানাথ কেচরু-কে শেখ আবদুল্লাহর মনোভাব পরিবর্তনের মিশন নিয়ে শ্রীনগরে পাঠান। তিনি দিল্লীতে ফিরে গিয়ে জানান যে, শেখ আবদুল্লাহ ভারত ইউনিয়নে যোগ দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি তারা গোপন রাখেন। কেচরু মহারাজার সাথে যে কোন ধরনের চুক্তি সম্পাদনসহ শক্তি প্রয়োগে কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করার সুপারিশ করেন। তার মতে অন্যথায়, মুসলিম লীগ নেতা ও উপজাতীয় প্রাইভেট সেনাবাহিনী মিলে কাশ্মীর দখল করে নেবে। তখন ভারতের কিছুই করার থাকবে না।

শেখ আবদুল্লাহ দিল্লী সফরের পর লাহোরে গিয়ে পাকিস্তানী নেতাদের সাথেও

www.pathagar.com

আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তার আগেই তিনি জি এম সাদিক ও ড. তাসিরকে লাহোরে পাঠান। বখশী গোলাম মোহাম্মদ আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করছিলেন। এ সময় পাকিস্তানে দ্রুত এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, কাশ্মীর পাকিস্তানের সাথে থাকবে। কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তানের ধনী ব্যক্তিরা ভূমি খরিদেও তৎপর হন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান শ্রীনগরে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। মহারাজার সাথে কূটনৈতিক চ্যানেলে পাকিস্তানের যোগাযোগ থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে রামচন্দ্র কাক-কে অপসারণ করে তার জায়গায় ভারতপন্থী মেহের চাঁদ মহাজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করায় পাকিস্তানের পক্ষে মহারাজার সাথে অর্থবহ সম্পর্ক রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী মহাজন নিজের বুদ্ধি-এখতিয়ারে ভারতকে প্রয়োজনে সেনা পাঠাতে আগাম অনুরোধ জানান। ভারত মহারাজার সম্মতি আদায় ছাড়াও কাশ্মীরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় নেতা শেখ আবদুল্লাহর সমর্থন আদায়ের জোরদার প্রচেষ্টা চালায়। প্রধানমন্ত্রী ও মহারাজার প্রতি ভারতের পরামর্শ ছিল, যে কোন মূল্যে শেখ আবদুল্লাহর সাথে সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। সরদার প্যাটেলও এ ব্যাপারে মহাজনকে তাকিদ দিয়ে চিঠি লিখেন। এতে তিনি লিখেন : '... It is my sincere and earnest advice to you to make a substantial gesture to win Sheikh Abdullah's support.' [প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৮]

এরপরই প্রধানমন্ত্রী মহাজন প্যাটেলের কাছে সামরিক সাহায্যের অনুরোধ করেন। প্রধানমন্ত্রী মহাজনের একমাত্র মিশন ছিল কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কংগ্রেসের মিশন বাস্তবায়ন করা। পাকিস্তান সরকারী ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কাশ্মীর দখল করে ভারতের কাশ্মীর দখলের সামরিক অভিযান প্রতিরোধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। উপজাতীয় মুজাহিদরা নিজেদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কাশ্মীরের জনগণের আজাদী পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে সশস্ত্রভাবে জড়িয়ে পড়েন।

জনগণের 'জিহাদ' অধ্যায়

মহারাজা হরি সিং কার্যতঃ সিদ্ধান্তহীন ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, কাশ্মীরের বৃহত্তর জনগণের সমর্থন তাঁর সাথে ছিল না। সামরিক শক্তিও তাঁর ব্যাপক ছিল না, যা নিয়ে তিনি ভারত ও উপজাতীয় মুসলিমদের আক্রমণ মুকাবিলা করতে পারেন। এ অবস্থায় তাঁর অসহায়ত্ব ভারতের ওপর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে নির্ভরশীল করে তোলে।

মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও সীমান্ত মুজাহিদরা ঝিলাম নদী অতিক্রম করে কাশ্মীরে ঢুকে পড়েন। কাশ্মীরের নির্যাতিত মুক্তিকামী মানুষও মুজাহিদদের অভিযানকে সমর্থন জানান এবং তাদের সাথে যোগ দেন। কাশ্মীরের মুসলিম কনফারেন্স নেতারা বন্দী থাকায় এবং পাকিস্তান সরকারীভাবে এ অভিযান সমর্থন করতে না পারায় মুজাহিদ বাহিনী ছিল রাজনৈতিক দিকনির্দেশনাহীন। প্রফেসর জায়েদী লিখেছেন : মুজাহিদদের এ

www.pathagar.com

অভিযানে জিন্নাহ সাহেবের কোন সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং উপজাতীয় "মুজাহিদরা সরকারী সমর্থন বা অনুমোদনের তোয়াক্কা করেননি। তাদের গতি রুদ্ধ করার সামর্থ্য ও ফলাফল নিরূপণ করাও পাকিস্তান সরকারের জন্য সম্ভব ছিল না। তারপরও এর দায় পাকিস্তানের ওপরই চাপানো হয়েছে।" জিন্নাহ সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী কে.এইচ খুরশীদ লিখেছেন, ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ জিন্নাহ সাহেব কাশ্মীর নিয়ে তার সাথে দু'ঘন্টার মতো আলোচনা করেন। তিনি কাশ্মীরের মুসলিম নেতাদের কাছে প্রাইভেট সেক্রেটারীর মাধ্যমে যে বার্তা পাঠান তা হচ্ছে : '... Please convey to our leaders in Kashmir that I do not want to create any trouble for the Maharaja at the moment. I want them to remain calm and we shall deal with the situation later on as it arises.' [সূত্র : K.H. Khurshid as quoted Rajindra Sareen, 'Pakistan : The India Factor', New Delhi, 1947, P-221]

ভারত সরকার মুজাহিদদের 'হানাদার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অথচ তারাই শঠতা ও কৌশলে মহারাজার অসহায়ত্বের সুযোগে বিশাল সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে। মুজাহিদদের অভিযানের প্রতি কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। মুজাহিদরা কোন রাষ্ট্রশক্তি ছিল না বলে কাশ্মীরের মানুষের আজাদী পুনরুদ্ধার করা ছাড়া তাদের অন্য কোন স্থায়ী রাজনৈতিক-সামরিক লক্ষ্য ছিল না। তারা কাশ্মীরের ভূ-খণ্ড দখল করতেও যাননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল আকবরকে মুজাহিদদের প্রেরণার আইকন হিসেবে বলা হলেও তা পুরোপুরি সত্যি নয়।

অন্যদিকে শেখ আবদুল্লাহ ও তার ন্যাশনাল কনফারেন্স মুজাহিদদের অভিযান প্রতিরোধে জনগণকে সংগঠিত করেছেন। মহারাজা শিখ ও হিন্দু যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন।

ভারতের নগ্ন সামরিক অভিযান

মহারাজা হরি সিং এক অনিশ্চিত অবস্থায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের চাপে বাধ্য হয়ে ভারতের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। যদিও তার এই সিদ্ধান্তের প্রতি উপত্যকার জনগণের কোন সমর্থন ছিল না। উপজাতীয় মুজাহিদদের আক্রমণ মহারাজার ভারতের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়তো কাজ করেছে। ভারতের গভর্ণর জেনারেল দিল্লীতে বিদেশী কূটনীতিকের সাথে বৈঠক করা কালে পণ্ডিত নেহেরু তাকে কাশ্মীর আক্রমণের খবর দেন। পাঠান উপজাতীয়দের এই অভিযান রুখতে দিল্লীতে মন্ত্রী সভার ডিফেন্স কমিটি বৈঠকে সেনা প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। তবে মহারাজার সম্মতি বা আহ্বানের আগেই দিল্লী সামরিক অভিযান শুরু করে। সুতরাং উপজাতীয় পাঠানরা আক্রমণ না করলেও ভারত অভিযান চালাতো। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রেস সচিব অ্যালান ক্যাম্পবেল লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"Mountbatten contented, however, that it would be the height of folly to send troops in to a neutral state, where we had no right to send them, since Pakistan could do exactly the same thing, which could only result in a clash of armed forces and in war, "[সূত্র ঃ Campbell-jhonson, Mission with Mountbatten, p-224]

কাশ্মীরের মতো একটি নিরপেক্ষ' রাজ্যের ভূ-খণ্ডে ভারতের সেনা অভিযান পাঠানোর কোন অধিকার নেই। এই একই ভূমিকা নিতে পারতো সেখানে পাকিস্তানও। আর সেটা হলে সামরিক সংঘাত, যুদ্ধ অনিবার্য হবে। মাউন্টব্যাটেন তখন ভারত সরকারের গভর্ণর জেনারেল হলেও মন্ত্রীসভা বা কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ক্ষমতা তার ছিল না। তবে এই সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক দায় বৃটিশের শেষ প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেনকেই নিতে হবে। তিনি কাশ্মীরের জনগণের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য পণ্ডিত নেহেরুর চেয়েও বেশী দায়ী। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কাশ্মীরের ব্যাপারে ইতোপূর্বে ঘোষিত মহারাজা ও জনগণের সম্মতির অধিকারের অস্বীকৃতি এবং মাউন্টব্যাটেনের আগের সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক। তারপরও মাউন্টব্যাটেন এই সিদ্ধান্তকে অস্থায়ী এবং শর্তযুক্ত ব্যবস্থাপত্র হিসেবে অনুমোদন করার কথা বলেছেন। মাউন্টব্যাটেনের ভাষায় ঃ

'a referendum', plebiscite,election or ever if these methods were impractible, by representative public meetings" [প্রাগুক্ত. p-224]

তবে গণভোট বা নির্বাচন অসম্ভব বা অবাস্তব বিবেচিত হলে জনপ্রতিনিধিদের মতামতের যে কথা মাউন্টব্যাটেন বলেছেন, তাতে ভারতের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের পথ খোলা রাখা হয়েছে। ভারত কাশ্মীরে 'শান্তি' ও 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরে না আসার অজুহাতে অবিরাম গণভোট অস্বীকার করে এসেছে। তাছাড়া লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নীতিকথা নেহেরু বা প্যাটেল ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছেন। আগাগোড়াই বৃটিশরা হিন্দু-মুসলিম, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের জন্য দ্বৈত নীতি অনুসরণ করেছে।

ভারতের সূত্র মতে, মহারাজা হরি সিং ভারতের কাছে সাহায্য চেয়েছেন, ২৪শে অকটোবর, ১৯৪৭। ভারত সরকার ভিপি মেননকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে শ্রীনগর পাঠান ২৩ অকটোবর '৪৭। আর ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীনগর পৌঁছে ২৭ অকটোবর, ৪৭। শ্রীনগরে গিয়ে ভিপি মেনন কবরের নিস্তব্ধতা দেখতে পান। মহারাজার কোন সেনাকে তিনি দেখতে পাননি। পাঠান মুজাহিদ বাহিনী তখন বারমুল্লা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ভিপি-মেনন মহারাজা হরি সিংকে নিশ্চল ও ভাগ্যের হাতে সমর্পিত এক মানুষ হিসেবে দেখতে পেয়েছেন। তবে শ্রীনগরে গিয়ে ভিপি মেনন প্রধানমন্ত্রী মহাজনের

www.pathagar.com

সাথে করণীয় নির্ধারণে পরামর্শ করেন। মহারাজা হরি সিং তখন কার্যতঃ ভারতের হাতে জিম্মি। এ সময় ভিপি মেনন ও রাজার প্রধানমন্ত্রী মহাজন রাজা হরি সিংয়ের নিরাপত্তার অজুহাতে সপরিবারে তাদের প্রাসাদের বাইরে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। মহারাজাকে তারা– পাঠানদের আক্রমণ ও তারা তাকে বন্দী করে যে কোন চুক্তি করতে বাধ্য করতে পারে বলে ভয় দেখান। মহারাজার এডিসি ক্যাপ্টেন দেওয়ান সিং একথা জানিয়েছেন। [সূত্র ঃ ভিক্টোরিয়া স্কফিল্ড-এর Kashmir in Crossfire, p-145] জনসমর্থন কিংবা সেনা-শক্তি কোনটাই রাজাকে আত্মরক্ষার প্রেরণা দিতে পারেনি এবং তিনি ভারতীয়দের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রীনগরের প্রাসাদ ছেড়ে আত্মরক্ষার পলায়ন করেন সপরিবারে। তারা শ্রীনগর ছেড়ে জম্মু এসে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ যাত্রাপথে মহারাজা কোন কথা বলেননি। জম্মুতে নিজ ভবনে এসে তিনি বলেন ঃ "We have lost kashmir"; মহারাজার পলায়ন এবং ভারতীয়দের জিম্মায় জম্মুতে এসে আশ্রয় গ্রহণের পর ভিপি মেননকে শ্রীনগরে গেস্ট হাউজে বিশ্রামে থাকা অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু সেখানে থাকা নিরাপদ নয় বলে টেলিফোনে তাকে জানান। ভিপি মেনন– মহারাজার প্রধানমন্ত্রী মহাজনকে নিয়ে প্রথম ফ্লাইটেই দ্রুত দিল্লী রওয়ানা হন।

শ্রীনগর সহ কাশ্মীর ভারতীয় সেনাবাহিনীর জিম্মায় চলে আসে। মহারাজার শাসনের কোন অস্তিত্ব রইলো না। ভিপি মেননের শ্রীনগর থেকে দিল্লী ফিরে আসার সময় অপেক্ষারত সর্দার প্যাটেল তাকে বিমান বন্দরে রিসিভ করেন। দিল্লী বিমান বন্দর থেকেই ভিপি মেননকে নিয়ে সর্দার প্যাটেল ডিফেন্স কমিটির চলমান বৈঠকে গিয়ে হাজির হন। কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর ডিফেন্স কমিটি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, "It was decided that a plebiscite would be held in the state when law and order situation allowed"- [সূত্র ঃ Menon Inteigration of the Indian States, p-400] তবে Law and order-পরিস্থিতি ৬০ বছরে কখনও গণভোট অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরি করেনি।

১৯৪৭-এর ২৭ অকটোবর ভারতীয় শিখ ব্যাটালিয়নের ৩০০ সদস্য বিমানযোগে শ্রীনগরে পৌছে। এই বাহিনীর সাথে প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনও ছিলেন। সাবেক সেনা অফিসার মহাজন নিজেও ছিলেন একজন শিখ। তিনিই প্রতারণা করে Accession দলিলে মহারাজার স্বাক্ষর নিয়েছেন। ভিপি মেনন দিল্লীর ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারের সাথে মদ্যপানরত অবস্থায় বলেন ঃ "We have Kashmir. The bastard signed the Act of Accession. And now that we have got it. We will never let it go." [প্রাগুক্ত-পৃ-১৪৯]

পাকিস্তানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত একতরফা দাবী করে আসছে যে, ২৬ অকটোবর, ১৯৪৭ থেকে কাশ্মীর ভারতের ভূ-খণ্ডের অংশ এবং "Therefore that their

www.pathagar.com

action in sending in troops to assist in the defence of the state against the Pathan raiders was legitimate" [প্রাগুক্ত-পৃ-১৫০]

জম্মু-কাশ্মীর স্টেটের প্রতিরক্ষায় সাহায্যকারী বাহিনী হিসেবে ভারত যদি কাশ্মীরে গিয়ে থাকে, তবে তারপরে তার ভূমিকাতো দখলদারির। 'পাঠান হানাদারদের' প্রতিরোধ যদি বৈধ হয়, তাহলে রাজা বা কাশ্মীরের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কাশ্মীর ফিরিয়ে দিয়ে ভারত সেখান থেকে চলে আসছে না কেন?

উপ-জাতীয় পাঠানদের অভিযান নিয়ে যতো বিতর্কই থাক, তাদের অভিযানের ফলেই-কাশ্মীরের ৩২,০০০ মাইল এলাকা 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পাকিস্তানের-নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই বিভাজন ও লাইন অব কন্ট্রোল আছে বলেই কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের আজও দরকষাকষির ক্ষমতা রয়েছে। কাশ্মীরি পণ্ডিত ও লেখক প্রেমনাথ বাজাজ মুজাহিদদের অভিযানকে ইতিবাচক বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"They wanted to liberate Kashmir from the tyranny of the Maharaja and nationalist renegades, And we should not forget that some members of the Indian army did no less of looting and molesting" [প্রাগুক্ত]

পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বৃটিশ কমাণ্ডার ইন-চীফ জেনারেল গ্রেসীকে কাশ্মীরে সেনা অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সরকারের নির্দেশ পালন করেননি। ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর অবতরণের পর জেনারেল গ্রেসীকে ট্রুপস নিয়ে মুভ করতে নিষেধ করেন। জিন্নাহ সাহেবও ভারতের সাথে কাশ্মীর নিয়ে মারাত্মক কোন আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। যদিও তিনি কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর আগ্রাসনের ফলে সেখানকার মুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। জর্জ কানিংহাম লিখেছেন ঃ

"in his (jinnah) own mind, he had really ruled out the possibility of sending troops in to fight" [সূত্র ঃ Cunningham Dairy', 28 october, 1947 [প্রাগুক্ত-পৃ- ১৫৩]

কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীফ স্যার ফ্রাংক মেজারভি ইংল্যাণ্ড থেকে রাওয়ালপিণ্ডি আসার আগে দিল্লী যান। সেখানে তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে কাশ্মীর যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেখে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"He was surprised to see Mountbatten directing the military operations in Kashmir", Writes Cunningam," [প্রাগুক্ত-পৃ-১৫৩]

১৯৪৭-এর ১লা নভেম্বর মাউন্টব্যাটেন লাহোরে জিন্নাহ সাহেবের সাথে কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেন। ভারতীয় সামরিক অভিযান নিয়ে পাকিস্তানকে যথাসময়ে অবহিত না করার জন্য জিন্নাহ সাহেব ভারতের গভর্ণর জেনারেল

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেনকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবতরণের পর জিন্নাহ সাহেব বার্তা পেয়েছেন। তখন কিছু করার ছিল না। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান 'fraud and violence' এর অভিযোন আনে।

মাউন্টব্যাটেন মহারাজার কথিত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারকে কার্যতঃ সমর্থন করেছেন। মহারাজার পূর্বপুরুষের হাতে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাশ্মীর উপত্যকাকে অবৈধভাবে তুলে দিয়েছিলেন, তারা মহারাজা হরি সিং-এর Act of Accession-কে সমর্থন না করলে তাদের অতীত ভূমিকার ন্যায্যতা থাকে না। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতে তো তখন কোন উপনিবেশবাদী সরকার ছিল না। তারা কাশ্মীরের অবৈধ দখলদার মহারাজার লিখিত সম্মতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে কাশ্মীর দখলকে বৈধতা দিতে চাইছে কীভাবে? দীর্ঘ ৬ দশক ধরে ভারত লাখ লাখ সেনাবাহিনী বহাল রেখেও কাশ্মীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

মাউন্টব্যাটেনের সাথে আলাপকালে জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন ঃ "With the troops of the Indian Domination in military occupation of Kashmir and with the National Conferece under Sheikh Abdullah in power, such propaganda and pressure could be brought to bear that the average Muslim would never have the courage to vote for Pakistan," [প্রাগুক্ত-পৃ-১৫৩]

জিন্নাহ সাহেবের আশংকার চেয়েও কাশ্মীরের অবস্থা ছিল আরও নাজুক। পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরীদের গণভোটে অংশ নিয়ে মত প্রকাশ তো দূরের কথা, কাশ্মীরীরা স্বাধীনতার দাবী জানিয়েও ভারতীয় সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি খেয়ে জীবন দিচ্ছে।

মহরাজা হরি সিং-এর সম্মতি আদায়ের পর ভারতের প্রধান লক্ষ্য হয় শেখ আবদুল্লাহকে বশ করা। শেখ আবদুল্লাহর নামে ভারত প্রচার করে দেয় যে, তিনি আফগানদের অভিযান প্রতিরোধে দিল্লীর কাছে অল জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সের পক্ষে সামরিক সাহায্য চেয়েছেন। মহারাজার বৈধতায় ভারতের প্রশ্ন ছিল বলেই Act of Accession-এ তারা শেখ আবদুল্লাহকে পার্টি করাতে চেয়েছে। এতে দিল্লী আরও প্রমাণ করেছে যে, মহারাজার সম্মতি সত্যি ও পরিপূর্ণ নয়। শেখ আবদুল্লাহ জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা সত্ত্বেও তিনি তখনও জনগণের নির্বাচিত বৈধ প্রতিনিধি নন। একজন ক্ষমতাহারা-পলায়নপর শাসকের চুক্তির বৈধতা ও মূল্য কোনটাই আইনের দৃষ্টিতে বৈধ থাকতে পারে না। এতে কাশ্মীরের জনগণও কোন পার্টি নয়। সপরিবারে মহারাজার পালিয়ে যাবার পর কার্যতঃ কাশ্মীরের ওপর তার কোন বৈধ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তবে ডোগ্‌রা রাজা অর্থের বিনিময়ে কাশ্মীর কিনে নিয়ে যে অপরাধ করেছেন, পণ্ডিত নেহেরুর অপরাধ আরও অমার্জনীয় ও কলংকজনক। যদিও

১৭—

www.pathagar.com

ভারত এই শর্ত মেনে নিয়েছিল যে, মহারাজা হরি সিং-এর সার্বভৌম ক্ষমতা অক্ষত থাকবে এবং কোন অবস্থায়ই তাকে ভারতীয় সংবিধান মেনে নিতে বাধ্য করা করা যাবে না। [সূত্র ঃ M.J.Akbar, Behind the vale, p-135]

ভারতের স্বাধীনতা সূর্য- উদয়কালে যখন কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক সরকারের আবির্ভাব অনিবার্য, তখন পতনোন্মুখ- ক্ষয়িষ্ণু মহারাজার সাথে ভারতের চুক্তি করাই একটা গণবিরোধী ষড়যন্ত্র। শেখ আবদুল্লাহ্ এই তথাকথিত Act of Accession-এ কাউন্টার স্বাক্ষর করেননি। রাজ্য হারানোর পরও মহারাজা হরি সিং শেখ আবদুল্লাহর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাননি। প্রতারণা বুঝতে পেরে এক পর্যায়ে মহারাজা হরি সিং চুক্তি প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে সরদার প্যাটেলকে চিঠিও লিখেন। ১৯৪৮-এর ৩১ জানুয়ারীতে লেখা এ চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, চুক্তি অনুযায়ী তার ভূ-খণ্ড ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন অগ্রগতি দেখছেন না। কাশ্মীর ইস্যুটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে চলে যাওয়ায় মহারাজার জন্য কাশ্মীর ফিরে পাওয়া আরও দুরূহ হবে। আর কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে তাতে যে মহারাজার কপাল আরও পুড়বে, তা তিনি বুঝতে পারেন। [সূত্র ঃ প্রাগুক্ত-পৃ-১৬৭]

দৃশ্যতঃ শেখ আবদুল্লাহর গুরুত্ব বাড়াতে কংগ্রেসের চাপ ও পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী মহাজনও '৪৮-এর মার্চে পদত্যাগ করেন। কাশ্মীরের ক্ষমতার গগনে উদীয়মান সূর্যের পাশে মহারাজা ক্রমশঃ ম্লান ও অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকেন। নেহেরুর আনুকূল্যে শেখ আবদুল্লাহ অর্ন্তবর্তী সরকারের সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ পদটি দখল করতে চাইলেন। কিন্তু মহারাজা আগের মতোই সেনাবাহিনীর 'গান-স্যালুট' নিতে চাইলেন। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার মহারাজা হরি সিং ও রাণীকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান। সেখানেই মহারাজাকে কিছুদিনের জন্য সপরিবারে বাইরে যাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি দেন প্যাটেল। নম্রভাবে বললেও তা ছিল নির্দেশসুলভ। ঐ আলোচনায় উপস্থিত মহারাজার পুত্র করন সিং পরে লিখেছেন ঃ "My father was stunned. Although rurmours to the effect that he might be pushed out of the state had ben in the air for some time, he never belived that even the Sardar would advise him to adopt this course. He emerged from the meetting ashen-faced .....my mother went to her room, ...went to her bed and burst into teers," [সূত্র : Hari Singh to Patel, 9 September, 1948, প্রাগুক্ত-পৃ-১৬৮]

এরপর মহারাজা হরি সিং আর কখনও জম্মু-কাশ্মীরে ফিরে যেতে পারেননি। মহারাজা হরি সিং ভারতের বোম্বেতে [মুম্বাই] মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে করন সিং প্রথমে রাজ প্রতিনিধি এবং পরে সদর-ই-রিয়াসাত-হিসেবে নামমাত্র পদমর্যাদায় বহাল ছিলেন। কিন্তু এরপর ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর হয়েছেন রাজ্য-

www.pathagar.com

প্রধান বা রাজ্যপাল। প্রধানমন্ত্রীর পদটি কিছুদিন বহাল থাকলেও পরে তা মুখ্যমন্ত্রী বা চীফ মিনিস্টারের পদাবনতিতে এসে দাঁড়ায়।

তবে ভারত যেখানে কাশ্মীরকে পরিপূর্ণভাবে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বানাতে চেয়েছে, তাতে 'কাশ্মীরিয়াত'-এর স্বাতন্ত্র ও জাতিগত সার্বভৌমত্ব নিয়ে টিকে থাকার প্রশ্নে ক্রমশঃ অনড় অবস্থান নেওয়া শেখ আবদুল্লাহর সাথে পণ্ডিত নেহেরুর সম্পর্কে চিড় ধরতে দেরী হয়নি। যদিও ১৯৪৮-এর জানুয়ারীতে শেখ আবদুল্লাহ জাতিসংঘে কাশ্মীরের ভারত ভুক্তিকে সমর্থন করে বক্তব্য দিয়েছিলেন। তবে ভারত বুঝতে পারে যে, শেখ আবদুল্লাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে কাশ্মীরের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করছেন। নিউইয়র্কে শেখ আবদুল্লাহ আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট সরদার মোহাম্মদ ইব্রাহীম খানের এ্যাডভাইজার ড. তাসেরকে বলেছেন ঃ " only this, Kashmir should be an independent state, free from both India and Pakistan, "[প্রাগুক্ত-পৃ-১৭০]

পাকিস্তানের তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী চৌধুরী মেহোম্মদ আলীকেও শেখ আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ Put some trust in Kashmiris, they will not join in conspiracies against Pakistan and be bought over, " [প্রাগুক্ত-পৃ-১৭০] ১৯৫৩ সাল থেকেই নেহেরু আবদুল্লাহর বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা

১৯৪৭-এ লাহোরে যখন মাউন্টব্যাটেন আলোচনায় বসেন, তখনই তিনি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের মধ্যস্ততার প্রস্তাব করেন। এতে ভারতেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল। যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ এড়াতে– ভারতই মূলতঃ জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ও গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেয়। প্রথমতঃ ভারতের সামরিক শক্তি সঞ্চয় ও কাশ্মীরে সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রস্তাব বৃদ্ধির জন্য তার সময়ের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়তঃ ধোঁকা দেওয়ার জন্য তার একটি বাহানা ও মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। গণভোট অনুষ্ঠানকে তারা শুরুতেই শর্তযুক্ত করে 'আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি সাপেক্ষে' বলে অভিহিত করেছে। 'ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০-অনুচ্ছেদে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করার পরও একই প্রস্তাবে তারা 'সময়ের বিবর্তনে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' বলে উল্লেখ করেছে।

ভারত প্রথম দিকে কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের সাথে ইক্যুয়াল স্টেটাস মেনে নিয়ে আলোচনায় রাজী ছিল না। তাদের মতে, কাশ্মীরের ওপর ভারতের দাবীর মতো পাকিস্তানের দাবী সমান্তরাল হতে পরে না। তবে শেষ পর্যন্ত এক পর্যায়ে পণ্ডিত নেহেরু পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সাথে জাতিসংঘ চার্টারের ৩৫ ধারা অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তিতে সম্মতির কথা জানান। ১৯৪৭ এর ৩১ ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহেরু জাতিসংঘ মহাসচিবকে যে পত্র দেন তাতে উল্লেখ করেন ঃ "To remove

www.pathagar.com

the misconception that the Indiam Goverrment is using the prevailing situation in Jammu and Kashmir to reap political profits, the Goverment of India wants to make it very clear that as soon as the raiders are driven out and normalcy is restored, the people of the State will freely decide their fate and that desisson will be taken according to the universslly accepted democratic means of plebescite or referendum," [সূত্র : Jawaharlal Neheru, as quoted in Korbel, Danger in Kashmir, 48,p-161]

পণ্ডিত নেহেরু জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্ব সম্প্রদায়, কাশ্মীরের জনগণ ও অপর পক্ষ পাকিস্তানের প্রতি যে অংগীকার করেছেন, তা অন্য কোন ঘটনা বা পরিস্থিতিতে পরিবর্তনযোগ্য নয়। ১৯৪৮ এর জানুয়ারীতে জাতিসংঘে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান পাকিস্তানের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। এ সময় জাতিসংঘে পাকিস্তানের নৈতিক অবস্থান শক্তিশালী ছিল। বৃটিশ- আমেরিকার সদস্যদের সমর্থনে জাফরুল্লাহ খানের সফল কূটনৈতিক তৎপরতা এবং তাঁর ক্ষুরধার বক্তব্য ভারতের অবস্থান দুর্বল করে দেয়। এ অবস্থায় সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কাশ্মীর ইস্যু জাতিসংঘে উত্থাপনকে ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। এটাকে তিনি ভারতের দাবীর নৈতিক দুর্বলতার স্বীকৃতি হিসেবে দেখেছেন। ১৯৪৮-এ কাশ্মীরকে অমীমাংসিত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতে কাশ্মীর সমস্যা সরেজমিনে তদন্তে, United Nations Commission For India and Pakistan [UNCIP] গঠন করা হয়। দ্বিতীয়বার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আর একটি প্রস্তাব পাস করে ১৯৪৮, এর ২১ এপ্রিল। ১৯৪৮-এর ১৩ অগাস্ট জাতিসংঘ একই বিষয়ে আর একটি প্রস্তাব পাস করে। জোসেফ করবেটের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এ রিপোর্টে বলা হয় ঃ "Shall be determined in accordance with the will of the people" [প্রাগুক্ত-পৃ-১৬১]।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী। যুদ্ধ- বিরতির প্রস্তাব আর দ্বি-পাক্ষিক স্বাক্ষরিত বিষয়ই রইলো না। এখানে মধ্যস্থতাকারী সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘের ভূমিকা যুক্ত হওয়ায় কাশ্মীর ইস্যুটি একটি আন্তর্জাতিক বিরোধপূর্ণ ইস্যু হিসেবে স্বীকৃত হয়। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে উভয় দেশ স্বাক্ষর করার ফলে এটা স্বীকৃত হয় যে, কাশ্মীর ইস্যুর নিষ্পত্তিতে ভারত যে সামরিক আগ্রাসন ও ছলনাপূর্ণ কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে কাশ্মীর দখলের একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বৈধ ও চূড়ান্ত নয়। বিশেষত ঃ কাশ্মীর সার্বিক বিচারেই একটি স্বাধীন ও

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র এবং কাশ্মীরের জনগণের গণতান্ত্রিক মতামতই হচ্ছে তার রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের চূড়ান্ত মানদণ্ড। যুদ্ধবিরতি চুক্তির দোহাই দিয়ে ভারত যে সামরিক দখলদারিত্ব চালিয়েছে, তা অকার্যকর হয়ে গেছে এবং কাশ্মীর উপত্যকা মহারাজার সাথে কথিত চুক্তি বা ভারতের সামরিক অভিযান– পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছে। উপজাতীয় মুজাহিদদের অভিযান বা পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে ভারত যাই কিছুই বলুক না কেন, তার কোন ভিত্তি নেই। সর্ববিচারেই ভারত কাশ্মীরে অবৈধ হানাদার। জাতিসংঘও উপরিউক্ত মতের সমর্থন জানায়। ভিক্টোরিয়া স্কফিল্ড লিখেছেন ঃ "On 5 january, 1949, UNCIP once more affirmed that when the truce agreement had been signed, the question of the Accession of State of Jammu and Kashmir to India or Pakistan would be decided through `the democratic method of free and impartial plebiscite.' [Resolution, 5 January 1949, Doc. No S/1196, dated 10 january, 1949, as quoted in Kashmir in the Security Council, p-16 [প্রাগুক্ত-১৬১]

১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট, পাকিস্তানের সাথে ভারত "Stand still Agreement" সম্পাদন করার পর জম্মু-কাশ্মীরে ভারত কোন সামরিক অভিযান চালাতে পারে না। মহারাজাও পাকিস্তানের সাথে একটি 'Stand still' চুক্তি করার পর তৃতীয় পক্ষের কাছে সামরিক সহায়তা চাইতে বা Act of Accession চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না। ভারত নিজেও এই চুক্তি এবং কাশ্মীরে তার সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি সংহত করতে শেখ আবদুল্লাহর সমর্থন অনিবার্য বলে মনে করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, মহারাজা একাই কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভবিষৎ নির্ধারণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নন। তবে শেখ আবদুল্লাহর ভূমিকা প্রথম দিকে যাই থাক, তাতে জনগণের কোন ম্যাণ্ডেট ছিলনা। উপরন্তু, মহারাজা Act of Accession Agreement বাতিলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত দাবী জানিয়েছেন। একইভাবে শেখ আবদুল্লাহ ভারতের অবৈধ দখলমুক্ত করে কাশ্মীরের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করায় ভারত সরকার অবৈধভাবে কাশ্মীরের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতাকে দীর্ঘকাল কারা অন্ধকারে রেখে তার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। কাশ্মীরের কিছু বিশ্বাসঘাতক ভারতের কলাবরেটর হিসেবে কাজ করলেও জনগণ তাদের ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। কাশ্মীরে ভারতের কোন বৈধ সাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ব না থাকায় শেখ আবদুল্লাহসহ অন্যান্য স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী নেতাদের আটক করারও কোন বৈধ কর্তৃত্ব তাই ভারতের থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৪৭-এর ২৬ অকটোবর মহারাজা হরি সিংয়ের সাথে সম্পাদিত ভারতের চুক্তিটি আগ্রাসী শক্তির ছলনা ও প্রতারণার একটি দলিল। মহারাজা কাশ্মীরের সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তখন ক্ষমতা হারানোর অপেক্ষায় ছিলেন। ভারত তখন ত্রাতার ভূমিকায় এসে কাশ্মীরের জনগণকে নতুন করে শৃংখলিত করেছে। মহারাজা হরি সিং ও তার পূর্বসূরীরা কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের ওপর যে মধ্য যুগীয় নিপীড়ন ও শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়েছেন, ভারতের সামরিকতন্ত্র কাশ্মীরীদের ওপর তার চেয়েও ভয়ংকর নিপীড়ন ও পরাধীনতার শৃংখল চাপিয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিদায়কালে এ উপমহাদেশ সহ হিমালায়ান উপত্যকার মানুষের মাঝে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যে স্বপ্ন মুকুরিত হয়ে উঠেছিল, জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের যে প্রত্যাশা জাগ্রত হয়েছিল, কাশ্মীর উপত্যকায় ভারতের সামরিক আগ্রাসনের ফলে তা আবারও কয়েক দশকের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ মহারাজার শাসন কর্তৃত্ব বিকল হয়ে যাবার ফলে তিনি যখন সপরিবারে শ্রীনগর থেকে নিরাপত্তার জন্য জম্মু পালিয়ে যান, সে অবস্থায় অপর কোন আগ্রাসী শক্তির সাথে তার কোন চুক্তির কার্যকারিতা ও বৈধতা থাকতে পারে না। এ সময় ভারতের চক্রান্তে মহারাজা হরি সিং পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাহীন ও আশ্রয়চ্যুত নিঃসঙ্গ এক জন-নিপীড়ক-মধ্যযুগীয় রাজার সাথে সন্ধি করে ভারত তার সকল অপকর্ম ও নিপীড়নের দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছে এবং এ কারণে রাজার বিরুদ্ধে কাশ্মীরের জনগণের ক্ষোভ-আক্রোশের দায় ভারতকেই বহন করতে হবে।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উপলব্ধির পর শেখ আবদুল্লাহ তাঁর অবস্থান বদল করে বলেন ঃ "No one can deny that the communal spirit still cxists in India...if there is a resurgence of commualism in India, how are we to convince the Muslims of Kashmir that India does not intend to swallow up Kashmiris?" [সূত্র ঃ Sheikh Abdullah, 10 April, 1952 as quoted in Balarajpuri, Triumph and Tragedy, New Delhi, 1981, p-99 [প্রাগুক্ত-১৭২]

১৯৫২-এর জুলাইয়ে শেখ আবদুল্লাহ ভারত সরকারের সাথে 'দিল্লী এগ্রিমেন্টে' সম্মত হন। এই চুক্তিমূলেই ভারত কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সংবিধানে ৩৭০ অনুচ্ছেদ যুক্ত করে। কিন্তু ভারত নিজেই তার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থেকে সরে আসে এবং ক্রমশঃ কাশ্মীরকে তার একটি অঙ্গ রাজ্যের অবস্থানে নামিয়ে আনে।

ভারতের বর্তমান অবস্থান হচ্ছে, জম্মু-কাশ্মীর তার ভূ-খণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই বলে ভারত বলে বেড়াচ্ছে। তবে ১৯৭১-এর যুদ্ধ-পরবর্তী 'সিমলা চুক্তিতেও' কাশ্মীরকে ভারত অমীমাংসিত ইস্যু বলে স্বীকার করে নিয়ে শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই দু'দেশের মধ্যকার বিরোধগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে।

www.pathagar.com

কাশ্মীরের অশিতিপর বয়সের স্বাধীনতাকামী ইউসুফ বুচ সম্প্রতি ওয়াশিংটনে কাশ্মীরী-আমেরিকান কাউন্সিল ও অ্যাসোসিয়েশন ফর হিউম্যানিটারিয়ান লয়ার্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে বলেছেন ঃ 'ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ১৯৫২ সালের ২৬ জুন বলেছিলেন যে, "কাশ্মীরের সম্ভাব্য গণভোটে যদি কাশ্মীরীরা ভারতের সাথে না থাকার রায় দেয়, আমরা অবশ্যই তা মেনে নেবো। আমরা তাদের অবদমনে কোনো সেনাবাহিনী পাঠাব না। প্রয়োজনে উদ্ভূত বাস্তবতার নিরিখে আমরা সংবিধান সংশোধন করতেও প্রস্তুত।" [সূত্র ঃ কাশ্মীরকে নিয়ে কেন এত নিষ্ক্রিয়তা? এম. আবদুল হাফিজ, নয়া দিগন্ত, ১৭ অকটোবর, ২০১০]

গণভোট প্রসঙ্গ

জাতিসংঘ মিশনের মূল দায়িত্ব ছিল জম্মু-কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের সম্ভাব্যতা যাচাই করে গণভোট অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরি করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, ঐ অঞ্চলের অসামরিকীকরণ করে উত্তেজনা– সংঘাতের প্রশমন করা। ১৯৫০-এর ২৭ মে অস্ট্রেলিয়ান জুরিস্ট Sir Own Dixon- 'গণভোট ও অসামরিকীকরণ' সম্পর্কে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করেন। পণ্ডিত নেহেরু এর তীব্র বিরোধিতা করে তা নাকচ করে দেন। ১৯৫১-এর জানুয়ারীতে কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টারস সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ান প্রাইম মিনিস্টার রবার্ট মেঞ্জিস কাশ্মীরে কমনওয়েলথ সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ও তদারকীতে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সহযোগী হিসেবে থাকবে বলে সুপারিশও রাখা হয়। পাকিস্তান এ প্রস্তাব মেনে নিলেও ভারত আবারও তা নাকচ করে।

১৯৪৮-এর ১৩ অগাস্ট ও ৪৯-এর ৫ জানুয়ারী যুগপৎভাবে জাতিসংঘে গৃহীত প্রস্তাব ভারত ও পাকিস্তান মেনে নেয়। বৃটেন ও আমেরিকা মিলে এ প্রস্তাব তৈরি করে। এতে আরও বলা হয় যে, গণভোট অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া সফল না হলে, পক্ষগুলো সালিশ বৈঠকে বসে সমস্যার নিষ্পত্তি করবে। এবারও পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু ভারত নাকচ করে দেয়।

১৯৫২ সালের নববর্ষে পণ্ডিত নেহেরু পাকিস্তানকে যুদ্ধের হুমকি দেন। বলেন : "...Warned of fullscale war if Pakistan accidenatally invaded kashmir"[প্রাগুক্ত]

১৯৫২-র ২৪ অকটোবর কাশ্মীর ও পাকিস্তান জুড়ে 'কাশ্মীর দিবস' পালন করা হয়। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের ব্যর্থতা ও ভারতের সামরিক দখলদারিত্বের প্রতিবাদে এটা ছিল প্রথম সংঘবদ্ধ আনুষ্ঠানিক গণবিক্ষোভ।

পরাশক্তির ভূমিকা

জাতিসংঘ প্রস্তাব তথা 'গণভোট' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ পশ্চিমা শক্তিগুলোর সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে কাশ্মীর ইস্যুতে

www.pathagar.com

পরাশক্তিগুলোর ভূমিকায় প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করে। প্রথমতঃ পণ্ডিত নেহেরুর আধাসমাজতান্ত্রিক-নন-এলাইনড ধাঁচের পররাষ্ট্র নীতি, দ্বিতীয়তঃ ভারতের মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের লবী এবং তৃতীয়তঃ পাকিস্তানের সাথে মার্কিন সামরিক গাঁটছড়ার কারণে মস্কো ভারতের পক্ষে ছিল। গণচীন সরাসরি কোন পক্ষ না নিলেও পরিস্থিতির ওপর তার তীক্ষ্ণ নজরদারি অব্যাহত রাখে। লাদাখ ও আকসাই চীন কাশ্মীরেরই বিতর্কিত অংশ। সামরিক কারণেই চীন এ অঞ্চলের গতি-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

১৯৫৭ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সুইডিশ প্রেসিডেন্ট ড. গুনার জেরিং উপমহাদেশ সফর করেন। তিনি কাশ্মীর সরেজমিনে সফর করে উভয়পক্ষকে 'লাইন অব কন্ট্রোল' মেনে চলতে এবং শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা মেনে চলার আহ্বান জানান। ১৯৬২ সালে ড. গ্রাহাম দ্বিতীয়বারের জন্য উপমহাদেশ সফরে আসেন। তিনি জাতিসংঘের পূর্ব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার তাকিদ দিয়ে 'গণভোট' অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হবার তাকিদ দেন। এবারই প্রথম জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে 'ভেটো' প্রয়োগ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাক-মার্কিন সামরিক মেরুকরণের সাথে কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ইস্যুটি একাকার করে কাশ্মীরের জনগণের ভাগ্য বিপর্যয়ে ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় জাতিসংঘে সোভিয়েত প্রতিনিধি বলেন : 'It is now quite unrealistic demand a plebiscite.' [প্রাগুক্ত-১৭৯]

এমনকি, সোভিয়েত প্রতিনিধি কাশ্মীরে 'গণভোট' অনুষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগকে আক্রমণ করে একথাও বলেন যে, টেকসাস, ওহিও-রাজ্যেও তারা এ রকম গণভোট অনুষ্ঠান করতে প্রস্তুত কিনা?

১৯৬০ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি জীবন্ত সমস্যা হিসেবে আলোচিত ছিল। ১৯৬২-তে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্টিয়ার ও লাদাখ অঞ্চলে চীন-ভারত সৈন্য সমাবেশ যে আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তেমনি কাশ্মীরের সামরিক ও কৌশলগত গুরুত্ব ভারতের কাছে আরও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। চীনের সাথে ভারতের সম্ভাব্য সামরিক সংঘাতের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ব্যাপকভাবে সামরিক অস্ত্র-সরঞ্জাম দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সামরিক প্যাক্ট থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে না জানিয়েই তারা ভারতের সাথে সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এতে ভারত আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং জাতিসংঘ সহ যে কোন আন্তর্জাতিক মহলকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ভারতকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহে পাকিস্তান উদ্বিগ্ন হয় এবং এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইউবের সাথে মার্কিনীদের সম্পর্কে চিড় ধরে। এসব বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আইউব তাঁর লেখা 'Freinds Not Masters'-বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনকি আইউব মন্ত্রীসভার এককালীন চৌকস

www.pathagar.com

সদস্য এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোও তাঁর লেখা বই 'The Myth of Independence'-এ মার্কিন বন্ধুত্ব নিয়ে প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

তবে বৃটিশ ও মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধি ডানকান সিডনি ও আরভেল হ্যারিম্যান-আইউব-নেহেরুর মধ্যে একটি আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তখন ঐ দুই পশ্চিমা কূটনীতিকের সাথে দিল্লী আসেন। ১৯৬২ সালের ২৯ নভেম্বর আইউব-নেহেরু যুক্ত বিবৃতিতে কাশ্মীরসহ অন্যান্য অমীমাংসিত বিষয় উভয় দেশের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

১৯৭১-এ যুদ্ধের পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত 'সিমলা চুক্তিতে' কাশ্মীর ইস্যু সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ : 'In Jammu and Kashmir, the line of Control resulting from cease-fire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognised position of either side. Neither side shall seek to alter in unilaterally, irrespective of mutual differences and legal interpretation. Both sides further undertake to refrain from threat or of the use of force in violation of the line.' [প্রাগুক্ত, পৃ-২১১]

সাম্প্রতিক ভারতীয় উদ্যোগ

ভারতের সর্বদলীয় সংসদীয় দলের অন্যতম সদস্য সিপিআই (এম) শীর্ষ নেতা প্রকাশ কারাত কাশ্মীর উপত্যকা সফর করে লিখেছেন : "কাশ্মীরে দমন-পীড়ন বন্ধ হোক, শুরু হোক আলোচনা"। সম্প্রতি তাঁর লেখায় তিনি ৭ দফা সুপারিশ করেছেন। প্রকাশ কারাত-এর এই প্রস্তাবনাটি ৩০ অগাস্ট, ২০১০-এ কলকাতার 'দৈনিক গণশক্তি' প্রকাশ করেছে। ভারতের একজন বামপন্থী রাজনীতিকের দৃষ্টিতে কাশ্মীর পরিস্থিতির একটা অনুপুঙ্খ বর্ণনার স্বাদ পাঠককে দিতে চাই বলে লেখাটি হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

"গত আড়াই মাস ধরে কাশ্মীর উপত্যকায় অস্থিরতা ও গণ্ডগোল চলছে। একদিকে ধারাবাহিকভাবে মানুষের বিক্ষোভ ও হরতাল এবং অপরদিকে জারি সরকারী কারফিউ। দোকান, বাজার-হাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ, ফলে জীবন যাত্রা স্তব্ধ।

১১ই জুন থেকে ২২শে অগাস্ট পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে সেখানে প্রাণ হারাতে হয়েছে ৬২ জন তরুণকে (এই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ১১১-তে এসেছে)। যাদের বয়স ৮ থেকে ২৫ বরছ। সি আর সি এফ পিকেটের বিরুদ্ধে তরুণরা পাথর ছুঁড়েছে এবং অনিবার্যভাবে তার পরিণতিতে গুলি বর্ষণ, যাতে ঘটেছে মৃত্যু ও গুরুতর আঘাত। এই ধরনের একটি মৃত্যুর ফলে বিক্ষোভ তৈরি হয় মানুষের মধ্যে, লক্ষ্য করা গেছে ভারতীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মনোভাব ও প্রচণ্ড রাগ।

www.pathagar.com

গত ২২শে ও ২৩শে অগাস্ট আমি এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহম্মদ সেলিম শ্রীনগর পরিদর্শন করেছি। আমাদের সফরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, যেসব পরিবার তরুণ সদস্যদের হারিয়েছে তাদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং সেখানকার মানুষ যে কষ্ট ভোগ করছেন, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। আমরা সেখানে বিভিন্ন অংশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করেছি। আমরা সেখানে অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা পার্টি সদস্য এবং সি পি আই (এম)-র রাজ্য কমিটির সদস্যদের এবং সি পি আই প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছি।"

বর্বরোচিত পুলিশী ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যেভাবে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছে, তা প্রকৃতপক্ষে শোচনীয় ধরনের। প্রথমতঃ যুবকদের (যাঁদের বেশির ভাগই তরুণ) গণ-বিক্ষোভ এবং জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের মুকাবিলার মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য করা হয়নি। একের পর এক ঘটনায় কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী প্রস্তর নিক্ষেপকারী জনতার উপরে গুলিবর্ষণ করেছে। শুধু যে যুবকদের মৃত্যু ঘটেছে তাই নয়, শ'য়ে শ'য়ে মানুষ বুলেটের আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এই ধরনের বর্বরোচিত পদ্ধতি যদি ভারতের অন্য কোনো জায়গায় চালানো হতো, তাহলে সেখানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও গণ্ডগোল তৈরি হতো। কাশ্মীরী জনগণ যে বর্বরতার শিকার হচ্ছেন, সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিস্পৃহতার দরুন তাঁরা মনে করছেন ভারত সরকার কাশ্মীরকে দেশের বাকি অংশের চাইতে আলাদাভাবে দেখে।

যে পদ্ধতিতে পুলিস প্রস্তর নিক্ষেপকারী জনতার বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে থাকে, তার পিছনে কোনো যৌক্তিকতা নেই। তা ছাড়া যেভাবে কিশোরদের জেলে পোরা হচ্ছে, সেটাও বরদাস্ত করা যায় না। 'জন নিরাপত্তা' আইনে গ্রেপ্তার হওয়া যুবকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে জম্মু ও উধমপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ সরকার পুরোপুরি অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। জনগণের মধ্যে তারা অপদস্থ হয়েছে। জনগণের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকার বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে আইন-শৃঙ্খলার ইস্যু হিসাবে দেখায় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় মানুষের আন্দোলন ও বিক্ষোভের উপরে কট্টরপন্থী ও মৌলবাদীদের প্রভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী, তারা কোনোরকম নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেল না।

এরই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্যেও কিন্তু সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় 'অমরনাথ যাত্রা' শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। যাতে যোগ দিয়েছিলেন ৪.৫ লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে দিয়ে 'কাশ্মীরিয়াৎ'-এর অন্তর্নিহিত সহিষ্ণুতা

www.pathagar.com

ও শুভেচ্ছার পরিচয় পাওয়া গেলো। কাশ্মীরী সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো 'কাশ্মীরিয়াৎ'। কাশ্মীর উপত্যকায় মানুষের এই বিক্ষোভকে লস্কর-ই- তৈয়বা বা অন্যান্য উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির কাজ বলে ছাপ মারা অনুচিত। যেভাবে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং প্রতিবাদের যে তীব্রতা তাতে বোঝা যায় এসবের পিছনে স্ব-চালিত গতি আছে। এই দিকটি যদি আমরা ভুলে যাই এবং এই আন্দোলনকে প্ররোচিত আন্দোলন বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা পরিস্থিতির মুকাবিলায় আরো ভুল করবো।"

আশু ব্যবস্থাসমূহ

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কাজকর্ম যাতে দ্রুত শুরু হতে পারে সেই লক্ষ্যে কিছু আশু ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। যেমন :

১. বিক্ষোভ প্রশমিত করতে পুলিশের গুলিচালনা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য করার অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কারফিউ জারি থাকার সময় নিরাপত্তাবাহিনীর লোকজন যেন বাড়িতে প্রবেশ না করে এবং বাসিন্দাদের, বিশেষ করে মহিলাদের অপদস্থ করা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

২. যাঁরা মারা গেছেন বা আহত হয়েছেন তাঁরা অনেকেই শ্রমিকশ্রেণীর হতদরিদ্র অংশ। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আহত ব্যক্তিদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া জরুরী। এমন অনেক আহত ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আগামী দিনে বরাবরের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়বেন। তাঁদের পুনর্বাসন ও তাঁদের পরিবারগুলির জীবন-জীবিকা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্য একটি কর্মসূচী হাতে নিতে হবে।

৩. কারাগারে বন্দী কিশোরদের অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে থাকা ছোটখাটো মামলা খারিজ করা দরকার।

৪. আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (এ এফ এস পি এ) অনুযায়ী যে দানবীয় ক্ষমতা আছে তা খর্ব করা উচিত। সি পি আই (এম) ঐ আইনে থাকা দানবীয় ক্ষমতাগুলো খারিজ করার জন্য দাবী জানিয়ে আসছে। শ্রীনগর এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলে যে 'উপদ্রুত এলাকা আইন' চালু আছে, তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে এ এফ এস পি এ স্বাভাবিকভাবেই অকেজো হয়ে পড়বে।

৫. দীর্ঘকালের অর্থনৈতিক অচলাবস্থার ফলে বহু দোকান মালিক ও ক্ষুদ্রশিল্প মালিক অর্থনৈতিক দিক থেকে শেষ হয়ে গেছেন। তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাঁদের অর্থনৈতিক সহায়তাও দেওয়া দরকার।

৬. শুধু যে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ধরনের বেকারী আছে তা নয়, গত তিন মাসে দিনমজুরেরা রোজগার করতে পারেননি। সরকারের উচিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং অবিলম্বে যাঁরা তাঁদের জীবিকা খুইয়েছেন তাঁদের জন্য ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

৭. পুলিশের বাড়াবাড়ির যে সব অভিযোগ আছে সেগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। দ্রুত এই ব্যবস্থা নিতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে নিতে হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাধারণ মানুষের কাছে অন্যতম তিক্ত বিষয় হলো বাড়াবাড়ি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য যারা দোষী বলে চিহ্নিত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের ব্যর্থতা। এর আগে পাথরিবাল ঘটনায় কয়েকজন সেনা অফিসার জড়িত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিচারের জন্য সরকার অনুমতি দেয়নি। সাম্প্রতিক মাচিল সংঘর্ষে সীমান্ত পেরিয়ে আসা জিহাদী আখ্যা দিয়ে তিনজন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় বর্তমানের এই অস্থিরতা ও গণ্ডগোল। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত। ভুয়া সংঘর্ষের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস

কাশ্মীরের ইতিহাস হলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস। ৩৭০ ধারার মাধ্যমে ভরতীয় সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীরকে যে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তা বছরের পর বছর ধরে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কেন্দ্রে একের পর এক কংগ্রেস সরকার এসেছে। কিন্তু তারা কাশ্মীরী জনগণের সত্তা ও বিশেষ মর্যাদা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সর্বাধিক স্বশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ ক্ষেত্রে 'আকাশ হলো উর্ধ্বসীমানা'। বি জে পি- নেতৃত্বাধীন সরকার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজি হয়নি। ঐ প্রস্তাবে স্ব-শাসনের ক্ষেত্রে ১৯৫৩ সালের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছিল। বাস্তবতা হলো, কংগ্রেস এবং বি জে পি উভয়েই ঐ রাজ্যের জন্য আরো স্ব-শাসনের বিরেধী।

আলোচনা শুরুর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে ইউ পি এ সরকারের রেকর্ড খুব খারাপ। আলোচনার ক্ষেত্রে রাজ্যের সব অংশকে যুক্ত করা প্রয়োজন। সরকারের প্রথম মেয়াদে দিল্লি ও শ্রীনগরে রাউন্ড টেবল বৈঠক হয়েছে। তাছাড়া গঠিত হয় ৪টি সাব কমিটি। বিচারপতি সাগির আহমদের নেতৃত্বে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে যে ওয়াকিং গ্রুপ তৈরি হয়েছিল তার রির্পোট ভীষণভাবে নৈরাশ্যজনক।"

নিঃশর্ত আলোচনা

সি পি আই (এম) জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য সর্বাধিক স্ব-শাসনের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে দাবী জানিয়ে আসছে। পাশাপাশি তারা ঐ রাজ্যে তিনটি অঞ্চলের জন্য স্ব-শাসনের পক্ষেও সওয়াল করছে। এই তিনটি অঞ্চল হলো– জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখ। কথা হয়েছে, রাজনৈতিক মীমাংসা যেন অবশ্যই প্রতিফলিত হয় সাংবিধানিক ব্যবস্থার

www.pathagar.com

পরিবর্তনের মধ্যে, যা এই ধরনের স্ব-শাসন সুনিশ্চিত করবে। বর্তমান সন্ধিক্ষণে, যা জরুরী তা হলো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ। এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার পর ইউ পি এ সরকারের উচিত আর কালক্ষেপ না করে সব অংশকে যুক্ত করে রাজনৈতিক আলোচনার একটি কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) ঘোষণা করা। সেটা সম্ভব হবে যদি এ আলোচনার ব্যাপারে কোনো পক্ষ প্রাক-শর্ত পেশ না করে।

এখন যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে এই আস্থার সঞ্চার করা যে, কাশ্মীর সংক্রান্ত সমস্ত ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য আন্তরিক প্রয়াস রয়েছে এবং সেই সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। সি পি আই (এম)-র কেন্দ্রীয় কমিটির আগামী বৈঠকে আলোচনা হবে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে এবং আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি আরো বিশদভাবে ঘোষণা করা হবে। কাশ্মীর ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সি পি আই (এম) গোটা দেশে প্রচার অভিযান চালাবে।"

ভারতের রক্ষণশীল হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র 'আনন্দবাজার' পত্রিকা গোষ্ঠীর সাময়িকী বিখ্যাত 'দেশ' গত ২ অকটোবর/২০১০ তাদের 'চিঠিপত্র' কলামে কলকাতার জনৈক রুদ্র সেন- লিখিত একটি তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ করেছে। 'স্বায়ত্তশাসন নয়, আজাদীই চাইছেন কাশ্মীরের মানুষ', শীর্ষক লেখাটি প্রাসঙ্গিক বলে তা উদ্ধৃত করছি ঃ 'দেশ এ (১৭ জুলাই ও ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ সংখ্যায়) প্রকাশিত নিবন্ধ ও সেই সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি চিঠি ও পাল্টা চিঠি পড়ে বর্তমান পত্র লেখকের মনে হয়েছে, নিবন্ধ ও পত্রাবলিতে কাশ্মীর উপত্যকার ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ভারত সরকারের ভূমিকার প্রকৃত বিশ্লেষণ অনুপস্থিত থেকে গিয়েছে। বিগত ষাট বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গঠিত ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীন কাশ্মীরের প্রতি আগ্রাসী নীতি নেয় ও কাশ্মীর ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা করে। পাকিস্তানের মদদে কাশ্মীরে উপজাতি প্রধান অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়, যা তৎকালীন কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহের শাসন ক্ষমতাকে বিপন্ন করে তোলে। তখন তিনি ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চাইলে ভারতীয় শাসককুল তাঁকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্য চাপ দিতে থাকেন। উপজাতি-বিদ্রোহ সামলাতে না পেরে তিনি ভারতের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন ও ১৯৪৭-এর ২৬ অকটোবর ভারতে শর্তসাপেক্ষে অন্তর্ভুক্তি বা Instrument of Accession এ সই করেন। ভারত সরকার তাঁকে সেনা সহায়তা করে উপজাতি-বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করে। যদিও কাশ্মীরের কিয়দংশ তাঁর ও ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইর চলে যায়, যা 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পরিচিত। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে সাধারণ কাশ্মীরী জনতার কোনও

www.pathagar.com

ভূমিকাই ছিল না। তাঁরা অবশ্য চিরকালই তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ভালবেসে এসেছেন। ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজার সমঝোতাকে তাঁরা কোনও দিনই মেনে নেননি।

কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর কাশ্মীরী জনগণের মতামত অনুযায়ী কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এমন শর্ত থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৪৮ সালের ২১ এপ্রিল একটি প্রস্তাবনায় (Resolution) কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে কাশ্মীরের জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে একটি গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব করে। বলা বাহুল্য, সেই গণভোটি আজও গৃহীত হয়নি। ১৯৪৭-এ ভারতভুক্তির পর থেকেই শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মীরী জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে যে আন্দোলন শুরু হয়, সেই আন্দোলনের চাপেই ভারত সরকার জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারায় কয়েকটি বিশেষ সুবিধে প্রদান করে। 'আজাদী' বা স্বাধীনতার বদলে কাশ্মীর পায় খানিকটা স্বায়ত্ত শাসন, যা আসলে কাশ্মীরী জনতার আজাদীর দাবীকে প্রশমিত করতে চালু করা হয়। কাশ্মীরী জাতিসত্তাকে অবদমিত করে রাখার দমনমূলক নীতি থেকে ভারত কখনও সরে আসেনি। সেনা পাঠিয়ে, নির্বাচনের নামে প্রহসন চালিয়ে, রাজ্যে পুতুল সরকার বসিয়ে বকলমে সামরিক শাসনই চালিয়ে এসেছে নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার। যতবার স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন দানা বেঁধেছে, ততবার চলেছে সেনা-আগ্রাসন, পুলিশী নির্যাতন, গুমখুন, ভুয়ো সংঘর্ষ সাজিয়ে খুন, গণধর্ষণ ও গণহত্যা। আর বারবারই কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবীতে আন্দোলনকে 'আইন শৃঙ্খলার সমস্যা' বা 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের বলা হয়েছে 'পাক-মদদপুষ্ট জঙ্গি'।

উপত্যকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যারা কাশ্মীরী জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করত, তাদের শাসন ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। যেমন, ন্যাশনাল কনফারেন্স, যার নেতা ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ কাশ্মীরী জনতার কাছে ভারত রাষ্ট্রের 'মুখ'। যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী নিয়ে শেখ আবদুল্লাহর উত্থান, সেই মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে গিয়ে কাশ্মীরী জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তাঁর পুত্র ফারুক ও পৌত্র ওমর আবদুল্লাহ। এঁরা বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করেছেন এবং কাশ্মীরী উপত্যকায় ভারত রাষ্ট্রের 'প্রতিনিধি'তে পরিণত হয়েছেন। প্রতিবারের মতো এবারও এঁরা আন্দোলনকারীদের 'পাকপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে আন্দোলন বন্ধ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। আন্দোলনকারীদের উপর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আক্রমণ যেমন, পুলিশী হামলা, গ্রেফতার, নির্বিচার হত্যাকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছেন।

ফারুক ওমর সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট অথবা আফস্পা) এর মতো গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বকারী, স্বৈরাচারী আইন

www.pathagar.com

সরাসরি সমর্থন করে কাশ্মীরী জনতার মুখ বন্ধ করতে চাইছেন। 'আজাদী'কে গুরুত্ব না দিয়ে, কিছুটা স্বায়ত্ত শাসন দিয়ে কাশ্মীরের আইন শৃঙ্খলার অবনতির দোহাই দিয়ে, স্বাধীনতাকামী হুরিয়াত কনফারেন্স ও অন্যান্য বিরোধী ও আন্দোলনকারী নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসে আন্দোলনের মূল দাবীকে চাপা দিতে চাইছেন। আজ যদি তাঁদের এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তাবে আন্দোলনকারীরা সাড়া দেয়, তাহলে লাভবান হবে দিল্লীর সরকার। আর ক্ষতি হবে মুক্তিকামী কাশ্মীরী জনতার। কাশ্মীরের চিরসংগ্রামী মানুষ আবার বঞ্চিত হবেন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃত অধিকার থেকে।" (রুদ্র সেন, কলকাতা, ৭০০০২৮)

ভারতীয় মিডিয়ায় কাশ্মীর

ভারতের 'ফ্রন্ট লাইন' ২৪ সেপ্টেম্বর/২০১০-এ এ.জি. নূরানীর জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত আর একটি লেখা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি দিল্লী সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে 'First Steps' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'The situation in kashmir calls for immediate steps to create conditions conducive to a twopronged dialogue process.. তবে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির আগে কট্টর হিন্দুবাদী বিজেপি-র মতো বিরোধী দলের সাথেও সমঝোতার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। তিনি লিখেছেন : 'One such step is reform of the Armed Forces (special Powers) Act, 1958., But before that, it is imperative that New Delhi shed its opposition to peaceful expression of the people's sentiment." - অর্থাৎ জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য নিয়ে ভারতের যে কোন সরকারেরই যে কোন সাহসী ভূমিকা নিতে হলে একটা জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করা দরকার। এ জি নূরানীর মতে, ভারত সরকার যদি সংবিধানের ৩৭০-ধারায় প্রদত্ত 'বিশেষ মর্যাদার' সুরক্ষা পুনর্বহাল করার লক্ষ্যে ৩৭০-ধারার হুবহু পুনর্বহাল করতে পারে এবং সর্বোচ্চ স্বায়ত্ত শাসন দিয়ে কাশ্মীরীদের সাথে সমঝোতায় উপনীত হতে পারে, তাহলে সমস্যার সাময়িক নিষ্পত্তি আশা করা যায়। সংবিধানের ৩৭০-এর সাথে (২) উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত করে রাজ্যের মর্যাদা ও ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্য সরকার বরখাস্তের ক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হয়েছে। শেখ আবদুল্লাহর সরকার বরখাস্ত এবং বখশী গোলাম মোহাম্মদ ও মীর কাসিম সরকার নিয়োগ করা হয় সংবিধানের এই পরিবর্তিত ধারার ক্ষমতাবলে। তবে জাতিসংঘের আওতায় জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ প্রশ্নটি, বিশেষ করে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের আগে ভারত একতরফাভাবে এ রাজ্য নিয়ে সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক-সামরিক যে কোন ধরনের পরিবর্তন আনুক না কেন, তা বৈধ হতে পারে না। এটা ভারতের আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত, আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী এবং কাশ্মীরের জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায়ের বিরোধী। সুতরাং ভারতের এ

www.pathagar.com

পদক্ষেপ যে কোন বিচারেই অকার্যকর। কাশ্মীরের জনগণের বাইরে যদি অন্য পক্ষগুলোকে হিসাবের মধ্যে আনতে হয়, তাহলে পাকিস্তান, ভারত ও জাতিসংঘকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। আজাদ-কাশ্মীরও একটি পক্ষ।

ভারত তার সাংবিধানিক অংগীকার লঙ্ঘন করে ৩৭০-অনুচ্ছেদকে একটি কাগুজে দলিলে পরিণত করেছে। এ জি নূরানীর মতে : 'What happens in that only the shell is there, Article 370, whether you keep it or not, has been completely emptied of its contents. Nothing has been left in it.' [Front Line, 24 September, 2010]

কাশ্মীরের 'সদর-ই-রিয়াসাতের' সার্বভৌম বিশ্লেষণটি বাতিল করে ভারতের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত গভর্ণরের দ্বারা তা পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। মীর কাসিমের উত্থাপিত (৩১ অকটোবর/১৯৫১) কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলী-র প্রস্তাবে বলা হয় : 'This Asssembly resolves that it shall stand dissolved on the 26th day of Janurary, 1957.' ভারতের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারি লাল নন্দ এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন : 'The constituent Assembly is gone. Therefore, the provision is..... and the President (India) has got unfettered Clause(3).' - দেখা যাচ্ছে, কাশ্মীরকে ভারতীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণ পর্যন্ত বিতর্কিত কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীকে রক্ষা করা দরকার ছিল। গণ-পরিষদ বিলোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় পার্লামেন্ট। এরপর মীর কাসিম-বখশী গোলাম মোহাম্মদরা সেটা তাদের গণ-পরিষদে অনুমোদন করেছেন। ভারতীয় সংসদকে কাশ্মীরের জনগণ এ অধিকার দেয়নি। মীর কাসিমরাও যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার পক্ষেও তারা জনগণের কোন ম্যান্ডেট নেয়নি।

এ জি নূরানীও এ ব্যাপারে একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'The Kashmiri people and thier constituent Assembly, in what form was prevailing it was absolute and soverign, Indian authority has nothing to null and void their will of non-accession to India.' (প্রাগুক্ত)।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের যে কোন ক্ষমতা কেন্দ্রকে দিতে হলে তা পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হতে হবে এবং Article 368, section (2)-এর আওতায় তা পার্লামেন্টে 'Ratify' হতে হবে। কিন্তু ভারত সরকার এই ক্ষমতা নির্বাহী ক্ষমতা বলে রাজ্য সরকার থেকে কেড়ে নিয়ে ভারতের সংবিধানের আওতায় তাদের রাষ্ট্রপতির ওপর অর্পণ করেছে। একটি ভুয়া ও কারচুপির নির্বাচনে গঠিত তথাকথিত গণ-পরিষদে কতিপয় ভারতীয় এজেন্ট ঐ অবৈধ Accession-কে অনুমোদন করেছেন। এই অবৈধ প্রক্রিয়ার সাথে কাশ্মীরের জনগণ সম্পৃক্ত নন। অন্যদিকে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণে গণভোট অনুষ্ঠানের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, বিকৃতকরণ বা বিলোপ করার কোন অধিকার ভারত সরকারের নেই।

www.pathagar.com

জম্মু-কাশ্মীর সরকারের আইন সচিব জি-এ, লোন ভারতের এ ষড়যন্ত্র উন্মোচন করেছেন। তাঁর মতে, ভারত সরকার গভর্ণর জগমোহনকে (শিখ) নিযুক্ত করে 'by sheer manipulation' ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯ অনুচ্ছেদকে 'The residuary power of legalisation-' কাশ্মীরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে। [সূত্র : Kashmir Times, April, 20, 1995]

আজাদী আন্দোলনের তিন আপোষহীন নেতা

কাশ্মীরের আজাদী আন্দোলনের আপোষহীন নেতাদের মধ্যে বর্ষীয়ান ও প্রভাবশালী নেতা হচ্ছেন অল পার্টি হুররিয়াত কনফারেন্স নেতা সৈয়দ আলী শাহ গিলানী। ভারত সরকার তাঁকে কয়েক মাস ধরে গৃহবন্দী করে রেখেছে। Ayesha Anrabi (আয়েশা আন্দ্রাবী)- একমাত্র স্বাধীনতাকামী মহিলা নেত্রীকে গত ২৮ অগাস্ট, '১০ গ্রেফতার করা হয়েছে। আজাদী আন্দোলনের অপর শীর্ষ নেতা মাসরাত আলম বেশ কিছুদিন ধরে আত্মগোপনে থাকলেও গত ১৯ অকটোবর/২০১০ তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

ফ্রন্ট লাইন-এ ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ সুজ্জাত বুখারী লিখেছেন : 'The 81 year-old zeelani is seen as an icon of the 'freedom struggle' by most young people in Kashmir'- কাশ্মীরের আজাদী আন্দোলনের পতাকা এই বর্ষীয়ান নেতা দৃঢ়ভাবে বহন করে চলেছেন। নির্লোভ-সৎ এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত দৃঢ়চেতা সাইয়েদ আলী শাহ গিলানী স্বাধীনতাকামী সকল পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। কাশ্মীরের ওপর ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। মডারেট গণতন্ত্রী-অসাম্প্রদায়িক সেক্যুলারদের হাতে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নেই। মাসারাত আলমকে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ভারত বিরোধী গণ-জাগরণের নেপথ্য সংগঠক হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত গোপন আস্তানা থেকে পুলিশ তাঁকেও গ্রেফতার করেছে। সাইয়েদ আলী শাহ গিলানী ভারতের সাথে কোন রকম সমঝোতা বা আপোষরফায় বিশ্বাসী নন। কাশ্মীরের আজাদীর প্রশ্নে গিলানীর কঠোর অবস্থানের কারণে তাঁকে দৃঢ়চেতা নেতা হিসেবে সম্মান করা হয়। গিলানী রাজনীতি শুরু করেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের মাধ্যমে। পরে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে যুক্ত হন। কাশ্মীর রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে তিনি তিনবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর পরে তিনি ভারতের সংবিধানের আওতায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া নাকচ করেন। তাঁর মতে, 'The Assembly as the meeting place of "Indian agents". এসেম্বলীকে গিলানী ভারতীয় এজেন্টদের মিলন কেন্দ্র বলে মনে করেন।

৩৭ বছরের মাসারাত আলম একজন আপোষহীন স্বাধীনতাকামী। তিনি গিলানীর অনুসারী। মাসারাত আলম মুসলিম লীগ রাজনীতিক হিসেবে গিলানীর সূচিত ২০০৮ সালের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দৃশ্যপটে আসেন। হত্যা-ধর্ষণের প্রতিবাদ সহ অমর নাথ মন্দিরে কাশ্মীরের শত শত বিঘা জমি প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আন্দোলন সংগঠনের অভিযোগে মাসারাত আলম গ্রেফতার হলে দু'বছর কারাগারে কাটান। সম্প্রতি তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হলো। মাত্র গত জুনে মাসারাত আলম কারাগার থেকে মুক্তি পান। সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানকে প্রথম যে হত্যাকাণ্ডটি উদ্দীপ্ত করে, তা হচ্ছে তোফায়েল মাট্টো নামের এক কিশোর কাশ্মীরীর হত্যা। সেনাবাহিনীর গুলিতে তার মৃত্যু হয়। মাসারাত আলম স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী তরুণ ও যুবকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় প্রভাবশালী নেতা। তিনি মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কর্মীদের কাছে নির্দেশনা দান ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ভিসিডি ব্যবহার করেন। তাঁর মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে ৫ লাখ রুপি।

আয়েশা আন্দ্রাবীকে গত ২৮ অগাস্ট/২০১০ গ্রেফতার করা হয়েছে। স্বাধীনতাকামী একমাত্র প্রভাবশালী মহিলা নেত্রী হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুপরিচিত। তিনি গিলানী-মাসারাত আলমের মতোই 'হার্ডলাইনের।' ১৯৮০ সালে 'দুখ্‌তারান-ই-মিল্লাত, সংগঠনের মাধ্যমে আয়েশা আন্দ্রাবী দৃশ্যপটে আসেন। ১৯৯০-এর দিকে তিনি কাশ্মীরকে 'ইসলামিক স্টেট' হিসেবে প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তির পক্ষপাতি। বিভিন্ন মেয়াদে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। তার শিশু সন্তানও তাঁর সাথে কারাগারে ছিল। কাশ্মীরের মুজাহিদ কমাণ্ডার আশিক হোসেন ফাকতো ওরফে মোহাম্মদ কাসিমকে তিনি বিয়ে করেছেন। একজন মানবাধিকার কর্মীকে হত্যার অভিযোগে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।

বাহ্যিক উপলব্ধি ও নেতিবাচক মানসিকতা

ভারত সরকারের মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বদলীয় সংসদীয় দল কাশ্মীর সফর করে এসে সাম্প্রতিক উত্তেজনা ও বিক্ষোভ মোচনে ৮ দফা সুপারিশ পেশ করেছেন। এদিকে দিল্লী সরকার কাশ্মীর ইস্যুতে সেখানকার রাজনৈতিক নেতা ও স্বাধীনতাকামী সংগঠনের নেতাদের সাথে আলোচনা করে সরকারের সাথে আপোষ মীমাংসার একটা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে সহায়তা দিতে পারবেন, এই প্রত্যাশায় তিন সদস্যের একটি আলোচক প্যানেলের নাম ঘোষণা করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি-চিদাম্বরম সম্প্রতি এ আলোচক প্যানেলের নাম ঘোষণা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তথ্য কমিশনার এম এম আনসারী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাধা কুমার। আলোচকরা জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের সকল নেতাদের সাথেই আলোচনা করবেন। জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার নেলসন ম্যাণ্ডেলা ইনস্টিটিউট অব পীস-এর প্রধান রাধা কুমার মধ্যপন্থী হুররিয়াত নেতা মীর ওয়াইজ ওমর ফারুক ও স্বাধীনতাকামী নেতা সাইয়েদ আলী শাহ গিলানীর সাথে নেপথ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি রাধা কুমার কাশ্মীর সফর করেন এবং শ্রীনগরে চিকিৎসাধীন গিলানীর সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন মতের নেতাদের সাথে স্থায়ী সংলাপ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে গত সেপ্টেম্বরে ভারতের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী পরিষদ কমিটির বৈঠকে। এ

www.pathagar.com

বৈঠকে সরকার ঘোষিত ৮ দফা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এ আলোচকদের নিয়োগ করা হয়। দিল্লী সরকারের ৮ দফার মধ্যে গত ১১ জুন/১০ থেকে শুরু হওয়া গণ-আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দেবার ঘোষণাও রয়েছে। জননিরাপত্তা আইনের আওতায় আটক ব্যক্তিদের মামলাসমূহ অবিলম্বে পুনর্বিচেনার জন্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে মধ্যপন্থী হুররিয়াত নেতা মীর ওয়াইজ মোহাম্মদ ফারুক সরকার নিযুক্ত প্যানেলের সাথে আলোচনায় রাজী থাকলেও স্বাধীনতাকামী আপোষহীন নেতা সাইয়েদ আলী শাহ্ গিলানী এটাকে 'নিষ্ফল চেষ্টা' বলে মন্তব্য করেন। তিনি কাশ্মীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য তাঁদের ৫ দফা পূরণ না করা পর্যন্ত কোন আলোচনা সুফল বয়ে আনবে না বলে মনে করেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল ভারত সরকারের সংলাপ প্রক্রিয়াকে সময় ক্ষেপণের কৌশল বলে মনে করেন। কাশ্মীরে যতোদিন 'জননিরাপত্তা আইন' বলবৎ থাকবে এবং সেনা-নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে অসীম ক্ষমতার চাবুক থাকবে, ততোদিন কাশ্মীরে গণহত্যা ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। সরকারকে কাশ্মীরের বেশ কিছু এলাকা থেকে সেনা টহল তুলে নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছেন কাশ্মীর সফরকারী রাজনৈতিক নেতারা। সন্দেহবশতঃ কাশ্মীরীদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে সেনা ও নিরাপত্তা রক্ষীদের নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারেও তারা কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সরকার এসব পরামর্শ কতটা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। স্বাধীনতাকামী নেতাদের গ্রেফতার এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও কাশ্মীর উপত্যকায় উপর্যুপরি কার্ফ্যু দেবার ঘটনা ঘটছে। কার্ফ্যু থাকাকালীন সময়ে সিভিল প্রশাসন অকার্যকর থাকে এবং নিরাপত্তা বাহিনী সিআরএফপি এবং সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও তৎপরতা বেড়ে যায়। কার্ফ্যু ভঙ্গকারী কিংবা সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে নির্বিচার গুলি করলেও তাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

সরকারের সামগ্রিক আচরণে কোন নমনীয়তা ও মানবিকতার নমুনা দেখা যাচ্ছে না। ফলে কাশ্মীর উপত্যকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী সেনা সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিহত হয়েছেন, তারা কেউই তাদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। তারা সবাই নিরীহ মানুষ। সম্প্রতি 'রেডিও তেহরান' কাশ্মীরের নির্যাতিত মানুষের বিপন্ন অবস্থা নিয়ে একটি ফিচার প্রকাশ করেছে। 'গণবিক্ষোভ : কাশ্মীরের হাসপাতালগুলো কি নয়া দিল্লীর বক্তব্য সমর্থন করে?' শীর্ষক প্রশ্নবোধক ঐ ফিচারটিতে কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।

'দৈনিক সংগ্রাম' ২১ অকটোবর/১০ ফিচারটি প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, যারা সাম্প্রতিক তিনমাসে কাশ্মীরে নিহত ও আহত হয়েছেন, তাদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫

www.pathagar.com

বছর। আহতদের গুলি লেগেছে কোমরের নীচে। আহতরা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। তাদের ব্যাণ্ডেজ করা পা উপরের দিকে টানিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাসপাতালে বেডে শুয়ে তাঁরা কাতরাচ্ছেন। ভবিষ্যৎ জীবনে পঙ্গুত্বের অভিশাপ বহনের দুর্ভাবনায় তাঁরা অসহায় কান্নায় বুক ভাসাচ্ছেন। অথচ তাঁরা নিজেরা জানেন না কী তাঁদের অপরাধ। ভারতের অন্য কোন রাজ্যে জলকামান ও টিয়ারগ্যাস বা লাঠিচার্জ ব্যবহার না করে কখনও পাখীর মতো এ রকম গুলি করে মানুষ হত্যার নজীর নেই। এমনকি সশস্ত্র মাওবাদী গেরিলাদের সাথে ভারতের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনী কাশ্মীরের মতো নিষ্ঠুর আচরণ করে না। কাশ্মীরকে ভারত তাদের রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে, অথচ বিগত ৬০ বছরে তাদের কাছে জনগণের প্রাপ্য লাঞ্ছনা, বুলেট ও বারুদের জবাব ছাড়া আর কিছুই পায়নি। ৬০ বছরে ভারতের দখলদার বাহিনীর দ্বারা নিহত কাশ্মীরীর সংখ্যা যদি ৬০ হাজারও ধরা হয়, তাহলে প্রতি বছর তারা এক হাজার কাশ্মীরীকে হত্যা করেছে। আহত ও পঙ্গু করেছে এর কয়েকগুণ মানুষকে। প্রতিদিন গড়পরতা ২/৩টি মানুষকে ভারতীয় দখলদারিত্বের শিকার হয়ে জীবন দিতে হয়েছে, যা উপনিবেশিক বৃটিশ শাসনকালেও ভারতের কোথাও ঘটেনি।

এবারের গুলি বর্ষণে এখন পর্যন্ত কাশ্মীর উপত্যকায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১১, আহত ও পঙ্গু হয়েছেন আরও অনেকে। পুলিশের ধর-পাকড়, জিজ্ঞাসাবাদ-গ্রেফতারের ভয়ে অনেক আহত ব্যক্তি গোপন চিকিৎসা নেয়। আহতদের অনেককে ক্র্যাচের ওপর ভর দিয়ে চলতে হবে সারা জীবন। অনেকে কোনদিন আর কখনো দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারবেন না। বিগত তিন মাসের তাণ্ডবে আহত ২০০ রোগীর চিকিৎসা হয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতাল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।"

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দাবী করেছেন যে, বিক্ষোভকারীরা যখন প্রচণ্ডভাবে মারমুখো হয়ে উঠে এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে, তখন নিরূপায় হয়ে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালায়। যারা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রোভোক ও উত্যক্ত না করলে কখনও তারা স্বাভাবিক কাজকর্ম ফেলে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর চড়াও হয় না। ইট-পাটকেল-পাথরের জবাবে কোন সভ্য দেশের নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচার গুলি চালায়, এ ঘটনা কেবল ভারতীয় 'বৃহৎ গণতন্ত্রের' ধ্বজাধারীদের পক্ষেই সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক খৃস্টান পাদ্রীর পবিত্র কুরআন পোড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনী প্রথম গুলি চালিয়েছে। চলতি নভেম্বর/১০, মাসের ১৩ তারিখ তাংমার্গ শহরে মুসলিমদের হাজার খানেক মানুষ প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের তাড়া দেয়। হঠাৎ করেই বিনা উস্কানীতে এবং সতর্কতা না জানিয়ে গুলি বর্ষণ করা হয়। ১০ থেকে ২০ মিটার দূর থেকে নিরাপত্তা বাহিনী টার্গেট করে গুলি চালায়। তারা ফাঁকা আওয়াজ করেও বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার চেষ্টা করেনি। এ

www.pathagar.com

ঘটনায় আহত ২৩ বছরের সাজ্জাদ নবী হাসপাতালে শুয়ে 'রেডিও তেহরান-প্রতিনিধিকে' এ কথাই বলেছেন। একই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ২৪ বছরের মোখতার আহমদ। মোখতার বলেছেন : 'বিক্ষোভ মিছিল থেকে পুলিশ বিনা কারণে দশটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপরই জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তাদের মুক্তির দাবীতে স্থানীয় থানার সামনে জড়ো হয়। এরপর সি আর পি এফ হঠাৎ করেই গুলি বর্ষণ করে। গুলিবিদ্ধ মোখতার আহমদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরও পুলিশ তাকে বেধড়ক পিটিয়েছে।

শ্রীনগর-হাসপাতালে গুলিতে আহত চিকিৎসাধীনরা বলেছেন, তারা নিজেরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর কোন ইট-পাটকেল পাথর নিক্ষেপ করেননি। তবে তারা যতোদিন বেঁচে থাকবেন, ততোদিন কাশ্মীরকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত থেকে স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলীয় শহর সোপোরে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত ২৬ বছরের আশরাফ জানান, 'আমাকে লক্ষ্য করে সরাসরি গুলি চালানো হয়েছে। পুলিশ ঘরে ঢুকে হামলা করে। যা পায়, তা ভাংচুর করে। আমাদের মা-বোনদের মারপিট করে। তাই বাঁচতে হলে 'আমাদের স্বাধীনতা চাই।' ১৫ বছরের আহত কিশোর আকিবের শয্যাপাশে বসে তার মা রাজা বেগম জানান, রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় সে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে আহত হয়েছে। রাজা বেগম বলেন : "কাশ্মীরের কর্তৃপক্ষ কতটা অমানুষ হতে পারে, এটি তারই একটি উদাহরণ। ভারতকে সবাই গণতান্ত্রিক বলে। কিন্তু কাশ্মীরের দিকে তাকান। দেখবেন, আমরা এখানে জঘন্যতম সেনাশাসনের অধীন জীবনপাত করছি।"

ভারতীয় নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর কাজই হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায় নির্যাতন চালানো ও মানুষ হত্যা করে ভীতি ও সন্ত্রাস তৈরি করা। নির্বিচার গুলি চালাতে তারা পারঙ্গম। এমনকি তারা ভুয়া এনকাউন্টার সাজিয়েও মানুষ হত্যা করছে। তাদের এই গণহত্যা নির্যাতনের ধারা অব্যাহত থাকলে কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষই আজাদী সংগ্রামের সৈনিক হতে বাধ্য হবেন।

দখলদার বাহিনীর পাইক-পেয়াদারা

কাশ্মীরের জনগণের আজাদী দমন করতে ভারত তার পাঁচ লক্ষাধিক নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও, প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী, স্পেশাল ব্রাঞ্চ কাশ্মীর, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কাশ্মীর, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স [সি আর পি এফ], স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, নিয়মিত পুলিশ বাহিনী ইত্যাদি নানা ধরনের লাঠিয়াল বাহিনী ব্যবহার করে উপত্যকাকে অশ্রু ও রক্তের এক বধ্যভূমি বানিয়েছে।

এসব ঘাতক-নির্যাতক বাহিনীর কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান ও অব্যাহতির জন্য কালো আইন চালু করা হয়েছে। এর একটি হচ্ছে : Armed Forces Spcial Powers Act-1958 এবং অন্যটি হচ্ছে, Disturbed Arcas Act-1961, প্রথম কালো

www.pathagar.com

আইনটি চালু করেন পণ্ডিত নেহেরু এবং দ্বিতীয়টি তাঁর কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। ভারত ১৯৫৮ সাল থেকে আজ অবধি একদিনের জন্যও Armed Forces Spcial Powers Act-1958-কে স্থগিত করেনি। ফলে কয়েক দশক ধরে কাশ্মীরের মানুষ এক নিষ্ঠুর বন্দীশালায় বসবাস করছেন। রক্ষণশীল হিসেবেই এসব ভারতীয় ঘাতক বাহিনীর হাতে প্রায় ৫০ হাজার কাশ্মীরীকে জীবন দিতে হয়েছে। অন্য হিসেবে ৭০ হাজার থেকে প্রায় ১ লাখ।

ভারতের কূটনীতি এবং কাশ্মীর পরিস্থিতি : মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ

ভারত দীর্ঘদিন ধরেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে। তবে এজন্য ভারতকে ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে। যথা : ১. নিজ দেশে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ২. আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও আইন-কানুনসমূহের অনুসরণ, ৩. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং ৪. মানবাধিকার সংরক্ষণ।

এসব শর্ত পূরণে ভারতের সামর্থ্য ও সদিচ্ছা পর্যবেক্ষণে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর সহযোগী অধ্যাপক ও Peoples Tribunal-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ড. অঞ্জনা চ্যাটার্জি ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের মানবাধিকারের পরিস্থিতি তদন্ত করে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। ৬ সদস্যের ঐ কমিটি ২০০৮-এর এপ্রিলে গঠিত সদস্যদের নিয়ে ঐ বছরের ১৮ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত কাশ্মীরের বারমুল্লা ও কুপওয়ারী জেলায় তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন। এ অভিজ্ঞতা নিয়ে ড. অঞ্জনা চ্যাটার্জি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা London Institute of South Asia- জার্নালের অকটোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে তিনি লিখেছেন, বারমুল্লা জেলার কাদার মধ্যে, পাথরের স্তূপের নিচে, ঘন ঘাসের মাঠে, পাহাড়ের পাদদেশে ও সমতল ভূমিতে ভারতীয় সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর নির্যাতনে নিহত কাশ্মীরের ৯৪০টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বেশির ভাগ কবরেই একাধিক ব্যক্তির লাশ রয়েছে। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর নির্দেশে বাধ্য হয়ে জনগণ নিজেদের আপনজনের কবর খুঁড়তে বাধ্য হয়। টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে বিদেশী জঙ্গী আখ্যা দিয়ে দিনের পর দিন নির্যাতন করে ও তথাকথিত ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে বলে প্রচার করা হয়। এ জন্য কোন প্রমাণ বা তদন্তের প্রয়োজন হয়নি। তিনি বারমুল্লা জেলার উরি ও রাজামহল্লায় ১৯৯৬-৯৭ সালের ২২টি গণকবর, কাজীপুরায় ১৯৯১ সালের ৭টি গণকবর (যেখানে ১৩ জনকে কবরস্থ করা হয়েছে), মীরমহল্লা, কিছামা, শিরী জনপদে ১৫০টি গণকবরের সন্ধান পান যেখানে ১৯৯৪-২০০৩ সাল নাগাদ ২২৫ থেকে ২৫০টি লাশকে সমাহিত করা হয় এবং আদর্শ গ্রাম সংলগ্ন ৯টি গণকবরের সন্ধান পান।

কুপওয়ারা জেলার ট্রেহগাম গ্রামে তিনি ১০০টি গণকবরের সন্ধান পান যার মধ্যে ২৪টি গণকবরের লাশসমূহের পরিচয় এলাকাবাসী সনাক্ত করেছে। এখানে শায়িত আছেন

www.pathagar.com

শেখ আবদুল্লাহ গঠিত ধর্মনিরপেক্ষ দলের প্রধান নেতা মকবুল বাট। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি সেক্যুলার, স্বাধীন গণতান্ত্রিক কাশ্মীরের দাবী করেছিলেন। দীর্ঘদিন ভারতের কুখ্যাত তিহার জেলে আটক রাখার পর ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট মকবুল বাট-এর ফাঁসির রায় প্রদান করে। মকবুল বাট-এর ভাইপো পারভেজ আহমদ বাট তদন্তদলকে জানায়, ১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বেই মকবুল বাটের ভাই হাবিবুল্লাহ বাটকে ভারতীয় বাহিনী অপহরণ ও গুম করে। এরপর তদন্ত দল রেজিপুরায় যান এবং ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত শহীদী গোরস্থানে যান। সেখানে ২৫৮টি গণকবরণ রয়েছে। উক্ত কবরসমূহের নম্বর ও পরিচিতি বিদ্যমান। এরপর তারা সাদীপুরা ও কান্ডিতে যান। স্থানীয়রা সেখানে ২০ জনের গণকবরের সন্ধান দেন, যেগুলো বুনোফুলের জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। সাদীপুরায় কাশ্মীরীদের নেতা রিয়াজ আহমেদ বাট-এর কবর রয়েছে। যাঁকে ২৯/০৪/২০০৭ সালে তথাকথিত ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। ভারতীয় বিভিন্ন বাহিনীর বাধার মুখে তদন্ত দল তাদের তদন্ত অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হয় এবং ড. অঞ্জনা নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান।

ড. অঞ্জনা তাঁর প্রবন্ধে কাশ্মীর উপত্যকার যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা দেন তা হলো দুই দশকের সহিংসতা ও নৃশংসতায় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার)+ কাশ্মীরীকে হত্যা করা হয়েছে, ৮০০০+কে গুম করা হয়েছে, ৬০,০০০+কে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে, ৫০,০০০+এতিম শিশু রয়েছে, অগণিত নারী ও বালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, সেখানকার মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি। ২০০৭ সালের কাশ্মীরের একমাত্র হাসপাতালে মানসিক রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৮,০০০। সেখানে মাইলের পর মাইল নিরাপত্তা বাহিনী কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে। আইন-কানুন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, রাজনীতি করার অধিকার দানবিক শক্তি দিয়ে পদদলিত করা হচ্ছে। কাশ্মীরের প্রতিটি নাগরিকই ভুক্তভোগী। তাদের প্রত্যেকের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে, প্রত্যেকের মনে রয়েছে অনেক না বলা কথা, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে তারা বিপর্যস্ত। বাস্তুচ্যুত অগণিত মানুষের হাহাকার কাশ্মীর উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তদন্ত দলের সদস্যদের পরিণতি : এডভোকেট ইমরোজ ও ড. অঞ্জনার নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটির সদস্যদের তদন্তকালীন ও পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :
তদন্তকালীন সময়ে তদন্ত দলকে বিভিন্ন ভারতীয় বাহিনী পদে পদে বাধা দিয়েছে। তাদের গাড়িকে বিভিন্ন বাহিনী অনুসরণ করেছে, সাধারণ নাগরিকদের সাথে কথা বলতে বাধা দিয়েছে। তদন্ত কমিটির সদস্যদের টেলিফোনে জানমালের হুমকি দিয়েছে। তদন্ত কমিটির সদস্যদের উপর সংক্ষিপ্ত সময়ে যে নির্যাতন নেমে এসেছে তা হলো :

www.pathagar.com

১. ড. অঞ্জনাকে ইমিগ্রেশন বিভাগ হয়রানি করেছে, ফিরতি পথে বিমানে টেলিফোন করে প্রাণনাশ ও ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়েছে।
২. এডভোকেট ইমরোজকে তিনবার হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে, তাঁর পাসপোর্ট জব্দ করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে নিজ গৃহে বাস করেন না।
৩. খুররম পারভেজ তাঁর পা হারিয়েছেন।
৪. গৌতম নবলক্ষ্যা ও জহির উদ্দীনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে এবং চরম ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

সরকারের সাথে সাথে উগ্র হিন্দুদের দল তদন্ত কমিটির সদস্যদেরকে প্রাণে মারার ও তাদের পরিবারকে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে।

ভারতীয় বাহিনীর নির্যাতনের পন্থাসমূহ

তদন্তকালে ড. অঞ্জনা ভারতীয় বিশেষ বাহিনীসমূহ ও পুলিশী নির্যাতনের যে সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছেন তা নিম্নরূপ :

ক. আটক করার পর একজন লোককে মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা উপর দিয়ে ঝুলানো হয়, অতঃপর তার মলদ্বারে সিরিঞ্জ দিয়ে পেট্রোল প্রবেশ করানো হয়। পরবর্তীতে মুখে কাপড় বেঁধে পানি ঢালা, পানিতে চুবানো, ক্ষুধার্ত রাখা, অঙ্গহানি করা এবং নারী ও শিশুকে ধর্ষণ ও বলাৎকার করা প্রভৃতি।
খ. অনেক কাশ্মীরী বালক শৈশবে নিজের বাহুতে ঈগলের ছবি বা উল্কি আঁকে। ভারতীয় বাহিনী এরূপ উল্কিকে আজাদীর চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সংশ্লিষ্ট স্থান জ্বালিয়ে দেয়।
গ. সেনা সদস্যরা একজন তরুণীকে তাঁর মায়ের সামনে ধর্ষণ করছিল। উক্ত মা অনুনয় বিনয় ও কান্নাকাটি করছিল মেয়ের মুক্তির জন্য। সেনা সদস্যরা গান পয়েন্টে উক্ত মাকে মেয়ের ধর্ষিত অবস্থা দেখতে বাধ্য করে এবং পরে গুলি করে হত্যা করে।
ঘ. তদন্ত টীম শ্রীনগরের দুটি পরিবারের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। সাক্ষ্যে তারা বলে, পুলিশ শ্রীনগরের পুরাতন শহরে তাদের সন্তানদের গুলি করে হত্যা করে ফেলে যায়। রাতে পরিবারের সদস্যরা লাশ তুলে এনে কবর দেয়ার বন্দোবস্ত করলে পুলিশ পুনরায় ফিরে আসে। পরিবারের সহায়-সম্পদ বিনষ্ট করে এবং নারীদেরকে নির্যাতন করে।
ঙ. তদন্ত দল উত্তরাঞ্চলীয় জেলা কুপওয়ারা সফরের সময় ১৯৭৯ সালে স্থাপিত ৬টি বিশাল আর্মি ক্যাম্প দেখেন যেখানে আর্মি ও প্যারামিলিশিয়া ক্যাম্পের পরিচালনাধীন সাতটি ইন্টারোগেশন সেল প্রত্যক্ষ করেন। কাছাকাছি স্থানে স্থাপিত পুলিশ পরিচালিত অনুরূপ সেল আরও ছিল।
চ. কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্যাতন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

www.pathagar.com

লেখিকা মরিয়ম ছাকিনা তাঁর "The sentiment in the streets of Srinagar." প্রবন্ধের শুরু করেছেন এভাবে ঃ

Kashmir burns... It has been, since the Maharaja's fateful manoeuvring in 1947 that sealed Kashmir's miserable plight, however not perhaps with so much passion and fervour of the mass-man on the streets in the face if indiscriminate brutality perpatrated by the Army of one of the world's biggest democracies."

ছ. ভারতের বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও লেখিকা অরুন্ধতী রায় কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : "It is the only thing Kashmir wants. Denial is delusion;... Day after day hundreds of thousands of people swarm around places that hold terrible memories for them. They demolish bunkers, break through cordons of concertina wire and stare straight down the barrels of soldiers, machine guns, saying what very few in India want to hear. [সূত্র : মরিয়ম ছাকিনার প্রবন্ধ, LISA journal oct-dec-2008]

জ. কাশ্মীরে ভারতীয় নির্যাতন সম্পর্কে কাশ্মীরী নেতা সৈয়দ আলী শাহ গিলানী লিখেছেন : "Today, the numbers of Kashmiri prisoners languishing in Indian Jails suffering torture and abuse that is obscured by India's Propaganda machinery is appallingly high. Kashmiris refuse to forget the fathers, brothers and sons killed or 'disapperaed' the mothers, sisters and daughters raped... Leaders of Kashmir's freedom fighting movement labour in prisons." (সূত্র : Authentic voice of south Asia, Syed Ali Shah Geelani, p-155)

পাকিস্তানের অবস্থান

পাকিস্তান ও ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা বিভক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত। এই সাথে দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাশ্মীর হচ্ছে বাড়তি বিষফোঁড়া। ভারতের প্রথম অভিযোগ, উপ-মহাদেশ বিভক্তকারী 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' নিয়ে। দ্বিতীয় অভিযোগ, 'সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয়। তৃতীয় অভিযোগ, পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়ে। চতুর্থ অভিযোগ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সামরিক প্যাক্ট-এ শামিল হওয়া। পঞ্চম অভিযোগ, পাকিস্তান তার

www.pathagar.com

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করেছে। পঞ্চম অভিযোগ, ভারতের সমান্ত রালে পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি অর্জন। ষষ্ঠ অভিযোগ, ১৯৭১-এ দ্বি-খণ্ডিত হয়েও পাকিস্তান এখনও টিকে আছে এবং ভারতের জন্য পাকিস্তানের দিক থেকে তাদের নিরাপত্তার এতটুকুও থ্রেট কমেনি। বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। ষষ্ঠতঃ পাকিস্তান হচ্ছে, 'ইসলামী মিলিট্যান্ট গোষ্ঠীর প্রজনন ক্ষেত্র'। যা শুধু ভারতের নিরাপত্তার জন্যই তারা ক্ষতিকর বলে মনে করে না, পশ্চিমের মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক স্থিতির প্রতিও হুমকি বলেও তারা মনে করে। সপ্তমতঃ কাশ্মীরে স্বাধীনতার আন্দোলন, ভারতের দৃষ্টিতে যা 'বিচ্ছিন্নতাবাদ'– তার পেছনে পাকিস্তান উস্কানী দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের মতে, দখলীকৃত কাশ্মীরসহ ভারতের অন্যান্য স্থানে যতো সব অন্তর্ঘাত ও বোমা-সন্ত্রাস চলছে, তা পাকিস্তান ভূ-খণ্ড থেকে পরিচালিত 'ক্রসবর্ডার টেরোরিজমের' কারণে ঘটছে। ভারতের এই অভিযোগের তালিকায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশেষ অভিযোগ হচ্ছে, মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলায় পাকিস্তানের সম্পৃক্ত থাকা।

সুতরাং কেবল কাশ্মীর ইস্যুই পাক-ভারত বিরোধ ও আস্থার সংকট নিরসনের একমাত্র দাওয়াই নয়। দ্বি-পাক্ষিক আজন্ম বৈরীতার সাথে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণে ভারতের সাথে হাত মিলিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইল অক্ষশক্তি। গণচীনের বিরুদ্ধে ভারতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহারের পশ্চিমাদের লক্ষ্যও এই সাথে মিলিয়েছে।

১৯৭১ সালের যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারত-পাকিস্তান 'সিমলা চুক্তিতে' স্বাক্ষর করে। এতে শক্তিপ্রয়োগ নয়, আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়াই হবে পাকিস্তান-ভারতের মধ্যকার সকল অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দু'পক্ষই স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তান ভারতের মধ্যে আর কোন বড়ো ধরনের যুদ্ধ হয়নি। তবে কারগিল নিয়ে সামরিক সংঘাতকে কেন্দ্র করে দু'দেশের মধ্যে পরমাণু যুদ্ধ শুরুরও একটা আশংকা তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানের পরমাণু বোমার জনক ড. কাদির খান বলেছেন : 'পাকিস্তানের কাছে পরমাণু বোমা থাকায় ভারত নতুন করে পাকিস্তানের সাথে আর কোন যুদ্ধে জড়ায়নি।' তবে ৯/১১-এর পর পাক-ভারত বিরোধের চিরচেনা দৃশ্যপটের সাথে মার্কিন স্টাবলিশমেন্ট ঘোষিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' পাকিস্তানকে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। পাকিস্তানের প্রতিবেশী আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, মার্কিন-ন্যাটো বাহিনীর বিশাল সামরিক শক্তি সমাবেশ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে যেমন ঘোলাটে ও অস্থিতিশীল করে তুলেছে, তেমনি পাকিস্ত ানের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার চরিত্রও বদলে দিয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই'র পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাইভেট বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্যের অবাধ বিচরণ ও অন্তর্ঘাত চালানো ছাড়াও পাকিস্তানের মূল ভূ-খণ্ডে চালকবিহীন মার্কিন ড্রোন যুদ্ধ বিমানের উপর্যুপরি হামলা, আফগান, তালেবান-ইসলামী জঙ্গি ইস্যুকে

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র সন্দেহের চোখে দেখার ফলে দ্বি-পাক্ষিক আস্থার সংকট পাকিস্তানের জন্য এক শ্বাসরুদ্ধকর উভয় সংকট তৈরি করেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ শাহ কোরেশী ওয়াশিংটনে মার্কিন নীতি নির্ধারকদের প্রতি পাকিস্তানের 'সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের' আহ্বান জানিয়েছেন। আমেরিকা পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা না করে বরং পাকিস্তানকে ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে চায় বলে পাকিস্তানীরা ব্যাপকভাবে সন্দেহ করছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় (FATA, Federal Administratered Area) তারা নতুন ভূগোল তৈরি করতে চায়। আফগানিস্তানে মার্কিন-ন্যাটো বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত তালেবানদের সাথে মার্কিন সামরিক কমাণ্ড এবং কারজাই সরকার আপোষ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিলেও পাকিস্তানকে ইসলামিক মিলিট্যান্টদের সাথে সমঝোতা করতে দিতে চায় না খোদ মার্কিন সরকার ও পেন্টাগন। আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধকৌশল অনেকটা সীমিত ও ডিফেনসিভ হয়ে আসছে। এই সাথে পাকিস্তানের উপ-জাতীয় অঞ্চলে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও সামরিক অভিযান স্তিমিত হয়ে এসেছে। এই উপজাতীয় পশতুনরা যেমন মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন, তেমনি কাশ্মীরের মুজাহিদ অভিযানের মূলশক্তিও ছিলেন। আফগান উপজাতীয়তদের ঐতিহ্যবাহী সামরিক সাহসিকতা ধ্বংস করার নানামুখী চক্রান্তের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও নিজ দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। তবে পাকিস্তানের করাচীসহ মসজিদ-মাদ্রাসায় নতুন করে সন্ত্রাসী হামলা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপের আভাস পাওয়া যায়। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের সাম্প্রতিক গণজাগরণের পর পাকিস্তানের করাচীতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সেখানকার রাজনীতিকে আরও সংঘাতমুখী ও অস্থিতিশীল করে তুলেছে। এসব অন্তর্ঘাতের পরিণতি পাকিস্তানের জন্য শুভ নয়। মার্কিন 'ড্রোন' বিমান হামলায় বিপুল সংখ্যক সিভিলিয়ানের মৃত্যুর সাথে তিনজন সেনাবাহিনীর সদস্যের মৃত্যু ঘটলে পাকিস্তান-আফগানিস্তানে-আমেরিকানদের সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দেয়। একই সময় পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে মার্কিন সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু জ্বালানীবাহী ট্যাংকার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানী সেনাহত্যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে কয়েক দফা 'ক্ষমা' চাইবার পর ঐ সরবরাহ লাইন পাকিস্তান আবার খুলে দিয়েছে। তবে একটা অবিশ্বাস ও লুকোচুরির দোলাচল পাক-মার্কিন সম্পর্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ফলে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সাথে পাকিস্তানের দরকষাকষির অবস্থানটি কৌশলগত কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এদিকে বব ওয়ার্ডের সাড়া জাগানো 'ওবামা'স ওয়ার' বইয়ে পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীর এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি নতুন করে পাক-মার্কিন সম্পর্কের গতি-

www.pathagar.com

প্রকৃতি নিয়ে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করেছে। 'দ্য নিউজ' ও এএফপি-র বরাত দিয়ে 'দৈনিক নয়া দিগন্তের' সাম্প্রতিক এক খবরে : [১৪/১০/১০] পাকিস্তানের সাথে মার্কিন বন্ধুত্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট 'জারদারী আইএসআই-র সমর্থিত এক বিস্ফোরক মন্তব্যে বলেছেন যে, পাকিস্তানে হামলার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের হাত রয়েছে। আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই তাঁকে এ তথ্য দেন এবং পাকিস্তানী গোয়েন্দারাও এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এর সাথে ভারতের সহযোগিতা সম্পর্কেও পাকিস্তান ওয়াকিবহাল। বায়তুল্লাহ্ মেহমুদের সাথে মার্কিন সিআইএ-এর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এই সংগঠনের ক্যাডাররাই বেনজীর ভুট্টোকে হত্যা করেছে বলে ব্যাপক ধারণা রয়েছে। পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করে পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার লক্ষ্য এর পেছনে লুক্কায়িত বলে মনে করা হয়।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে ভারত মনে করে, দেশটি ভেঙ্গে পড়তে পারে। যদিও ২০০৯ সালের জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন : 'আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি প্রচেষ্টা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ...যদি পাকিস্তানী নেতাদের সততা থাকে, তাহলে আমরা তাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমরা তাদের সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো।" [সূত্র : অপর্ণা পান্ডে, দি মেইল, পাকিস্তান : কালের কণ্ঠ : ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০]

পাকিস্তান যতো সংকটেই থাকুক, কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে তারা কখনও নির্বিকার থাকেনি। পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনায় মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, কাশ্মীরের আন্দোলনে পাকিস্তানে নৈতিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন সবসময় রয়েছে। কাশ্মীরে ভারতের উৎপীড়নের বিষয়টি বিশ্ব দরবারে উত্থাপন করার কথাও তিনি বলেছেন। ভারত যাতে এই উৎপীড়নের পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়, তার জন্য পাকিস্তান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ভারতও অভিযোগ তুলেছে যে, পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যুটি জাতিসংঘ টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরে ভারতের মানবাধিকার লংঘন বন্ধ এবং কাশ্মীরের মানুষকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সেখানকার সমস্যা সমাধানে পাকিস্তান সরকারকে দ্বি-পাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৎপর হতে সরকারের ওপর অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ছে। উল্লেখ্য, পাক-ভারত যুদ্ধের পর প্রায় ৪০ বছর কেটে গেলেও ভারত 'সিমলা চুক্তি' অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে

www.pathagar.com

কোন আগ্রহ দেখায়নি। পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু জাতিসংঘে উত্থাপন করতে পারবে না, তারা কোথাও এ রকম দাসখত দেয়নি। জাতিসংঘও কাশ্মীর ইস্যুতে দায়মুক্ত হতে পারেনি।

কাশ্মীরের জনগণের কাছে জাতিসংঘ যে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ, তারও সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। জাতিসংঘ গৃহীত কাশ্মীর সম্পর্কিত একাধিক প্রস্তাব এবং কাশ্মীর সংক্রান্ত জাতিসংঘ মিশনের অন্যান্য কার্যক্রম জাতিসংঘ মুছে ফেলতে পারে না। সুতরাং জাতিসংঘ কার্যক্রম যেখানে স্থবির হয়ে আছে, সেখান থেকেই তা নতুন করে সক্রিয় করতে হবে। ভারতের প্রতি বিগত ৬ দশক ধরে পক্ষপাতিত্ব করে বিশ্ব সম্প্রদায় ভারতকে দানবে পরিণত করেছে। কাশ্মীরের মানুষ এই দানবের কবল থেকে মুক্তি চায়। জাতিসংঘ ইরাক-আফগানিস্তান-ফিলিস্তিন ইস্যুতে পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার নজীর স্থাপন করে তার ইমেজ ধ্বংস করেছে। কাশ্মীর ইস্যুতে এবার জাতিসংঘ তার প্রাতিষ্ঠানিক অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে কিছুটা হলেও ইমেজ পুনরুদ্ধার করতে পারে। কিন্তু মার্কিন পলিসি একেবারে ভারতঘেঁষা হওয়ায় তাদের কাছে এ ব্যাপারে আশা করা বৃথা।

কাশ্মীর নিয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপ কামনা

পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে 'দৈনিক নয়া দিগন্ত' [২৩ অকটোবর, ২০১০] খবর দিয়েছে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ শাহ কোরেশী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে আসন্ন ভারত সফরকালে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারতের সাথে আলোচনার আহ্বান জানিয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। কোরেশী বলেছেন, কাশ্মীরে সম্প্রতি সন্দেহভাজন জঙ্গি দমনের নামে ভারতীয় নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনী যে অভিযান চালাচ্ছে, তা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকির সৃষ্টি করেছে।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশাসন তথা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাকিস্তানের অনুরোধ রক্ষা করে ভারতের ওপর কাশ্মীর ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতি নন বলে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা কাশ্মীর নিয়ে নাক গলাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ হচ্ছে, ভারত ও পাকিস্তানকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নতুন করে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চাওয়ার একদিন পর ওয়াশিংটন এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করলো। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র পি-জে ক্রাউলী তাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেছেন : 'দুটি দেশের জন্যই কাশ্মীরের গুরুত্ব আমরা স্বীকার করি। আঞ্চলিক উত্তেজনার নিরসন ঘটিয়ে কাশ্মীর সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান আমরা দেখতে চাই। এ ব্যাপারে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে আরো আলোচনা

www.pathagar.com

হওয়া দরকার। উভয় দেশের পক্ষ থেকে আমরা বিষয়টিতে ভূমিকা রাখার আহ্বান পাইনি।'

এর অর্থ, কাশ্মীর ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অনুরোধ অপরিহার্য বলে মনে করে। আর তারা এও জানে যে, ভারত কখনও এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে তাদের ডাকবে না। কাশ্মীর সমস্যার শুরুতে জাতিসংঘে মার্কিন প্রতিনিধি সেখানে গণভোট অনুষ্ঠানের জাতিসংঘ প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। তখন সোভিয়েত প্রতিনিধি এর বিরোধিতা করেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন : 'এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন। দক্ষিণ এশিয়ার বহু বিরোধের মীমাংসায় যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করছে। কাশ্মীরী জনগণের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর সূচনা হওয়া উচিৎ। গত তিন মাসে কাশ্মীরে ১০০-এর বেশী লোক নিহত হয়েছে। যার বেশীর ভাগই কিশোর ও যুবক।" [সূত্র : কালের কণ্ঠ, ২৩ অকটোবর/২০১০]

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কাছের এক গ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে এক সংঘর্ষে আরও তিনজন স্বাধীনতাকামীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ঐ স্থানের এক ভারতীয় সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানোর আগেই ভারতীয় সেনাদের সাথে স্বাধীনতাকামীদের সংঘর্ষ বাঁধে বলে বলা হচ্ছে। ৯ ঘণ্টা ধরে চলা বন্দুক যুদ্ধ শুরু হলেও এলাকার কয়েকশ' অধিবাসী নিরাপত্তার জন্য গ্রাম ছেড়ে যান। সর্বশেষ এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, কোন রাজনৈতিক নিস্পত্তি কাশ্মীরীরা মেনে নেবে না।

বিচার্য অনুসিদ্ধান্ত

কাশ্মীর উপ-মহাদেশের এক জ্বলন্ত সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান না করে কাশ্মীরকে এশিয়ার আর একটি রক্তাক্ত ফিলিস্তিন বানিয়ে রাখা হয়েছে। আরব-ফিলিস্তিনীদের পিতৃভূমি দখল করে খৃস্টীয় সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে ইহুদীরা শুধু একটি কৃত্রিম রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করেনি। ইসরাইল তার সামরিক নিষ্ঠুরতা-অন্তর্ঘাত এবং সম্প্রসারণবাদী নীতির নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে রাষ্ট্রহীন ফিলিস্তিনী জনপদগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, ব্যাপক ও নির্বিচার গণহত্যা চালাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইরান-তুরস্ক-পাকিস্তানসহ ইসরাইলের সামরিক দস্যুতার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। ইসরাইলী নিরাপত্তা ডকট্রিন অনুযায়ী এশিয়া-আফ্রিকা কিংবা ইউরোপ যেখানেই হোক, তারা কোন রাজনৈতিক ও সামরিক হুমকিকে গুড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত নয়। ইসরাইল হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ছাউনী। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা এবং বিশ্ব ব্যবস্থায় তার আধিপত্য রক্ষায় ইসরাইল হচ্ছে তার অপরিহার্য অংশীদার।

ইসরাইলের সাথে পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ সামরিক প্রাযুক্তিক

www.pathagar.com

কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার নজীরবিহীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতকে আরও বেপরোয়া, হিংস্র ও লক্ষ্যভেদী করে তুলেছে। কাশ্মীর সহ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতাকামীদের দমনে ভারতীয় সামরিক নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে ইসরাইলের সামরিক ও মোসাদ-এর গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞরা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইসরাইল যেমন বিশ্বে একটি স্ব-ঘোষিত ধর্মতাত্ত্বিক সিকিউরিটি স্টেট, তেমনি ভারত হচ্ছে আর একটি সিকিউরিটি স্টেট– যা দৃশ্যতঃ সেক্যুলার রাষ্ট্র বলে পরিচয় দিলেও মূলতঃ ভারত হচ্ছে একটি অঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র। ইসরাইল যেমন তথাকথিত পবিত্র ভূমি উদ্ধারের 'মীথ' তৈরি করে একটি বিশাল ভূ-খণ্ড নিয়ে ইহুদী সাম্রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে, ভারতও তেমনি 'অখণ্ড' ভারত তথা 'ভগবান রামচন্দ্রের'– হারানো স্বপ্নে উদ্দীপ্ত হয়ে কাবুল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত 'রামরাজত্ব' প্রতিষ্ঠার নীল নকশা বাস্তবায়নে ব্যস্ত। ভারত তার চারদিকের সকল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্থিতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামরিক সক্ষমতা অর্জনের বিরোধী। অন্যদিকে এসব রাষ্ট্রের দুর্বলতা-অস্থিতিকে তার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণে ভারত সবগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চালকের আসন দখলসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলয়ের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতিকে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে একটি প্যাকেজ পলিসি-র আওতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যা ভারতের আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদী নীতির পরিপূরক। এ অঞ্চলে একমাত্র পাকিস্তান এবং তার পরমাণু শক্তি ও সামরিক সামর্থ্যই ভারতের রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা। জন্ম মুহূর্ত থেকে ভারত একদিনের জন্যও পাকিস্তানকে ইতিবাচকভাবে দেখেনি। পাকিস্তানের অভ্যুদয়-অস্তিত্বই ভারতের জন্য এক অসহ্য যন্ত্রণা। তাই পাকিস্তানকে 'ইসলামীকরণের' জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হচ্ছে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক চক্রে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী জঙ্গিবাদী ভঙ্গুর দেশ হিসেবে 'সীল' মেরে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র চলবে কিনা, নাকি সামরিক সরকারের আবির্ভাব ঘটিয়ে পেন্টাগনের যুদ্ধবাজদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে অতীতের মতোই পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে কিনা, কতটুকু করবে, এ নিয়ে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ শাহ কোরেশীকে এখনও দেন-দরবার করতে হচ্ছে!

ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইলী অক্ষের দোসর হিসেবে ভারতের অবস্থান এখন তুঙ্গে। ভারতীয় সামরিক তাত্ত্বিক ও সিভিল থিংকট্যাংক পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকা না থাকা নিয়ে অবিরাম হতাশাজনক প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বহুমাত্রিক সংঘাতপ্রবণতা পাকিস্তানের শত্রুদের লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজ করে দিচ্ছে

www.pathagar.com

বলেই মনে করা হচ্ছে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে [FATA] একটি স্যাটেলাইট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও নাকি মার্কিন পরিকল্পনায় রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলসহ পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রোভোকেটিং বিমান হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যার মার্কিন মিশনের সামরিক লক্ষ্য যদি পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন করা প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে থাকে, তবে তার পরিণতি এড়ানো পাকিস্তানের জন্য কঠিন হয়ে উঠবে। ভারত ও ইসরাইলের স্বার্থ এবং তার নিজের ভূ-রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্বকে অবজ্ঞা করার মার্কিন নীতি-অবস্থান পাকিস্তানের জন্য শাঁখের করাতের বিপদ ডেকে এনেছে। পাকিস্তানকে তার অভ্যুদয়ের পর থেকেই মার্কিন অক্ষ তার বাধ্যতামূলক মৈত্রীর নীতিতে গিনিপিগ ভিক্‌টিম করে রেখেছে। পাকিস্তানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং সেনাবাহিনীর মার্কিন তাঁবেদারী পাকিস্তানকে আমেরিকার কাছে সহজলভ্য ও অবজ্ঞার পাত্র বানিয়েছে। আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা-বৈরীতা অতিক্রম যে মনীষী বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনায় পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্র বানাতে সক্ষম হয়েছে, সেই ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানী ড. আবদুল কাদির খানকে জেনারেল মোশাররফ আমেরিকার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁকে পাকিস্তানে বন্দী জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা ও গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। পাকিস্তান তার পারমাণবিক অর্জন ধরে রাখতে পারবে কিনা, সে প্রশ্নে পাকিস্তানী নাগরিকরা উদ্বিগ্ন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা যখন সফরে আসছেন, তখন ভারতের অতি নিকটতম প্রতিবেশী এবং মার্কিনীদের দুর্দিনের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার পাকিস্তানকে তিনি পাশ কাটিয়ে যাবেন। ভারতের সাথে মার্কিন সম্পর্ককে পাকিস্তানের সমান্তরালে টেনে এনে ভারতকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না ওবামার প্রশাসন। অর্থাৎ পাকিস্তান এখন মার্কিনীদের প্রায়োরিটি তালিকা থেকে ক্রমশঃ অপসৃয়মান এক অতীত। পাকিস্তান ইচ্ছা করলে তার নিজের প্রয়োজনে হোয়াইট হাউস পেন্টাগনের তোয়াজ করবে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আশফাক কিয়ানীর সাথে সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ৩০ মিনিট আলোচনা হয়েছে ওয়াশিংটনে। এতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে মার্কিনীরা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে কতটা রাজী হয়েছে, তা অনিশ্চিত। পাকিস্তান না চাইলেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মার্কিন 'ড্রোন' বিমান হামলা চলবে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস অন্ততঃ জেনারেল কিয়ানীকে ড্রোন বিমান হামলা বন্ধের নিশ্চয়তা দেননি। যদিও প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন : "পাক-মার্কিন সম্পর্ক হবে অংশীদারিত্বের।" কিন্তু এই আশ্বাস সত্ত্বেও এই অংশীদারিত্বে পাকিস্তানের সার্বভৌম হিস্যা কতটুকু থাকবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি।

এই সামগ্রিক অবস্থাকে সামনে রেখে বর্তমান বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গতিধারা

www.pathagar.com

মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, 'ইন্ডিয়ান ডকট্রিন' তার সফলতার প্রায় ষোলকলা পূর্ণ করতে চলেছে। বাংলাদেশ সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সেক্যুলার পরিচিতির পালক পরিধান করতে যাচ্ছে। উপ-মহাদেশ বিভক্তির প্রাক্কালে আজ থেকে ৬ দশক আগে কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহও ভারতীয় কংগ্রেস ও পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর সেক্যুলার পন্থার অনুসারী হয়ে নিজেও প্রতারিত হয়েছেন এবং কাশ্মীরীদেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। শেখ আবদুল্লাহ খুব অল্প সময়েই ভারতের সেক্যুলারিজম ও বন্ধুত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। ভারত থেকে সরে আসতে গিয়ে নিজেই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের আক্রোশের শিকার হয়ে দীর্ঘ দু'দশকেরও বেশী কারা জীবনের নিঃসঙ্গতা ভোগ করেছেন। কারামুক্ত হয়ে তিনি যখন বেরিয়েছেন, তখন তাঁর বয়স ৭৫ বছর, জীবন সায়াহ্নের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরের ব্যাঘ্র, শের-এ-কাশ্মীরের স্তিমিত গর্জনশক্তি উচ্চকিত হয়নি। এর পাশাপাশি ভারত বখশী গোলাম মোহাম্মদ, মীর কাসিমদের মতো অনেক দালাল তৈরি করে কাশ্মীরকে শৃংখলিত করার ষড়যন্ত্র বাস্ত বায়নে অনেক দূর এগিয়েছে। শেখ আবদুল্লাহ তাঁর রাজনৈতিক মিশনে একজন ব্যর্থ, প্রতারিত ও নিঃসঙ্গ খলনায়ক হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। কাশ্মীরের জনগণ তাঁর সেক্যুলারিজমের সাথে সখ্যতার খেসারত দিয়ে যাচ্ছে। ভারত সেক্যুলারিজমের উচ্চকণ্ঠ প্রবক্তা হয়েও কাশ্মীরের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সহ্য করতে পারছে না। অযোধ্যায় বধ্যভূমিতে মুসলিমরা বলির পাঠা। মুসলিমদের টিকে থাকতে হলে আত্মসমীক্ষা ও আত্মানুসন্ধান দরকার।

১৯৪৭-এর রাজনৈতিক অর্জনটুকু না আসলে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মুসলিমদের অবস্থা ভারতীয় মুসলিমদের চেয়েও শোচনীয় হতো। জিন্নাহ সাহেব মুসলিমদের অতীত স্বপ্ন লালন ও ভবিষ্যতের স্বপ্নকে পরিপূর্ণ করার একটি ভূ-খণ্ড দিয়ে গিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার অপবাদে, আত্মবিশ্বাস ও শিকড় বিরোধী বিচ্যুতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সেই অর্জন আমরা হারাতে পারি না। এত ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্যে কাশ্মীরের আজাদী পাগল মানুষ আমাদের দিশারী। এক অসম দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে কাশ্মীরী জনগণের মহাসংগ্রাম একদিন সফল হবেই। আমরা সেই সুদিনের প্রত্যাশায় রইলাম। সৌখিন রাজনীতিক, পথ ভোলা, আয়েশী ধর্মতাত্ত্বিক কিংবা মগজ বিক্রি করা সিভিল ও মিলিটারী ব্যুরোক্রেট অথবা ভাড়াটে সুশীলদের বন্দীশালা থেকে সাধারণ মানুষকে বের হয়ে আসার পথ দেখাতে হবে। পঞ্চাশের দশকে যেমন তৃণমূল জনগণের জাগরণে উপমহাদেশের নতুন ভূগোল ও ইতিহাস তৈরি হয়েছিল, সেই জনগণের কাছেই আবার ফিরে যেতে হবে। তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই কেবল এ অঞ্চলের মুসলিমদের আত্মবিলোপ ও বিপর্যয় ঠেকাতে পারে। ভারত হয়তো সাময়িকভাবে তার

১৯—

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদের বিজয় অত্যাসন্ন দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের মনের দরজায় তালা দিয়ে তাদের আজাদী হরণ করে ভারত যদি আর একটি মোঘল সাম্রাজ্য বা বৃটিশ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বপ্ন মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, তবে তা বুমেরাং হবে। ভারতের ভেতরের গণসংগ্রামের সাথে বাইরের গণমানুষের বিদ্রোহের স্রোতধারা মিলিত হয়ে যে অগ্নিগিরি প্রচণ্ড গতিবেগ ধারণ করবে, তা সামাল দেবার শক্তি ভারতের নেই। ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক শক্তি ধ্বংসের বিভীষিকা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন বিজয় পায়নি। ইরাক আছে, ইরাকে নতুন প্রজন্মই ইরাককে নেতৃত্ব দেবে। ফিলিস্তিনীরাও মৃত্যুর রক্তাক্ত উপত্যকা সাঁতরে জীবনের ঠিকানা খুঁজে নেবে। সর্বহারাদের জীবন দেওয়া ছাড়া প্রতিরোধের আর কোন শাণিত অস্ত্র নেই। ইরাক আফগানিস্তানে লাখো লাখো সাধারণ মানুষ কিংবা প্রতিরোধকারী যোদ্ধাদের রক্তের বন্যায় সাঁতার কেটে ক্লান্ত অবসন্ন ক্রুসেডীয় দানবরা ক্লান্ত, অবসন্ন। তারা স্বদেশে ফিরে যেতে চায়। ইরাক-আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করেছে, ভারত কাশ্মীরসহ এ অঞ্চল জুড়ে যদি মৃত্যু ও ধ্বংসের সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চায়, তাতে কেউ বাধা দেবার নেই। গণচীন ভারতের সামরিক অভিলাষ প্রতিরোধে কতটা ঝুঁকি নেবে, তা পরিষ্কার নয়। কাবুল থেকে কাশ্মীর-দিল্লী-বাংলাদেশ পর্যন্ত নব্য সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র থাবা উদ্যত। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলিম নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের রক্তক্ষয়ী আজাদী সংগ্রাম এই বার্তাই দিচ্ছে। কাশ্মীর দূরের জনপদ হলেও কাশ্মীরী মুসলিমরা আমাদের আত্মার আত্মীয়, সংগ্রামের সহযোদ্ধা এবং আজকের প্রেক্ষিতে তারা মুক্তিকামী সকল মানুষের প্রেরণা। উপমহাদেশের মুসলিমরা আজাদী পেয়েও তারা আজ হারাতে বসেছে। আর কাশ্মীরিরা আজাদী পুনরুদ্ধারের অন্তহীন সংগ্রামে লিপ্ত। দুটি ধারার প্রায় সহাবস্থান নতুন করে ইন্ডিয়ান ডকট্রিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্য এবং চেতনার সমসূত্রকে গ্রন্থিত করেছে। এখানে নয়া ইতিহাস গড়ার সম্ভাবনা। ■

তথ্যসূত্র

১. Kashmir : In The Crossfire, Victoria Schofield, 1.B. Tairis Publishers, London, New york, 1996.

২. Pakistan : At The Crosscurent of History, Lawrence Ziring, Vangaurd, Lahore, karachi, Islamabad.

৩. The Trauma of Kashmir, The Untold Reality, Omkar Razdan, Oxford University Press, New York, Printed in Pakistan. New Sketch Graphics, Karachi, Published by Ameena Saiyid, Oxford University Press, Karachi, Pakistan.

www.pathagar.com

৪. The Myth OF INDEPENDENCE, Zulfikar Ali Bhutto, Oxford University Press, Lahore, Karachi, Dacca, 1949.
৫. Frenids Not Masters, Muhammad Ayub Khan, University Press Ltd, Dhaka, Bangladesh.
৬. অশান্ত কাশ্মীর, এস এম নজরুল ইসলাম, সম্পাদক, মাসিক- ইতিহাস, অন্বেষা।
৭. Front Line (India), K A K AND SHEIKH, A.G. Noorani, September, 10, 2010.
৮. Front Line, Jammu and Kashmir, First steps, A.G Noorani, September, 24, 2010.
৯. Holiday, Dhaka, September, 10, 2010.
১০. The New AGE, Dhaka, Dispute heats up again in Kashmir valley, Zeenat Khan, October, 19, 2010.
১১. দৈনিক গণশক্তি, কলকাতা, ৩০ অগাস্ট, ২০১০।
১২. 'দেশ' – কলকাতা, ২ অকটোবর, ২০১০।

লেখক-পরিচিতি : জনাব আজিজুল হক বান্না- বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট ।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি ২৭শে নভেম্বর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সেমিনার-প্রতিবেদন

মোশাররফ হোসেন খান

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য আন্তরিক হওয়া দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চরিত্র হওয়া উচিত। যার ভেতর দেশপ্রেম নেই, সে কখনো সুনাগরিক হতে পারে না। দেশপ্রেম একটি সীমাবদ্ধ বিষয় হলেও জন্মভূমির প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের ভেতর দেশপ্রেমকে আরও জাগ্রত করতে হবে, সেই সাথে প্রতিটি নাগরিককেই স্বাধীনতার হেফাজতকারী হিসাবে প্রমাণ রাখতে হবে। এর জন্য আমাদের ক্রমশ তৈরি হতে হবে।

www.pathagar.com

গত ৯ই জানুয়ারী, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতি বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মূঈনুদ্দীন, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, অধ্যক্ষ তাওহীদ হুসাইন, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ বলেন,

দেশপ্রেম একটি আপেক্ষিক বিষয় হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। মহান রবের অধীনতা স্বীকার করেই আমাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। যদিও বাংলাদেশ কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নয়, তবুও এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা প্রচুর। এজন্য আমাদের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করা জরুরি। আর এর জন্য যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করার মত মানসিকতা আমাদের থাকা প্রয়োজন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন,

একজন যেটাকে দেশপ্রেম বলে মনে করে, হয়তো অন্য কেউ সেটাকে দেশদ্রোহ বলে বিবেচনা করে। বহি:প্রকাশে পার্থক্য থাকতেই পারে। তবে দেশপ্রেম ও দেশের হেফাজত হতে হবে বিশ্বাসের মাপকাঠিতে। রাসূলের [সা] ইসলামী বাহিনীকে সহায়তা করেছেন বহুদেশের নাগরিক। মদীনার আনসার ও মুহাজিররা মিলে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কারণ সেখানে যুদ্ধের

www.pathagar.com

প্রয়োজন ছিল। এটা হয়। আমাদের উচিত নিজের দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা এবং এর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

প্রফেসর ড.এম. উমার আলী বলেন,

দেশপ্রেমের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য, রাষ্ট্র ও দেশপ্রেম, দেশপ্রেমের পরিমাপ, দেশপ্রেমের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি, বাংলাদেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত থাকা প্রয়োজন। স্বাধীনতার হিফাজতের জন্য আমাদের কিছু করণীয়ও আছে। কোন ব্যক্তি বা পক্ষের দেশপ্রেম বিচার করার জন্য যে মাপকাঠি তা একমাত্র তার ঈমানের মাপকাঠী দ্বারা পরিগণিত হওয়া উচিত। অন্যের দেশপ্রেম, স্বাধীনতা হেফাজতের চেতনায় মূল্যায়ন করতে গেলে হিসাবে গরমিল হবেই। তিতুমীর ও সূর্যসেনের কিংবা ক্ষুদিরামের দেশপ্রেম একটি অপরটির মাপকাঠিতে তুলনা করা যাবে না। যারা ক্ষুদিরামের দেশপ্রেমিকতার জয়গান গায় তারা তিতুমীরদের ইসলামী জঙ্গী হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। এটা অত্যন্ত দু:খজনক বিষয়।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন,

দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশের সঠিক ইতহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। পত্রিকা ও মিডিয়া শক্তিকে জোরদার করা, দুর্নীতি মুক্ত-সমাজ গঠন, পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে অর্থ ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষা ও দীনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশপ্রেমের নজির স্থাপন করতে হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির বলেন,

একটি পরিশ্রমী প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইসলামই দেশ ও স্বাধীনতার হেফাজতের গ্যারান্টি। আজকের বিশ্বে প্রধান-অপ্রধান সকল ইজম ও ধর্ম ও অনুসারীদের বিশ্লেষণে সন্দেহাতীতভাবে ইসলামই একমাত্র আন্তর্জাতিক জীবন বিধান হিসাবে অণুসৃত ও স্বীকৃত, কাফির-মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন। ইসলাম বিস্তৃত মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত। প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যে। ইউরোপ হতে

www.pathagar.com

আমেরিকা সর্বত্র। আর ইসলাম মানুষকে তার সম্মান-মর্যাদা দিয়ে সকল ধরনের দাসত্ব হতে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর বশ্যতা ও আনুগত্যে গড়ে তোলে বিধায় সব ধরনের মানুষের স্বাধীনতা ও সম্মান সুরক্ষা হয়। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত কেন? প্রশ্নটি জাগাই স্বাভাবিক। এর জবাবে বলতে হয় সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচাই হলো মূল কথা। নতুন প্রজন্মকে বাঁচতে দেয়ার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা, মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত থেকে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারার নিশ্চয়তা প্রদান, নিপীড়িত মানবতাকে উদ্ধার করাই ইসলামের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন,

জাতিসত্তার জন্য দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি জাতি দেশপ্রেম ছাড়া এবং স্বকীয় স্বাধীনতার চেতনা ও বোধ ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাহীন জাতিকে জীবিত বলা যায় না, বলতে হয় মৃত। একইভাবে যারা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত–তারা অবধারিতভাবে দুর্ভাগা। লেখক বাংলাদেশের অভিন্নতাকে সামনে এনে মূলত আমাদের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার সমস্যা ও কর্তব্যকে চিহ্নিত করেছেন–দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার শত্রু ও মিত্রকেও ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি সমসাময়িক ও চিন্তামূলক। পাঠকদেরকে প্রবন্ধটি আগ্রহী করবে বলে আশা করি।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন,

দেশপ্রেম মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। রাসূল [সা] আপন দেশকে খুব ভালোবাসতেন। তারপরও তাঁকে মদীনায় হিজরত করতে হলো। সেখানে রাষ্ট্র গঠনের পর তাঁকে চুক্তিও করতে হলো। যে চুক্তির আওতায় সকল ধর্মের লোকেরা ছিল। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খন্দকের যুদ্ধও দেশ রক্ষার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। দেশের সমৃদ্ধি অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত নাগরিকের। বর্তমান সময়ে আমাদের সেটাই প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন,

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন কর্তৃক রচিত ও উপস্থাপিত "দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত" শীর্ষক প্রবন্ধটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সুখপাঠ্য হয়েছে। অনেক তথ্যবহুল বিষয় সুচিন্তিতভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন। 'বাংলাদেশে দেশপ্রেম : ও স্বাধীনতার হেফাজত' এই শিরোনামে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। কেননা এটিই এই প্রবন্ধের মূল টার্গেট। বাংলাদেশের সমবয়সী আমরা যারা এবং আমাদেরও পরের প্রজন্মের কাছে এ তথ্যগুলো অজানা ছিল। তাই এগুলো পরিকল্পিত উপায়ে এপ্রজন্মকে জানানোর ব্যবস্থা করা উচিত। প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকুকে তাই কয়েকটি Sub Heading এর আওতায় আলোচনা-পৃষ্ঠা নাম্বার সহ তথ্যসূত্র দিলে তা প্রবন্ধের মানকে আরো বাড়াত বলে আমি মনে করি। মূলত দেশপ্রেম আমাদের জন্য একটি মৌলিক বিষয়।

জনাব মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম বলেন,

দেশপ্রেম মানব জীবনের অপরিহার্য একটি উপাদান। মাতৃভূমির উপকার ও কল্যাণের জন্য দায়িত্ববোধ, দেশের সামান্যতম অকল্যাণ দেখে হৃদয় ব্যথিত হওয়া, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য ভালবাসার প্রকাশ এসব মানবীয় গুণাবলীর নামই হচ্ছে দেশপ্রেম। যারা নিবেদিত চিত্তে মাতৃভূমিকে ভালবাসে এবং দেশ ও জনপদের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে প্রকৃতপক্ষে তারাই দেশপ্রেমিক। 'স্বদেশের তরে নেই যার মন/ কে বলে মানুষ তারে? পশু সে জন'। প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্মানবোধ থেকে। যে জাতির আত্মসম্মানবোধ যত প্রখর, সে জাতির দেশপ্রেম তত প্রবল। দেশপ্রেম একপ্রকার পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ। নি:স্বার্থ হিসাববিহীন দেশপ্রেমই-প্রকৃত স্বদেশপ্রেম। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র হীন স্বার্থের গণ্ডি উপেক্ষা করলে সমষ্টির স্বার্থ প্রাধান্য পায়, বৃহত্তর কল্যাণবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন জ্বলে ওঠে স্বদেশের প্রতি ভালবাসার শিখা। স্বাধীনতার ইসলামী স্বরূপ হচ্ছে মানুষ মানুষের গোলামী করবে না। আল্লাহর বন্দেগী করতে কোন বাধা থাকবে না। শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না, থাকবে না কোন অন্তরায়। ভুগবে না কোন নিরাপত্তাহীনতায়।

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ তাওহীদ হুসাইন বলেন,

বাংলাদেশে দেশপ্রেম অধ্যায়ে বর্তমান চিত্র আসা প্রয়োজন। অর্থাৎ–টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সরকারের ভূমিকা ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ, এশিয়ান হাইওয়ের নামে করিডোর প্রদান, সমুদ্র সীমায় তৈল, গ্যাস অনুসন্ধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতজানু পররাষ্ট্র নীতি এদেশের বর্তমান স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে যা প্রবন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার হিফাজত : কিছু করণীয় অধ্যায়ে সংযোজন করা প্রয়োজন। যেমন– দেশপ্রেমের চেতনায় আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলা এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তককে "দেশপ্রেম" সম্পর্কিত প্রবন্ধ স্থান দেয়া। জাতীয় ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন এমন বীরদের স্বীকৃতি দেয়া প্রভৃতি।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন,

দেশপ্রেম মূলত সভাবজাত, দেশপ্রেম মূলত জন্মগত অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত একটি আত্মিক স্পিরিট। যা মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলায়ই দান করেন। যার স্বীকৃতি জন্মগতভাবে নাগরিকত্ব লাভের মাধ্যমে মানব সমাজেও বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিরন্তন সম্পর্কযুক্ত এমন একটি আত্মিক বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টা পৃথিবী শুরু থেকে আজও অনেক দেশেই অব্যাহত আছে। যদিও একথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়; এর পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়। দেশপ্রেম সবার আছে, সবারই থাকবে কিন্তু কারোর চিন্তা-চেতনা, কর্ম ও গবেষণায় তা এক-এক ভাবে প্রতীয়মান হয়, এটা জ্ঞানের তারতম্যও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা এবং কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে দেখছি তার ওপর এর মাত্রা নির্ভর করে। কিন্তু তাই বলে দেশপ্রেম নেই এমন মানুষ জগতে একজনও খুঁজে পাওয়া ভার হবে একথা অত্যন্ত জোর দিয়েই বলা যায়। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের কথাও উল্লেখ করতে হয়। ■

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

■

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে হবে। সত্য উপলব্ধি করতে হবে এবং জাতির সামনে এর কুফল ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং সেক্যুলারিজম সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বিষয়। বলা যায় বিপরীত মেরুর। ইউরোপ-আমেরিকার কোথাও সেক্যুলারিজম নেই, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আছে। তারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ দুটো বিষয়কে একই মোড়কে ভরে এদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। বস্তুত মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষ হবার কোনো সুযোগই নেই–এই সত্যকে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলমানদের এখন বোধোদয় হওয়া উচিত। উচিত আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে যথাযথ ভূমিকা রাখা। আমাদের কর্তব্য হলো জাতিকে ইসলামের আলোকে জাগিয়ে তোলা।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে 'ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ব্যাংকার ও লেখক জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মাহফুজ পারভেজ, শেখ মোহাম্মাদ শোয়েব নাজির, হাফিজুল ইসলাম মিয়া, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ বলেন,

ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে মূলত ভালো কিছু নেই। এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ এবং ভয়াবহ। ঈসা [আ]-এর দীন আর আজকের খ্রীস্টানের ধর্ম এক নয়। এদুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রতিটি নবীর ওপর যে দীন প্রচারের দায়িত্ব এসছে, তাই কেবল সঠিক ছিল। ক্রমান্বয়ে তার বিকৃতি ঘটেছে। এখন ইসলামের মধ্যেও অনেক বিকৃতি প্রবেশ করেছে। ক্ষীণ কণ্ঠে নয়, বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই বিকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। প্রকৃত সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। দায়ী-ইলাল্লাহর ভূমিকা বলিষ্ঠভাবে পালন করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন,

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কি মুসলিমদের জন্য? তারা কি এটা মেনে নিয়েছে? আমার তো মনে হয় তারা তা মানেনি, মানে না। কিন্তু দু:খের বিষয় যে, এটাকে জোর করে মুসলিদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই মতবাদ থেকে মুসলিম বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য আমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম মিল্লাতকে ধর্মনিরপেক্ষতার কুহক থেকে মুক্ত করতে হবে। এই দায়িত্বটি আমাদেরই।

www.pathagar.com

ড.এম. উমার আলী বলেন,

সেক্যুলারিজম– নিউট্রালিজম নয় বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রচলিত ধর্ম পরিহার করে জাগতিক বা বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ফন্দিবাজদের উদ্ভাবিত একটি বিশেষ ধর্ম। উল্লেখ্য, ইসলাম তথাকথিত কোন ধর্মমাত্র নয় বরং আদ্দীন; মানবজাতীর জন্য আল্লাহ পাকের মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। বর্তমানে সেক্যুলারিজম অন্য কোন ধর্মের তেমন বিরোধী না হলেও ইসলামের বিরুদ্ধেই এই মতবাদকে গ্লোবাল রাজনীতি হিসাবে আগ্রাসনবাদীরা প্রয়োগ করতে চাচ্ছে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের গোড়ার কথা, ষড়যন্ত্রকারীদের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা, ঐ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আগ্রাসনবাদীদের মদদদানের কৌশল, পরিস্থিতি মুকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে যথার্থ ভূমিকা না গ্রহণ করে ইসলামিস্টদের মাঝে বিভাজন এবং পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, রাজনৈতিক পলুউশন সৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতার পারঙ্গমতার মুকাবিলায় ইসলামিস্টদের ঔদাসীন্য দু:খজনক। এক্ষেত্রে আমাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন,

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা, পরিচিতি এবং ইতিহাস তুলে ধরার জন্য প্রবন্ধকার যথাযথ চেষ্টা করেছেন। ইসলাম ও ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত আলোচনা প্রশংসনীয়। মুসলিম বিশ্বে ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্প্রসারের কতিপয় কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে:

ক) দীনের অপব্যাখ্যা।

খ) ইসলামের বিধানের পরিবর্তে রূহানী বিধানের সীকৃতি।

গ) হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার প্রয়াস।

ঘ) ওলামা ও ধর্মীয় নেতাদের বাড়াবাড়ি।

ঙ) আধ্যাত্মিকতাবাদ।

চ) মানুষের চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধির বিকাশের পথে বাধা বা অন্তরায় সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

ছ)সম্পদ উপার্জনের ও ব্যয়ের ব্যাপারে অযাচিত বিধি-নিষেধ আরোপ।

জ) রাজনৈতিক চর্চার বিরোধিতা।

ঝ) চিন্তা-ও গবেষণার পথে অন্তরায়।

ঞ) চার্চের একচ্ছত্র অধিকার প্রভৃতি।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন,

ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত নাস্তিক্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। নাস্তিক্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও সংশয়পূর্ণ করার ক্ষেত্রে অধিক মারাত্মক। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ খৃস্টান ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ একটি কুফরী মতবাদ। কারণ ইসলাম ভঙ্গ হওয়ার কারণে যে সব মুসলমান ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো: "একথা বিশ্বাস করা যে, রাসূল [সা] এর শাসন নীতির চেয়ে অন্য নীতি উত্তম এবং রাসূল [সা] এর উপস্থাপিত হিদায়াতের চেয়ে অন্য ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ।" সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এটা কতবড় কুফরী মতবাদ। এই কুফরী থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন,

মুসলিম দেশসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সারা বিশ্বে যত মুসলিম দেশ বিধর্মীদের নিয়ন্ত্রণে গেছে তার চেয়ে বেশী গেছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মুসলমানদের তুলনায় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ততা এবং পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য। কেউ কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মুনাফিক হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। মুখোশের মধ্যেই তাদের চিনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমান অবস্থার অনেক মিল রয়েছে। এখানেও মনগড়া বীর তৈরী ও পূজা চলে। ইসলামবিদ্বেষী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা চলে। ইসলামপন্থীদের ওপর অত্যাচার নিপীড়নের বহু নজির এখানে রয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের আরও বেশী সতর্ক হতে হবে। দেশ, জাতি ও মুসলিম মিল্লাতকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভয়াল ছোঁবল থেকে রক্ষা করতে হবে।

www.pathagar.com

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন,

দর্শন ও পদ্ধতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো কল্যাণ বয়ে এনেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না বরং সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি নীতিহীনতার পথ তৈরি করে দেয়। এ মতবাদ অপকার্য সাধনে অনুঘটকের কাজ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা যে কার্যকরী হয়নি, তার নিকট-প্রমাণ বাদশাহ আকবর। তার দীনে ইলাহি চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মোগল দরবারের হিন্দু-মুসলমান রাজন্যদের কেউ নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করেননি। ম্যধযুগের খ্রিস্ট জগতে চার্চ এবং গির্জার মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবর্তন করা হয়, সেটাও কার্যকর হয়নি। কারণ, ইংল্যান্ডের রোমান ক্যাথলিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্ট জগতে পোপ ও চার্চের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ যাজক ও পুরোহিতদের সামনে রেখে করা হয়। মার্কিনীরা তো তাদের অর্থ ডলারেই ঈশ্বরপ্রেমের নজির রেখেছে। অর্থাৎ কোনভাবেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ হয়নি, এ মতবাদ গ্রহণ করেনি। তাহলে এখন এ মতবাদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বাস্তবতায় ধর্মনিরপেক্ষতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং বাংলাদেশে এর অপ্রয়োজনীয়তা ও অকার্যকারীতা তুলে ধরা আজকের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন,

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' শিরোনাম হবার কারণে এ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণই এতে তুলে ধরা যায়। সে হিসাবে প্রবন্ধকার ও বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় সাধ্যমত পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে জীবনদর্শন হিসাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ সাড়া জাগিয়েছে তার একটি সমীক্ষণ বা দেশভিত্তিক case study প্রবন্ধে সংযোজন করা যেতে পারতো। সেই সাথে ঐ সকল দেশসমূহে তার

www.pathagar.com

ফলিতরূপের একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা হলে বিষয়-শিরোনামটির 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সুনিশ্চিত হতো। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম'– এ বিষয়ে একটি তথ্যবহুল গবেষণা প্রবন্ধের সার্থকতা পেয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মানব রচিত একটি মতবাদ। একজন বৃটিশ বুদ্ধিজীবী জর্জ জ্যাকব [Holyoake] হোলিওয়্যাক প্রথম একে হাজির করেন ১৮৪৬ সালে।

তার তিনটি নীতির বক্তব্য দাঁড়ায় এরকম–

ক) বস্তুই মানব জীবনের সবকিছু। আত্মিক উন্নতিও বস্তুনির্ভর।

খ) বিজ্ঞান মানুষের তাকদীর বা ভাগ্য নির্ধারক বা ভালমন্দের নিয়ামক। অন্যকথায় বিজ্ঞানই জীবন-মৃত্যুর মালিক।

গ) ভাল কাজ করা ভাল। ভাল কাজ করার অনুসন্ধানও ভাল। কিন্তু এই ভাল কাজের সংজ্ঞা যার যার মনে যা ভাল মনে হয় তাকে বুঝায়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কিংবদন্তী দেশ ভারতের এ সংক্রান্ত ethics এর বাস্তব চিত্র পেতে ভারতের আউটলুক পত্রিকার সাম্প্রতিক রিপোর্ট দেখা যেতে পারে। তাতে দেখা যাবে এ ধরনের ভালকাজে রাজনীতিক ও আমলারা কতটা ব্যস্ত! secularism এর পুরো বিষয়টি Church এবং State relation based. রাজনৈতিক আধিপত্য বা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের কারণে secularism, ইসলামকে চার্চের স্থানে বসিয়ে Shariah law এর স্থলে সিভিল 'ল-কে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্লান্তিহীন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত ধর্ম, বর্ণ , রক্ত, ভাষা ইত্যাদির নামে ইসলামে কোন DISCRIMINATION নেই। কিন্তু তাহলে মুসলিম বিশ্বে কিভাবে এ আদর্শ বিকশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হল?

বস্তুত এর পেছনে দুটো কারণ– ক) মুসলিম বিশ্বকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মধ্যে ইসলামের শ্বাশত রূপের জ্ঞান এবং তার প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাব। খ) রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণকে ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করতে, ইসলামী জীবনাচরণে উদ্বুদ্ধ করতে বা

www.pathagar.com

Motivate করতে অক্ষমতা। আল্লাহপাক তথাকথিত God নন। তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য নিয়োজিত করেছেন 'কিরামুন কাতিবীন' বা সম্মানিত লেখক [সূরা ইনফিতার ৮২১১, কাফ]। যারা মানুষের প্রতিটি কাজ ও কথাই লিপিবদ্ধ করছেন [কাফ] এবং অনুপরিমাণ কাজের হিসাব যিনি রাখেন এবং প্রতিদান দেবেন। ফামাইয়্যা'মাল মিসক্বালা...শাররাইয়ারাহ। স্মরণ রেখ, 'দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা' তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম দেশগুলোতে সেক্যুলারিজমের দিকে মানুষকে ডাকা মানে নাস্তিক্যতার দিকে মানুষকে ডাকা। ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার দিকে ডাকা বুঝায়। মুসলিম বিশ্বে যারাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে Secularism প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে সবার পরিণতির দিকে দৃষ্টি ফেরালে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে আল্লাহপাক এ বিষয়ে কতটা concern. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অপপ্রয়োগের কারণে এ মতবাদ গুণ্ডামীর মতবাদে পরিণত হয়েছে। এ মতবাদ ধোকাবাজ , মানবতাবিরোধী পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা আর প্রবৃত্তির উপাসকদের মতবাদ। এ মতবাদ দুর্নীতিবাজদের শেষ ভরসা বা আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। এ মতবাদ কার্যত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করার মতবাদ। এ মতবাদ মানুষকে তার খেয়াল খুশীর এতটাই দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে যে, মানুষ পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হয়। সুতরাং এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন,

'লাকুম দীনুকুম অলিয়াদীন'–'যার ধর্ম তার কাছে'–এটি সঠিক ও বাস্তব। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো কোন ধর্মই কারো কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বা কোন ধর্মই কারো জন্য বাধ্যতামূলক নয়। আর এখানেই হলো আল্লাহর আয়াতের অর্থের বিকৃতি। কেননা এ আয়াতে দীনকে বর্জন করার অনুমতি দেয়া হয়নি, বরং দীনকে আবশ্যিকরূপে গ্রহণ করারই জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি মারাত্মক অপপ্রচার। যেটা গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এর কুপ্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সেটা আমাদের বুঝতে হবে।

www.pathagar.com

জনাব মুহাম্মাদ হাফিজুল ইসলাম বলেন,

বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিজিত অবস্থায় মুসলিমদের করণীয় হলো :

* সত্যের সাক্ষ্য প্রদানে সকল মুসলিম জাহানকে উদ্বুদ্ধকরণ
  - বাস্তব সাক্ষ্য প্রদান।
  - মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান।
* ইসলামের বিজিত অবস্থায় সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকে।
  - সকল নাগরিক যার যার ধর্ম পালন করতে পারে।
  - ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এধরনের একটা সুবিধা ভোগ করে থাকে।
  - ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হল সুবিধাবাদী এক hypocratic ব্যবস্থা।
* ইসলামের সংজ্ঞা ও পরিচিতি হলো–
  - ইসলাম হল মানুষের বিশ্বাস, ইবাদাত, নৈতিকতা, কর্মবহুল জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম।
  - ইসলাম ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক বিষয়াদি, সামাজিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি নিয়ম-কানুন এবং আইন প্রণয়নে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।
* ইসলাম শুধু ধর্মই নয়; পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার বাস্তব সাক্ষ্য প্রদানে সফলতাই হল উদ্বুদ্ধকরণের উত্তম পন্থা। মুসলিম জাহানের দায়িত্ব হল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উত্তম যথাযথ প্রদান করা।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন,

Secularism-এর অনুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নয়–এ আলোচনা পৃথক শিরোনামের আওতায় আনা জরুরি। "সকল ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে।" –এটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূলনীতি নয়। পৃথক শিরোনামে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। খৃস্টবাদ নতুন কোন শরীআহ আনেনি। এটি ছিল মূসা [আ]-এর শরীয়তের ধারাবাহিকতা। খৃস্টবাদের সাথে ইসলামের সরলীকরণের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আমদানি করা হয়। ধর্ম নিয়ে খৃস্টিয় পশ্চিম ও

www.pathagar.com

ইসলামী প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা এক নয়। ইসলামী প্রাচ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের যৌথ নিষ্পেষণের নজির নেই। কুরআনের বিধান মেনে চলার প্রতি মানুষকে আন্তরিক করে তুলতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন,

যারা ইসলামকে সমাজে ঢুকতে দিতে চায় না তারা কয়েকটি বিষয়কে জায়েয করে নিয়েছে। যেমন তাদের কাছে–
জাল ভোট দেয়া জায়েয, ঘুষ, সুদ বৈধ, ফাঁকিবাজি, অফিস ফাঁকি বৈধ ইত্যাদি। ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে আমাদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন,

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দুটি দুইধারার বিষয়। ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন সম্পর্ক নেই, থাকতেও পারে না। কেননা ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা ধর্মকে শুধু কয়েকটি বিষয়সর্বস্ব ধর্ম মনে করে। নিরপেক্ষবাদীরা মানুষকে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হতে দেয় না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মহান স্রষ্টা এবং মৃত্যুর পর স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়াকে সমর্থন করে না। এরা মানুষকে পরকালে আল্লাহর আদালতে একত্রিত হওয়া এবং সেখানে জবাবদিহিতাকে সমর্থন করে না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কখনো মানুষকে কোন ধর্মের
অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা মানুষকে কোন ধর্মে বিশ্বাসী হতে দেয় না। মূলত এশ্রেণীকে লোকজন বা ব্যক্তিরা মানুষকে খাও দাও ফূর্তি কর যা ইচ্ছা তাই কর–এ মতবাদে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং নিঃসন্দেহেই বলা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ। আর কুফরী মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারাই কাফির। তাদের ব্যাপারেই রয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির ঘোষণা। সুতরাং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দীন–ইসলাম, ইসলামের অনুসারী মুসলিম জাতির ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার তো কোন সুযোগই নেই। ■

www.pathagar.com

ইসলামে নারীর মর্যাদা

■

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, ইসলামই নারীকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছে। তাদের প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে কেবল ইসলাম। পাশ্চাত্য নারীকে কোনো মর্যাদা দেয়নি, শোনায়নি কোনো মুক্তির বারতা। বরং তাদের অমর্যাদা করছে প্রতিটি পদক্ষেপে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা নারীকে করেছে শৃঙ্খলমুক্ত। কিন্তু দু:খের বিষয় যে, ইসলামের এই সুন্দরতম দিকটি তেমন কোনো প্রচার পায়নি। আমরাই ইসলামের দিকগুলো তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। যার কারণে ইসলামী বিধি-বিধানগুলো আজ নানা অপপ্রচারের শিকার। বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। সকল অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরতে হবে।

গত ২০শে মার্চ, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ইসলামে নারীর মর্যাদা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ জনাব খোন্দকার রোকনুজ্জামান।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ লোকমান, ড. মাহফুজ পারভেজ, ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ বলেন,

ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন পুরুষের চেয়ে নারীদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন অনেক বেশী। যেমন জীবিকা উপার্জনের কঠিনতম দায়িত্ব এবং সংগ্রাম কেবলমাত্র পুরুষের ওপরই অর্পিত। এমনি অনেক উদাহরণ পেশ করা যায়। কিন্তু আজকের সমাজে নারীরা তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন না থাকার কারণে তারা নিগৃহিত হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। যে পাশ্চাত্য মিথ্যার ছলে আমাদের নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে আনছে, সেই পাশ্চাত্য সমাজেও নারীর কোনো মর্যাদা নেই। সেখানে তারাই সবচেয়ে বেশী অধিকারহীন এবং লাঞ্ছিত। ইসলামবিমুখ নারীরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত, অধ:পতিত এবং আত্মমর্যাদাহীন–এই সত্যকে জোরালোভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। নারীকেও ইসলামপ্রদত্ত মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত করা জরুরি। তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা অনেকাংশে কমে আসবে বলে মনে করি।

ড. এম.উমার আলী বলেন,

পর্দা নারীর সম্ভ্রম, অন্যদের জন্য বিনোদনের পণ্য না হওয়ার নিয়ামক, সামাজিক সুস্থতা ও শৃঙ্খলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নারীর যথাযথ মর্যাদা রক্ষার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় নিয়ম, যা কুরআন ফরয করেছে। যৌন কেলেংকারী ও নানাবিধ মরণব্যাধি থেকে সমাজকে সুরক্ষার জন্য পর্দাপ্রথা

www.pathagar.com

পরীক্ষিতভাবে কল্যাণকর। আধুনিকতার দাবী সর্বক্ষেত্রে সমান হবে এটা সঠিক নয়। মাতৃত্ব, শান্তি সমন্বয় সাধনে নারীর মূল্যায়ন বেশী, উপার্জন, নেতৃত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষের দায়িত্ব বেশী। এটাই স্বাভাবিক। সম্পত্তিতে মহিলাদের উত্তরাধিকার ইসলামই প্রথম নির্ধারণ করেছে। ইসলামই তাদের সার্বিক মুক্তির দিশা দিয়েছে। এই বিষয়গুলো তাদেরকে বেশী অবহিত করা প্রয়োজন।

ড. মুহাম্মাদ লোকমান বলেন,

ইসলাম নারীদের প্রতি অনেক বেশী মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এগুলো জানার ও মানার কোন ব্যবস্থা নেই সমাজে। আমার মনে পড়ে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ১৯৬১-১৯৬৫ তথা ষাটের দশকে, তখন এ দেশে বেপর্দা ও বেহায়য়াপনা তেমন একটা চোখে পড়তো না। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও বিবিধ অধিকার যেভাবে দেয়া হয়েছে তা যদি আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারি এবং এর আলোকে আমরা নারীসমাজকে তৈরী করতে পারি তাহলে আমরাই সত্যিকার সভ্যতা গড়তে পারবো এবং সারা দুনিয়ার জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারবো ইনশাল্লাহ।

ড.হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন,

নারীদের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদেরও। তারা যদি তাদের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়, তাহলে জাতির চেহারাই বদলে যেতে পারে। পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করার মধ্যে কেবল জিল্লতি ছাড়া আর কিছুই নেই। নারীদেরকে ইসলামের কাছে ফিরে আসতে হবে তাদের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন,

বিভিন্ন সভ্যতা ও সমাজে নারীর অবস্থা কেমন, তা বর্ণনার খুব বেশী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এগুলো অনেক প্রাচীন। বর্তমান সময়ের মানুষ এটাকে সেভাবে মূল্যায়ন করে না। বর্তমান সভ্যতায় নারী কিভাবে বঞ্চিত তা হাইলাইট হওয়া প্রয়োজন। নারীদের যে মর্যাদা ইসলামে আছে মুসলিম-নারী পুরুষকে এবং আমাদের সামাজকেই সে address করা অপরিহার্য। বর্তমান সমাজে যে নারী তার মর্যাদা পাচ্ছেনা এটা অনেকাংশে সত্য। তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মোহরানা, সম্পদ, যৌতুক, স্ত্রীর প্রতি আচরণ, শিক্ষা ইত্যাদি যে

www.pathagar.com

সব অব্যবস্থা সমাজে চালু আছে তা সংশোধন করা হলে অনেক অভিযোগ এমনিতেই কমে যাবে।

ড. মুহাম্মাদ কোরবান আলী বলেন,

সমঅধিকারের শ্লোগান দিয়ে একটি শ্রেণী নারীকে যথেচ্ছ ব্যবহারের চেষ্টা করছে, এর বিপরীতে নারীর মাঝে ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করতে হবে। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তার প্রচার-প্রসার জোরদার করতে হবে। তাদের সামনে ভুল ও সত্যকে তুলে ধরতে হবে। তাহলেই সমাজে শৃংখলা ফিরে আসতে পারে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন,

পশ্চিমাদের বিশ্ব নারী দিবসের শতবর্ষ পালনের সময়ও বিশ্বব্যাপী একটি ঐতিহাসিক সত্য অন্তরালে থেকে গেছে, তাহলো আইয়ামের জাহিলিয়াতের অবসান ঘটিয়ে ইসলামের নেতৃত্বে মানব ও নারীর মুক্তির প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ইসলামকে বাদ দিলে মানব ও নারী মুক্তির কোনো উজ্জ্বল উদাহরণ দেখা যায় না। কারণ প্রাচীন সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্মে নারী ক্রমাগত শোষিত হয়েছে–প্রবন্ধকার সে সকল কথা সংক্ষেপে তথ্যপূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন। ইসলামে নারীর মর্যাদা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা, পারিবারিক মর্যাদা, নারীর সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক মর্যাদা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রাথমিক আরো অনেক বিষয় যেমন উত্তরাধিকার, সাক্ষ্য, নেতৃত্বসহ বহু বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। বস্তুত প্রবন্ধটি তাত্ত্বিক। তত্ত্বগত কাঠামোতে নারীর কি ব্যাপক ও বিস্তৃত মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে সেটা তুলে ধরাই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বলে আমার মনে হয়েছে। এবং যে সকল ক্ষেত্রে নারীকে ইসলামে মর্যাদা বা অধিকার দেওয়া হয়নি বলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ভোগবাদী এবং পশ্চিমা অভিযোগ করেন, সে সম্পর্কেও প্রবন্ধকার ইসলামের অবস্থানকে সপ্রমাণিত করেছেন। যেমন মর্যাদা, নেতৃত্ব, কর্ম পরিধি ইত্যাদি। অধ্যাপক খোন্দকার রোকুনজ্জামানের প্রবন্ধ ইসলামে নারীর মর্যাদা বিস্তারিত একটি ধারণা দেবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশাপাশি পশ্চিমা সমাজে নারীর অবস্থান ও নিপীড়িত অবস্থানের তথ্যও এসেছে।

www.pathagar.com

মূলত অতীত ও বর্তমানের সমীকরণে ইসলামই যে নারী অধিকার ও মর্যাদার একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান উপস্থাপন করেছে মানব সভ্যতার সামনে এ কথাগুলো ভালোভাবেই এসেছে।

ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন,

অত্যন্ত তথ্যবহুল ও দলীল প্রমাণ ভিত্তিদক সুখপাঠ্য একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান। যে মুহূর্তে আমাদের দেশে আল-কুরআনের কিছু বিধানকে বদলিয়ে দিয়ে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চাচ্ছে, ঠিক তখনই বিআইইসির উদ্যোগে আজকের সেমিনার ও আলোচ্য প্রবন্ধটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন,

এই প্রবন্ধটি নারীর সম্মান সমুন্নত রাখতে দিক নির্দেশনা ও পথ প্রদর্শন করবে। আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে ইসলাম নারীর মর্যাদা তথা অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্যি বলতে ইসলাম নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ফলে নারীদেরকে আজ দুষ্ট লোকেরা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারছে না বলেই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নারীদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাদেরকে ইসলাম কর্তৃক ঘোষিত মর্যাদার আসন থেকে বের করে এনে তাদের কুমতলব পূর্ণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের কথায় যারা নাচছে আজকের সেই সকল নারীরা মহান স্রষ্টা কর্তৃক দেয় যে মর্যাদার আসন তা অজ্ঞতাবশত দূরে ঠেলে দিয়ে রঙময় দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে–যা দু:খজনক এবং নারী জাতির নারীত্ব সংরক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীতও বটে। আজকের নারীরা আদর্শিক জ্ঞান অর্জন করে কুরআনভিত্তিক মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হবে-এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি। ■

www.pathagar.com

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার অবসান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ

■

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** ১৭৫৭ সাল নিয়ে বর্তমানেও নানা বিতর্ক সৃষ্টি করে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী। তারা অপপ্রচার চালায় বিষয়টি নিয়ে। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে পলাশীর যুদ্ধ এবং এর করুণ পরিণতি মুসলিম জাতির জন্য একটি শিক্ষণীয় অধ্যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে কি কি কারণে পরাজয় ত্বরান্বিত করেছিল–সেটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। দু:খের বিষয়-নবাব সিরাজকে যেভাবে সামনে আনা উচিত ছিল, তা কখনই হয়নি। তাকে প্রকৃত অর্থে চেনা প্রয়োজন যে তিনি কতটা ত্যাগী এবং দেশ ও জাতির প্রতি দরদী ছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের সাথে বর্তমানের প্রেক্ষাপটের বহু মিল রয়েছে। সেসব সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এদেশ আমাদের। সুতরাং আমাদেরকেই এদেশের সার্বিক মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। গত ২৪শে এপ্রিল, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত

www.pathagar.com

সেমিনারে '১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার অবসান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. মাহফুজ পারভেজ।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মাদ কুরবান আলী, ড. এম. উমার আলী, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদীন, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, আহসান হাবীব ইমরোজ, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পদক অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ বলেন,

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইংরেজ কোম্পানী ছিল বহুমুখী ষড়যন্ত্রকারী। আর তাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল মূলত হিন্দুরাই। নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্ষমতায় আসীন হবার তিনি সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে নবাবের পরিচিতি সেইভাবে আমরা তুলে ধরতে পারিনি। ফলে একটি কুচক্রী মহল নবাবের চরিত্রে কালিমা লাগাতে পারছে সহজেই। আমাদের সত্যানুসন্ধী হতে হবে। পলাশীর যুদ্ধকে ছোট করে না দেখে বরং আমাদের অস্তিত্বের অংশ হিসাবে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান আমরা ও আমাদের দেশ-জাতি নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। হিন্দু এবং ইহুদীদের সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রের শিকার আমরা। এই ষড়যন্ত্র মুকাবিলা করা যদিও সহজ কাজ নয়, তবুও আমাদের থেমে গেলে চলবে না। বরং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে আমাদের সামনে এগুতে হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন,

নবাবদের শান-শওকাত এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন স্বাভাবিক কারণেই তাদের বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত করে তোলে বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা থাকা সত্ত্বেও ব্যতিক্রমী নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ। নবাব সিরাজের প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে। সিরাজের চারপাশে ছিল তার সেনাপতি মীরজাফর, ফাইনান্স গভর্নর জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ এবং নিকটাত্মীয়রা যাদের ষড়যন্ত্র নবাব আঁচ করতে

www.pathagar.com

পারেননি। বর্তমানের অবস্থাও আমরা একটু মিলিয়ে দেখতে পারি। ভারতের সাথে বিরোধিতা কিংবা হিন্দু ধর্মের সাথে আমাদের শত্রুতা থাকার কথা নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় যে শাষকবর্গ ভারতের হিন্দু অধ্যুষিত ঝাড়খন্দ, রাঁচি, ছত্রিশগড় উড়িষ্যা, কাশ্মির ও দাক্ষিণাত্যের নিম্নবর্ণের হিন্দু হরিজনদের সাথে কি অমানবিক আচরণ করছে! তারা নেপাল, ভুটান, শ্রিলংকার হিন্দুদের সাথেও বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলে না। নবাব সিরাজদ্দৌলার রাষ্ট্র পরিচালনার যৌগ্যতা এবং সেই সময়কার ইতিহাস আজ মুছে ফেলা হচ্ছে। এখন দরকার সত্যিকার ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরা। বিকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করা একান্ত জরুরি।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন,

লর্ড ক্লাইভকে মীর জাফর ১২ দফা চুক্তি বা দাশখত দিয়েছিল। সেগুলোর হলো−

১. নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে সম্পাদিত সন্ধিপত্রে শর্ত পালন করতে বাধ্য থাকবো।

২. দেশীয় বা ইউরোপীয় যে কেউ ইংরেজদের শত্রু হলে আমরাও শত্রু।

৩. বাংলা বিহার উড়িষ্যার মধ্যে ফরাসীদের যে সমস্ত কুঠি ধন সম্পদ আছে সবই ইংরেজদের অধিকারে আসবে। ফরাসীদের এদেশে বসবাস করতে দেব না।

৪. সিরাজউদ্দৌলার কোলকাতা অধিকারের সময় কোম্পানীর যে ক্ষতি হয়েছে এবং সৈন্যদের নিয়েও যে ব্যয় বহন করতে হয়েছে তা পূরণ করার জন্য ইংরেজদের ১কোটি টাকা দেব।

৫. কোলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৬০ লক্ষ টাকা দেব।

৬. দেশীয় অভিজাত হিন্দুদের ক্ষতি পূরণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেব।

৭. আর্মেনিয়দের ক্ষতিপূরণের জন্য ৭ লাখ টাকা দেব। ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যে কাকে কত টাকা দিতে হবে ক্লাইভ ও অন্যান্য বিচারকগণ স্থির করে দেবেন প্রভৃতি। বস্তুত ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ইতিহাসের একটি টার্নিং পয়েন্ট।

www.pathagar.com

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন,

ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাটের শাসনামলে বাংলাদেশ একটি সুবা বা প্রদেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। বাংলার প্রথম নবাব ছিলেন মুর্শিদ কুলি খাঁ। ১৭২৭ সালে তার জামাতা সুজাউদ্দিন নবাব হন। ১৭৩৯ সালে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে বসেন। নবাবের কথায় আসি।

পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে যা ঘটেছিল–

১. ক্লাইভ শর্ত ভংগ করে চন্দন নগর অধিকার করেন।

২. সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করেন। নবাবের বিশ্বাসী এবং দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন।

৩. মীর জাফর আলী খান, জগৎশেঠ রাজা রাজবল্লভ উমিচাঁদ নামক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী প্রধান যুক্ত ছিলেন।

৪. নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য জগৎ শেঠের বাড়ীতে গোপন এক সভার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজদের দূত মিঃ ওয়াচ স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে পালকীতে করে সেই গোপনী আলোচনা সভায় উপস্থিত হন।

৫. ২৩ জুন ১৭৫৭ সাল। পলাশীর আমবাগান। ক্লাইভ ও তার সৈন্য সামন্ত প্রস্তুতি নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হন।

৬. বেলা এগারোটা পর্যন্ত উভয় পক্ষই এক নাগাড়ে কামান দেগে চললেন। কিন্তু কোন পক্ষেরই হারজিত হল না। হঠাৎ করে বৃষ্টি নামল। আধ ঘন্টা ধরে অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত মাঠটা কাদায় কাদায় একাকার হল। বৃষ্টি থামার পর ইংরেজরা আবার গোলা নিক্ষেপ শুরু করল। কিন্তু নবাবের দিক থেকে কোনো প্রত্যুত্তর নেই।

৭. নবাবের দিকের বারুদের গাড়ীর ওপর কোন ঢাকনা ছিলনা। ইংরেজদের বারুদের গাড়ী ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ছিল। ফলে তাদের কোন ক্ষতিই হয়নি।

৮. আম বাগানের ডানদিকে সৈন্য নিয়ে মীর জাফর, রায় দুর্লভ আর ইয়ার লুৎফে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন। কোন ভূমিকা নেই।

৯. মীর মদনের মৃত্যুতে নবাব ভেঙ্গে পড়লেন। মীর জাফরকে

www.pathagar.com

ডেকে এনে নিজের পাগড়ীটা খুলে তার কাছে কাকুতি-মিনতি করে বললেন, এখন আমার সবই আপনার হাতে। আপনিই রাখতে পারেন, মারলে আপনিই মারতে পারেন।

১০. বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে শপথ করলেন যে তিনি নবাবকে রক্ষা করবেন। সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ রাখতে অনুরোধ করলেন। সৈন্যরা ছাউনিতে ফিরে গেল।

১১. বীর সেনাপতি মোহনলাল মীর জাফরের উপদেশ মত লড়াই বন্ধ করলেন না। তিনি বললেন, এই মুহূর্তে যদি লড়াই বন্ধ হয় তবে তো ঐখানেই যুদ্ধ খতম। আগামীকাল আর কিছুই করা সম্ভব হবে না।

১২. নবাবের সৈন্যদের ছাউনির দিকে ফিরতে দেখে ক্লাইভের সাহস বেড়ে গেল। যুদ্ধ পুনরায় শুরু হল। নেতৃত্বহীন যুদ্ধে ফরাসীরা রণে ভঙ্গ দিল। নবাবের সৈন্যরা ক্লাইভের কামানের গোলার বিপরীতে গাদা বন্ধুক দিয়ে জবাব দিতে লাগলেন।

১৩. বিকেল চারটার দিকে ইংরেজদের আরো কাছে এগিয়ে আসতে দেখে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সৈন্যরা বিশৃংখল হয়ে গেল। ক্লাইভ দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নবাবের সৈন্যরা পালাতে শুরু করল। ক্লাইভ এসে নবাবের শূন্য ছাউনি দখল করে নিল।

১৪. বিকেল পাঁচটার মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ শেষ। বিজয়ী কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ এবার রাজধানীর দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

১৫. নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজের জীবন তুচ্ছ করে দেশ এবং স্বাধীনতা রক্ষার করার জন্যই জনশূন্য রাজধানী হতে পলায়ন করছিলেন। পাটনা পৌঁছে ফরাসী সৈন্যদল এবং প্রভুভক্ত রাজা রাম নারায়ণের কাছে পৌঁছে তার সহায়তায় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। পলাশীর ট্রাজেডী ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকলো। মূলত পলাশীর যুদ্ধ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। ইতিহাসের পাঠ গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

www.pathagar.com

ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন,

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার সাধীনতার অবসান ছিল একটি দু:খজনক অধ্যায়। আমি মনে করি–চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকদের জন্য পলাশীর যুদ্ধে রয়েছে চিন্তার খোরাক। সিদ্ধান্তহীনতায় আচ্ছন্ন দেশপ্রেমকিদের জন্য এতে রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থার সাথে এই ঐতিহাসিক ঘটনার যে অবিশ্বাস্য মিল রয়েছে এ প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় কি হতে পারে, সেই বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন,

১৭৫৭ সাল বাংলার স্বাধীনতা অবসানের সাল। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাকে মেনে নিতে হয়েছে প্রায় দু'শ বছরের গোলামীর জিঞ্জির, খোয়াতে হয়েছে আমাদের স্বাধীন ভূমি, মেনে নিতে হয়েছে পরাজয়ের গ্লানি, অন্যদের সংস্কৃতি। যার খেসারত দিতে হচ্ছে আজও। আর তারই সূত্র ধরে প্রায় আড়াইশ বছর অতীত হলেও আমরা সেই সময়ের মীর জাফরদের আনাগোনা আজও বাংলার বুকে প্রত্যক্ষ করছি। মূলত ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্র কাননে যা ঘটেছিল তাকে আমি অবশ্য যুদ্ধ বলতে নারাজ। কেননা একটু ভালভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেদিন পলাশীতে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছিলো যুদ্ধের নামে বিশ্বাস ঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রের মহড়া। আর তারই পথ ধরে বাংলাকে পরিণত করা হয়েছিল অন্যদের হুকুমের তাবেদার রাষ্ট্র, তারপর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ দৃশ্যত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বললেও আমরা তেই স্বাধীনতাকেই খুঁজছি। তাইতো আজ প্রয়োজন বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের চিহ্নিত করণ, তাদের মুখোশ উন্মচন, তাদের প্রতিরোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করণ। কারণ সবাই, বিশেষ করে সত্যের সেনানীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে তবেই আমরা হয়তো শত্রুমুক্ত বাংলাদেশ ফিরে পাব, ফিরে পাবো আমাদের সেই অতীত ঐতিহ্য। ■

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যবস্থাপনা

■

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** মহান রাব্বুল আলামীনই মহা ব্যবস্থাপক এবং নিয়ন্ত্রক। আমরাসহ সকল কিছু তাঁরই অধীনস্থ। মহান রব আদমকে [আ] সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনা শিক্ষা দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সুতরাং খিলাফত থেকেই ব্যবস্থাপনার শুরু। ইসলামের কনসেপ্ট হলো ফেইথ বা বিশ্বাস। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি বিরাজ করবে এবং তারই আলোকে সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর নির্দেশিত পথে এগিয়ে নেবে–এটাই মৌলিক ব্যবস্থাপনার স্বরূপ। মানুষের ওপর আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন যে, মানুষ সত্যনিষ্ঠ হয়ে একাগ্রতার সাথে সে তার দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক আমাদের মধ্যে যদি ভ্রাতৃসম্পর্ক বিরাজ করে তাহলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। এরজন্য প্রয়োজন আমাদের মাঝে ইনসাফ, সুবিচার, বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও বেশী জাগরুক করা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর গোটা মহা ব্যবস্থাপনাকে বুঝে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা। ইসলামী ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য আমাদের সম্যকভাবে বুঝতে হবে।

গত ২৮শে আগস্ট, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনার সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "ইসলামী ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন,

ইসলামী ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামের নির্দেশিত নিয়মে সকল কিছু পরিচালনা করা। সকল ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে এবং চলবে একমাত্র ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে এবং তারই নীতিমালা ও দর্শনের আলোকে সকল কিছু পরিচালিত হবে। এর মধ্যে সহজ আর দ্বিতীয় কোনো পথ খোঁজার অবকাশ নেই।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন,

ইসলামী ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা একটি পরীক্ষিত বিষয়ও বটে। রাসূল [সা]-এর যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনা চালু ছিল। ফলে তখন সমাজ ও রাষ্ট্র সকল দিক থেকেই উপকৃত হয়েছে। আজ ইসলামী ব্যবস্থাপনা চালু না থাকার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্র ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আর এতে করে নেমে আসছে জনদুর্ভোগ। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরি।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন,

সূরা আল বাকারার ১৭৭ নং আয়াতটি প্রনিধান যোগ্য। এতে বলা হয়েছে, "তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে না পশ্চিম দিকে তা প্রকৃত কোনও পুণ্যের কাজ নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ হচ্ছে এই যে

www.pathagar.com

মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে। আর আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধনসম্পদকে আত্মীয় স্বজন ইয়াতিম, মিসকীন, নিঃস্ব, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও কৃতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এরাই মুত্তাকী।" এই আয়াতের বর্ণনায় ইসলামের নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের একটা সারাংশ পাওয়া যায়। মানব জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এই মূল্যবোধগুলো দিক নির্দেশনা দিতে পারে। এখানে আচার আচারণ এবং লেনদেনের নীতি বৈশিষ্ট্য কি হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াই হচ্ছে এই নীতি বৈশিষ্ট্যগুলো কার্যকর করার প্রধান ক্ষেত্র। সুরা আল আনআমের ১৫২ নং আয়াতে ইসলাম ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দিক দর্শন দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থানার দ্বারাই আমাদেরকে দেশ ও সমাজ পরিচালনা করতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন,

ব্যবস্থাপনা এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা প্রতিটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানেই পরিব্যাপ্ত। একটি দেশের প্রধান ব্যক্তি থেকে শুরু করে একজন সাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মপ্রবাহে সুন্দর ব্যবস্থাপনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপনা মানবেতিহাসের মত পুরানো। 'ইসলামী ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি সুন্দর, সাবলীল ও চমৎকার হয়েছে। তবে এতে আরো কিছু বিষয় আনা দরকার। যেমন ইসলামী ব্যবস্থাপনার ওপর ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞা, মহানবী [সা]-এর পেশকৃত ব্যবস্থাপনার ধরণ ও মডেল, ইসলামী ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিমালা, ইসলামী ব্যবস্থাপনার বিশেষ নীতিমালা, ইসলামী ব্যবস্থাপনার কৌশল, ইসলামী দৃষ্টিকোণ, বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি আমাদের সামনে পরিষ্কার থাকলে ইসলামী ব্যবস্থাপনার কাঙ্ক্ষিতভাবধারা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হবে বলে মনে করি।

ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন,

প্রবন্ধে বিষয়বস্তুকে সাবলীলভাবে সাজানো হয়েছে, তবে ইসলামী

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য আরো পরিষ্কারভাবে আলোচনা হলে ভাল হত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর [সা] সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাপনা আলোচনা করলে ভাল হত। যেমন যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদিতেও রাসূলের সুস্পষ্ট ব্যবস্থাপনা নীতি কি ছিল ইত্যাদি। সার্বিকভাবে প্রবন্ধটি বাস্তবসম্মত এবং সুলিখিত হয়েছে।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন,

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা একটা সুমার্জিত পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনা। এটা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চালু থাকলে আমরা তার সুফল ভোগ করতে পারতাম। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জন্য এটিই একমাত্র মুক্তির পথ।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন,

ইসলামী ব্যবস্থাপনা মূলত মানুষের মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন। যতদিন সেই ব্যবস্থাপনা চালু না হবে, ততোদিন পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রে কোনোপ্রকার কল্যাণ সাধিত হবে না। শান্তি ও মুক্তির প্রত্যাশা করা তো বাতুলতাই মাত্র। অতএব ইসলামী ব্যবস্থাপনা সমাজে ও রাষ্ট্রে কিভাবে চালু করা যায় সেই বিষয়ে এখন ভাবতে হবে। ■

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধানের উপায়

■

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেছেন,** মিস হ্যাণ্ডেলিং-এর কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার আজও কোনো সঠিক সমাধান হয়নি। এটাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাংলাদেশে যখন যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছেন, তারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির মীমাংসার তেমন ফলপ্রসূ কোনো উদ্যোগ নেননি। ফলে সমস্যা জটিল থেকে আরও বেশী জটিলতর হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন আমাদের জাতীয় সমস্যায় রূপ লাভ করেছে। তবুও আমরা আশাবাদী যে, যদি আন্তরিকভাবে তাদের সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ সেই উদ্যোগ সফল হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন তাদের ওপর ন্যায়বিচার করা এবং তাদের অধিকারকে সমুন্নত ও সংহত করা। এটা সম্ভব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ফলে। রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে হলে রাজনৈতিক মাথায়ও গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে–এটাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধানের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক ও ব্যাংকার জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড.এম.উমার আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. মুহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, ড. মাহফুজ পারভেজ, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ বলেন,

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি অত্যন্ত পুরনো একটি সমস্যা। কিন্তু এর সমাধানের ব্যাপারে তেমন কোনো আন্তরিকতা কোনো সরকারের মধ্যেই দেখা যায়নি। আজও না। বর্তমান সরকারও তেমনভাবে এগিয়ে আসছে না। এমতাবস্থায় এ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু নিয়ে যে কিছু করবে, সেটা আশাও করা যায় না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি এদেশের জন্য একটি পীড়ার সমতুল্য। তাদের সমস্যার যথাযথ সমাধান না হলে দেশও পূর্ণ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। বিষয়টির তাৎপর্য অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার আশু সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন,

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান শক্তির জোরে হবে না। তাদের নেতৃবৃন্দ ও বাংগালী নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। সুদূর ইউরোপ-আমেরিকা থেকে খ্রীস্টান পাদ্রী-পুরোহিতরা এসে তাদের মধ্যে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করতে পারে, আমরা যারা মুসলিম, কেন সেখানে গেলাম না, তাদের সাথে মিশলাম না এবং তাদেরকে কেন ইসলামের দাওয়াত দিলাম না? আমরা যদি তাদের সাথে মিশে তাদের মধ্যে কাজ করি তাহলে দূরত্ব কমতে

www.pathagar.com

সহায়ক হতে পারে। তাদের চাওয়া-পাওয়া ও সুখ-দু:খের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

ড. এম. উমার আলী বলেন,

স্বাধীন চাকমাল্যাণ্ড কিংবা পূর্বতীমুরের মত অনুগত রাষ্ট্র বানানোর প্রচেষ্টা ভারত কিংবা আগ্রাসনবাদী পরাশক্তির থাকাটাই স্বাভাবিক এবং তা পাকিস্তান স্বাধীন হবার সময় থেকেই সমস্যাটি শুরু হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বাংগালী জাতীয়তাবাদ বিরোধী চেতনায় উজ্জীবিত শক্তি খুব কম সময় এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল না। এদের শাষণামলেও বিদেশীদের তৎপরতা থেকে পার্বত্য অঞ্চলকে রক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। এই অঞ্চলকে যথাযথভাবে আবাদ করার জন্য দেশীয় মুসলিম জনবসতি বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে খৃস্টান মিশনারী তৎপরতা প্রকাশ্যে বহুদিন থেকে চালু থাকলেও তার মুকাবিলায় মুসলিম জনবসতি বৃদ্ধির তেমন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দাওয়াত ও তাবলীগের যথাযথ কার্যক্রমও সেখানে নেয়া হয়নি। সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, নৈতিক এবং যৌক্তিক কর্মতৎপরতা এবং কর্মসূচী দিয়েই সেখানকার সম্যসার সমাধান করতে হবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য কাজে লাগিয়ে এ বিরোধ জয় করা সম্ভব হতে পারে বলে মনে করি।

জনাব ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী বলেন,

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। তবে এর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রথমে পড়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের। ভারতের বৃটিশ শাসকরা এই অবহেলিত, অশিক্ষিত ও আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হতদরিদ্র লোকের মধ্যে মানব সেবার নামে এখানে খৃস্টান ধর্ম প্রচার শুরু করে। এ সব উপজাতীয় লোকের ধর্মীয় সমাজ মজবুত না হওয়ায় তারা খৃস্টানদের প্ররোচনায় বিপুলসংখ্যক লোক খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। তার সংখ্যা বিপুল। যেসব উপজাতি পার্বত্য এলাকায় বাস করছে-তারা কেউই ভূমিসূত্রে নয়। তারা সবাই বহিরাগত। তাই তাদেরকে আদিবাসী বলার কোন সুযোগ নেই। বরং তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি সেটাই মুখ্য বিষয়।

www.pathagar.com

জনাব মুহাম্মদ নুরুল আমিন বলেন,

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিটির পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকার কালক্ষেপণ করেছে। শান্তির পরিবেশ সেখানে ফিরে আসেনি। শান্তি চুক্তিতে যেসব কথা বলা হয়েছে তাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে না। শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক মেরুকরণ হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে–একথা বলে শান্তি চুক্তি করা হলেও সেখানে গণতন্ত্র চর্চা নিশ্চিত হয়নি। এই এলাকায় শান্তি আনতে বিচ্চিন্নতাবাদী বা নৈরাজ্য সৃষ্টি কারীদের দমন করতে হবে। স্থানীয় বা জেলা পরিষদকে কার্যকর করতে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের জনগণকে তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডে জড়িত করতে হবে। সরকারকে এই এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধান করবার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন,

পার্বত্য সমস্যা আধিপত্যবাদী ও আন্তর্জাতিক মুসলিম জাতি ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তি কর্তৃক তৈরী। মুসলিম জাতির উত্থান ঠেকাতে এবং মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ লুট ও তাদের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাই তারা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তাই তারা মুসলিম অধ্যুষিত এশিয়া মহাদেশকেই টার্গেট করেছে। এর ফলেই তারা আফগানিস্তান ও ইরাকের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। বৃহত্তর মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার ভিতরে পূর্ব তীমুর নামে একটি খৃস্টান রাষ্ট্র অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠা করেছে। একইভাবে তারা বাংলাদেশের এই মুসলিম দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি খৃস্টান দেশ বানানোর পায়তারা করছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের এ বিষয়টি নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা আছে বলেও মনে হয় না।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন,

বাংলাদেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে দেশী ও বিদেশী অপশক্তি গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী-আধিপত্যবাদীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অফুরন্ত সম্পদ লুট করতে চায় এবং পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম বন্দরকেও কব্জা করতে উদ্যত। পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী পাহাড়ি ও বাংলাভাষী জনতার মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ

www.pathagar.com

শিকার করতে চায় দেশ-বিরোধী অপশক্তি। এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রমাকে বাঁচাতে হবে। নিরীহ পার্বত্যবাসীকে বিভ্রান্ত করে হিংসা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মাধ্যমে যারা বাংলাদেশের এই অংশকে শোষণ, লুণ্ঠন করতে চায়-তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়া বর্তমান জাতীয় কর্তব্য।

ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া বলেন,

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা যদিও অতি প্রাচীন, তথাপিও এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কোনো সরকারই তেমন আন্তরিক হননি। পর্বত নদী ও সাগর বেষ্টিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক অপার করুণা। যে কোন দেশের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ভূখণ্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। আর একারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি শুরু থেকেই আগ্রাসী ভারতের এরূপ লোলুপ দৃষ্টি। অন্যদিকে বাংলাদেশর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন সরকারই এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য তেমনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে আওয়ামী সরকারের এ পর্যন্ত ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমাধান প্রত্যাশা করি।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন,

পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশের নির্দিষ্ট সীমানার একটি অংশ। এ অঞ্চলটি কখনোই পৃথক কোন অংশ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ অংশটি গভীর সড়যন্ত্রের শিকার। যার নেপথ্য প্রধান কয়েকটি কারণ হলো, সে অঞ্চলের মাটির ওপরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মাটির নিচের প্রাকৃতিক এবং তার পাশাপাশি অঞ্চল দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী দেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সীবিচ ও পর্যটন কেন্দ্র হওয়া। আর তাই কোন কোন রাষ্ট্র কোন সংগঠন এ অঞ্চলকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে পৃথক করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে যুগের পর যুগ ধরে সেখানে বহু রক্ত ঝরেছে, আগুন জ্বলছে, চলছে দেশ বিরোধী স্লোগান, চলছে লাল সবুজের পতাকাকে বাদ দিয়ে অন্য দেশের পতাকা ওড়ানোর দুরভিসন্ধি ও দু:সাহসিক অভিযান। কিন্তু প্রকৃত সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং সেখানকার যাবতীয় সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। ■

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ, না বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন?

■

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, বঙ্গভঙ্গ খুব পরিচিত এবং বহুল পঠিত একটি বিষয়। মূলত বঙ্গভঙ্গ ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বপনের কাল। বঙ্গভঙ্গ থেকেই আমরা একটি স্বাধীন মানচিত্র পেয়েছি, পেয়েছি বাংলাদেশর পতাকা। হিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল গোটা ভারতকে একটি হিন্দুধর্মরাজ্য করার। এই আকুতি থেকেই তারা কাজ করে যাচ্ছিল। হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ তাদের সেই দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য বানচাল করে দেয়। ভারত এখনো চায় বাংলাদেশকে দিল্লির অংশ করতে। সেই লক্ষে তারা সকলপ্রকার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

গত ১৬ই অক্টোবর, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "বঙ্গভঙ্গ, না বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. মাহফুজ পারভেজ।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. এম. উমার আলী, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস

www.pathagar.com

সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জাবেদ মুহাম্মাদ প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ বলেন,

বঙ্গভঙ্গ বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বঙ্গভঙ্গ না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যেত না। সঙ্গত কারণে তাই হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। চলেছিল নানামুখী ষড়যন্ত্র। কিন্তু সকল বাধা উপেক্ষা করে অবশেষে বঙ্গভঙ্গ হলো। এটা আমাদের জন্য যতই আন্দ বা খুশির বিষয় হোক না কেন, উগ্রশ্রেণীর হিন্দু এবং হিন্দুসংগঠনগুলো এটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। আজও পারে না। তাদের পুরনো সেই ক্ষতের কারণে এখনো তারা বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপর কালো থাবা বিস্তার করে আছে। ভারতের বহুমুখী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আর বঙ্গভঙ্গের নায়কদের সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা রাখতে হবে। যেমন নবাব স্যার সলিমুল্লাহর কথা বলা যায়। বঙ্গভঙ্গে তাঁর বিশাল ভূমিকা ছিল। এইসব ইতিহাস আমাদের ও নতুন প্রজন্মদের সামনে আরও বেশী করে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন,

ভারত যে বঙ্গভঙ্গকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, তার নজির এখনো দেখা যায় বাংলাদেশের প্রতি তাদের আচরণের মাধ্যমে। মূলত ভারত কখনই এদেশের বন্ধু ছিল না, এখনো নেই, আগামীতেও থাকবে না। এই সত্যকে উপলব্ধি করেই আমাদের সামনে এগুতে হবে।

ড.এম.উমার আলী বলেন,

বাংলাদেশে কাদের প্রত্যাবর্তন? বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। কি উদ্দেশ্যে এ প্রত্যবর্তন? ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা না

www.pathagar.com

বাজীকরদের প্রতিষ্ঠার জন্য? বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন যেমনটা বঙ্গভঙ্গের সময় মুসলিমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল, বাংলাদেশে পত্যাবর্তনের সময় এটা কি সেই চেতনা, পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে হয়েছিল না এর বিপরীতে অন্য কোন ষড়যন্ত্রের ফসল ছিল? প্রবন্ধকার অবশ্য বলেছেন যে আরও ১০০বছর পরে হয়ত এর জবাব পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এখানের শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার মান পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাঝে ওপরের দিকে ছিল এবং মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বার্মা ও থাইল্যান্ড থেকে লোকেরা ঢাকায় পড়া লেখা করতে আসতো, কিন্তু এখন গতি বিপরিতমুখী। যারা বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় বেজার হয়েছিল তারাই কি আজ খণ্ডিত বভঙ্গকে আরও খণ্ডিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা করতে চায়? এই বিষয়টিও আমাদের সামনে রাখা প্রয়োজন।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন,

বঙ্গভঙ্গ ও রদ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে হয়েছে। বাংলার মুসলিম উম্মার প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের বিদ্বেষ মনোভাবের সাথে আমরা সম্যক পরিচিত। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বি হতে পেরেছিলেন। বর্তমান তথাকথিত বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গভঙ্গের রদের যে তৎপরতা চালাচ্ছেন–সে বিষয়টি কারো অজানা নয়। বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনের সময় মুসলিম সমাজের আন্দোলনের কথা আরো বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী বলেন,

হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বিশেষ করে কৃষককুলকে শোষণ, নির্যাতন, তাদের ধর্মীয় কাজে বাধাদান, শিক্ষা সংস্কৃতি, থেকে দূরে রাখার চক্রান্তের বহি:প্রকাশ হিসাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। হিন্দু সম্প্রদায় সারা ভারতব্যাপী তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গঠন করে বৃটিশরাজের সাথে এক তরফা হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু ভারতের ৭ কোটি মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্যকে

www.pathagar.com

উপেক্ষা করতে থাকায় মুসলমানরা তাদের পৃথক জাতি সত্তার কথা প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকে তাই বঙ্গভঙ্গের পরপরই এই ঢাকাতেই স্যার সলিমুল্লাহ্ প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়। তখন থেকেই ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। বঙ্গভঙ্গের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন,

ভঙ্গভঙ্গ নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে চলমান এই সংগ্রাম কি শেষ হয়েছে? উভয় প্রশ্নের জবাবের জন্য ইতিহাসের বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইতিহাস পড়ানো হয় না, যা পড়ানো হয় তা ইতিহাসের বিকৃত খণ্ডাংশ। বঙ্গভঙ্গের একশ বছর পর বাংলাদেশে ইতিহাস এখন পাতিহাঁস হয়েছে। মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছে তারা এখন আমাদের দেশে জাতীয় বীরের মর্যাদা পাচ্ছে। সূর্য সেনের নামে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হলের নাম করণ করা হয়েছে। প্রীতি লতার নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীবাস করা হয়েছে। ক্ষুদী রামকে বলা হচ্ছে শহীদ। ঘটা করে তার জন্মবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। এই ক্ষুদীরাম বঙ্গভঙ্গ রদকল্পে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল এবং বোমা হামলার অপরাধে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল। তার ফাঁসি বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনকে দাবানলে পরিণত করেছিল। তারপরও বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। প্রকৃত ইতিহাস আমাদের জানতে হবে।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন,

ভারতের হিন্দুদের কোম্পানী আমল থেকেই ইংরেজদের সাথে গভীর মিতালী ছিল। তাদের সাথে সুসম্পর্কের সুবাদে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিল। বৃটিশ ও হিন্দুরা একত্রে মিলে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করার পায়তারা করতো। বিশেষ করে বাংলায় ফারায়েজী ও তিতুমীরের আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদের আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের প্রথম আযাদী আন্দোলন প্রভৃতির জন্য বৃটিশরা মুসলমানদেরকে দায়ী করে। এ কারণে মুসলমানদেরকে একেবারে পঙ্গু করে রাখার পরিকল্পনা করে এবং নির্যাতন চালাতে

www.pathagar.com

থাকে। হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় ঐক্যের প্রতি আঘাত বলে অভিহিত করে। বঙ্গভঙ্গ নয় বরং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন–এটাই ঐতিহাসিকভাবে সত্য। এটাই হওয়া উচিৎ।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন,

বঙ্গভঙ্গের আগে গোটা বাংলা ছিল এক। আজকের বাংলাদেশ বা তখনকার পূর্ববঙ্গ এবং আজকের পশ্চিমবঙ্গ মিলে ছিল একদেশ। যুক্ত বাংলা। এই অখণ্ড বাংলা গণ্ডিত করেছিল বৃটিশ রাজশক্তি। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সূত্র ধরেই সূচনা হয় স্বদেশী আন্দোলনের। এর পুরোধা ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি। বাংলাকে মাতা বা দেবীর সাথে তুলনা করে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ রোধ করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে প্রচার করা হয়। এরই ধারা বাহিকতায় গঠিত হয় অনুশীলন সমিতি যুগান্তর। সেটির নামে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। বিমলান্দ শাসমল-এর ভাষায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহতীতভাবে মুসলমান বিরোধী এবং গভীরভাবে মুসলিম স্বার্থের পরিবাহী। এসব ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম বলেন,

বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইতিহাসের পাতা থেকে এটাকে মুছে ফেলা যাবে না। এটা আমাদের জাতির জন্য একটি প্রণোদনাও বটে। ১৯০৪ সালে বড়লাট কার্জন এ অঞ্চলে আসলে স্যার সলিমুল্লাহ আলাদা প্রদেশ দাবি করেন। গোটা বঙ্গভঙ্গে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ব্যাপক ভূমিকা ছিল। জাতির সামনে সেই ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন।

জনাব জাবেদ মুহাম্মাদ বলেন,

বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির কথা মাথায় রেখে লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে বাংলাকে বিভক্ত করা হলেও এর মধ্যে নিহিত ছিল আজকের ঢাকাকেন্দ্রিক অনেক পরিকল্পনা। বৃটিশরা এর মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা করলেও এর মধ্যে নিহিত ছিল পূর্ব বাংলার উন্নতি শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার আর্থ সামাজিক অগ্রগতি প্রভৃতি। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ বঙ্গের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সরকারের

www.pathagar.com

অন্যায় আচারণের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার মতো একটি শক্তিশালী সংগঠন গঠিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হরতাল এবং রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, ফজলুল হক, জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানান এবং পূর্ববঙ্গের উন্নয়নে এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেন। তারই সূচনা ধরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে একে একে দানা বেধে ওঠে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন। এভাবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, তারপর বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের অভ্যুদেয়। সুতরাং বলা যায় বঙ্গভঙ্গ বাংলাদেশের সূচনাকাল জাতীয়তাবাদের বন্ধন নবজাগরণের কাল। ■

www.pathagar.com

সার্ক : সূচনা, ক্রমবিকাশ ও সাফল্য-ব্যর্থতার পর্যালোচনা

■

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক **জনাব আবুল আসাদ বলেন,** সার্ক এদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম। যেহেতু বাংলাদেশসহ বেশ কিছু মুসলিম দেশ সার্কের সাথে সম্পৃক্ত, এজন্য সার্ককে অকার্য করার জন্য এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থান্বেষী ও ঈর্ষাপরায়ণ দেশ ও জাতিগোষ্ঠী ধরনের কূট-কৌশল চালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনেই সার্ককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কারণ এদেশের স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলার জন্য সার্কের মত প্লাটফর্মের প্রয়োজন অনেক বেশী। সার্ককে কার্যকর করার জন্য আপোষহীন নেতৃত্বের প্রয়োজন। দু:খের বিষয়, সেটা এখন দেখা যাচ্ছে না। দুর্বল নেতৃত্ব দিয়ে কিছু করা যায় না। সার্ককে কার্যকর করার জন্য মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। নেতৃত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে সার্ক তার যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গত ১৩ই নভেম্বর, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য রাখেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "সার্ক: সূচনা, ক্রমবিকাশ ও সাফল্য-ব্যর্থতার পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মাহফুজা পারভেজ, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বদিউল আলম মজুমদার, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন,

সার্ক অতি প্রয়োজনীয় একটি প্লাটফর্ম। সার্কের প্রথম দিকের নেতৃত্ব ছিল অনেক বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী। তারা চলে গেলে তাদের স্থলে একশ্রেণীর ভারত-তোষণকারীর হাতে সার্কের নেতৃত্ব চলে যায়। ফলে সার্কের মূল উদ্দেশ্যসহ এর কার্যক্রম ব্যহত হয়। এখনতো সার্ক মৃতপ্রায়। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্মটিকে আমরা মৃত দেখতে চাই না। দেখতে চাই এর সচলগতি। সার্কের সেই গতি ফিরিয়ে আনার জন্য চাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তাহলেই সার্ক আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। যে কোনো মূল্যে সার্ককে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন,

সার্ক ছাড়া আমাদের কথা বলার মতো দ্বিতীয় কোনো প্লাটফর্ম নেই। ভারতও এটা জানে। এজন্যই তারা সার্ককে অকার্যকর করতে চায়। ভারতের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। তা না হলে আমরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হব।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন,

দক্ষিণ এশিয়ার জন্য সার্কের বিকল্প আর কি আছে? কিন্তু সেই সার্কের কার্যক্রম এখন মন্থর। এর পেছনে কারা সক্রিয়ভাবে মদদ যোগাচ্ছে সেই বিষয়ে আমাদের সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সার্ককে কোনোভাবেই মৃত অবস্থায় দেখতে চাই না। এটাকে কার্যকর করার জন্য মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন,

দুঃখের বিষয় যে আমরা খুব দ্রুত পেছনের ইতিহাসকে ভুলে যাই। যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সার্কের সৃষ্টি—আজ তা সুদূর পরাহত। এই অবস্থার জন্য দায়ী কারা? আমরা কি তাদের চিনি না? তাহলে সার্ককে কার্যকর করার জন্য তেমন জোরালো কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে না কেন? আর যাই হোক নতজানু মনোভাব নিয়ে বড়কিছু করা যায় না। যেকোনো মূল্যে সার্ককে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন।

ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন বলেন,

দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক উন্নয়ন সাধনের সুদূরপ্রসারী চিন্তা বাস্তবায়নের জন্য সার্কের জন্ম। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে এ উদ্যোগকে এখন ব্যর্থ করছে বলে মনে হয়। সার্কের সনদে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের অধিকাংশই বর্তমান একটি শক্তিধর দেশের দাদাগিরির কারণে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। নারী ও শিল্প পাচার বন্ধ হয়নি। ভারতের ফেন্সিডিলে বাংলাদেশের সর্বত্র সয়লাব। তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ পাচারের কারণে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের ডিস ও প্রিন্ট মিডিয়ার আগ্রাসনের কারণে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের চরিত্র হনন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আমার মনে হয় ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হতে পারলে সার্কের মত প্রতিষ্ঠান কার্যকর হতে পারবে না।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন,

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মহৎ। পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটা একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ইউরোপ-আসিয়ান ইত্যাদির মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলো ভাল কাজ করছে, তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ ও চেতনা অভিন্ন বা কাছাকাছি। কিন্তু সার্কের দেশগুলোর রয়েছে ভিন্ন বিশ্বাসী আদর্শ কৃষ্টি কালচার সামাজিক আচার আচারণ। আদর্শিক ভিন্নতার কারণে এ সংস্থাটি

www.pathagar.com

সচলভাবে চলতে পারছে না। দ্বিতীয়ত: ভারত এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করছে। সকল দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে নিজের প্রভাব-বলয় তৈরী করছে। ভারত বাংলাদেশেও সেটা করছে। তাই সার্ক আজ হাঙ্গর হয়ে সার্কের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোকে নিজের পেটে ভরতে চাচ্ছে। সুতরাং শক্তি অর্জন করে ভারতের মুকাবিলা করতে হবে। ভারতের আধিপত্যকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করতে হবে।

ড. মাহফুজ পারভেজ বলেন,

সার্ক যেভাবে গতিশীল হতে পারত, ভারতের মাতব্বরীসহ কতিপয় কারণে সেভাবে এগুতে পারেনি। কিন্তু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-কৌশলগত কারণে সার্ককে শক্তিশালী হতেই হবে। কারণ ১. বিশ্বের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়াকে সম্মিলিতভাবে টিকে থাকতে হবে; ২. দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। অতএব, সার্ককে বাঁচিয়ে রাখা এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও আশ্রয়স্থলরূপে তৈরি করা প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম মজুমদার বলেন,

সার্ককে সুগঠিত ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়োজন। ভারতের আগ্রাসী মনোভাব বন্ধ করা না গেলে সার্ককে কার্যকর করা যাবে না। দুর্বল ও নতজানু সরকারগুলোই সার্কের মূল সমস্যা। কিন্তু সার্ককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভারতের সমস্ত অপকর্মগুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে। সার্কে এ পর্যন্ত যত সিদ্ধান্ত হয়েছে তার প্রায় ৮৫% ভাগ এখনও বাস্তবায়ন হয়নি, এটা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন। ■

www.pathagar.com

কাশ্মির : ভারতের তৈরি আরেক ফিলিস্তিন

■

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, কাশ্মির মূলত এখনও টিকে আছে সেখানকার লড়াকু জনগণের প্রাত্যহিক সংগ্রামমুখর সচেতনতা ও আন্দোলনের ফলে। সর্বগ্রাসী ভারত কাশ্মিরে যা করছে, ফিলিস্তিনে ইসরাইলও তাই করছে। ভারত এবং ইসরাইলের চরিত্র অভিন্ন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের কোনো ভূমিকাই নেই। তারা যেন কাশ্মির ও ফিলিস্তিনকে ভুলেই গেছে। অথচ এটা আমাদের কাম্য ছিল না, থাকতেও পারে না। মূলত কাশ্মিরের শান্তিপূর্ণ সমাধান আমাদের একান্ত কাম্য।

গত ২৭শে নভেম্বর, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনানে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে "কাশ্মির : ভারতের তৈরি আরেক ফিলিস্তিন" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব আজিজুল হক বান্না।

উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব

www.pathagar.com

ড.এম.উমার আলী, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. মাহফুজ পারভেজ, মুহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার এস.এম.ফজলে আলী, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আতাহার উদ্দিন, যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ।

সেমিনারে প্রাসঙ্গিক বক্তব্যসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ।

অধ্যাপক এ.কে.এম.নাজির আহমদ বলেন,

কাশ্মির বর্তমান একটি বার্নিং ইস্যু। এটাকে ডেড ইস্যুতে পরিণত করতে দিচ্ছে না সেখানকার জনগণই। এখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ইহুদী, খ্রীস্টান এবং মুশরিকরা একজোট হয়ে, ঐক্যবদ্ধভাবে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের মুকাবিলা করাই হলো সময়ের দাবি। ভারত কখনই চায় না-কাশ্মির সমস্যার সমাধান হোক। যেমন তারা চায় না বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। ভারতে যে সরকারই আসুক না কেন, তাদের এই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না। ভারত চায় কাশ্মিরকে ডেড ইস্যুতে পরিণত করতে। আমরা যেন তাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করতে না দেই। কাশ্মির, ফিলিস্তিনসহ মুসলিম বিশ্বের জন্য আমাদের ব্যাপক ভূমিকা রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

ড.এম.উমার আলী বলেন,

ভারত কাশ্মিরকে ধ্বংস করে দিতে চায়, কারণ তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস-সেটা সম্ভবপর হবে না। আল্লাহপাকই কাশ্মিরকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট।

ড.মাহফুজ পারভেজ বলেন,

কাশ্মীর শুধু উপমহাদেশের জন্য নয়, তাবৎ বিশ্বের জন্য একটি করুণ উদাহরণ। সেখানে বছরের পর বছর স্বাধীনতার দাবিকে অস্ত্র ও সামরিক শক্তিতে গলা টিপে ধরা হচ্ছে। কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবী আজকের মুক্ত বিশ্বের জন্যও লজ্জার বিষয়। কীভাবে স্বাধীনতাকে পদানত করা যায় তা আধুনিক বিশ্ব

www.pathagar.com

দেখতে পাচ্ছে সম্প্রসারণবাদী-আগ্রাসী ভারতের শোষণ আচরণে। তবে ইতিহাস ও সভ্যতার নিরিখে এ কথা বলা যায় যে, অচিরেই কাশ্মির ভারতের জন্য ভিয়েতনামে পরিণত হবে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা আজ বিশ্বের সকল মুক্ত মানুষের প্রাণের দাবী। একই সঙ্গে কাশ্মীরের সামরিক হস্তক্ষেপ ও অস্ত্রবাজী অতি দ্রুত বন্ধ করা প্রয়োজন উপমহাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন,

কাশ্মীরের অবস্থান হচ্ছে পাক ভারত উপমহাদেশের সর্ব উত্তরে এবং মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে। এর আয়তন ৮৬০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। এই ভূখণ্ডটি চারদিকে ভারত, পাকিস্তান, চীন এবং আফগানিস্তান দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার ৯০% মুসলিম। কাশ্মীরের সবগুলো নদী পাকিস্তান ভূখণ্ডে গিয়ে পতিত হয়েছে, এর সড়ক মহা সড়ক যোগাযোগও পাকিস্তানমুখী, আবার এর স্থল-সীমানার সিংহভাগ পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত। বৃটেন ভারত ছেড়ে যাবার সময় প্রশ্ন উঠলো তারা কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে এই প্রশ্নের সুরাহা হয়। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাসমূহে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে মুসলিম লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্টতায় জয়লাভ করে। ভারত বর্ষকে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তান এই দু'টি দেশে বিভক্ত করার ভিত্তি রচনা করে এবং এর ভিত্তিতে গ্রেট বৃটেন, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দেশ ভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু দু:খের বিষয় কোনো চুক্তিই সেখানে আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। বরং সমস্যা আরোও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন এমন এক পর্যায় সেখানে বিরাজ করছে যে সেখানকার মানুষেরা সর্বমুহূর্তে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা এখন সময়ের দাবি।

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ বলেন,

পাকিস্তান শুরুতে কাশ্মীরের প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দেখায়– প্রবন্ধে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে ভাল হত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটি আরো বিস্তারিতভাবে আসা দরকার। সেখানকার স্বাধীনতা

www.pathagar.com

সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সম্মতি থাকা উচিত। বাংলাদেশকে কাশ্মীরের স্বাধীনতাবাদীদের সক্রিয় সমর্থন করতে হবে। কাশ্মীরের ভেতরের দলগুলো, যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করছে তাদের সাথে বাংলাদেশের কাদের সখ্যতা আছে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। মুসলিম জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব কর্তব্য হলো মুসলিম সকল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। যাতে তারা ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কাশ্মীরকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় ।

জনাব ইঞ্জিনিয়ার এস.এম. ফজলে আলী বলেন,

পাক-ভারত উপ মহাদেশের বিভক্তির সাথে কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাস জড়িত। ভারতের কংগ্রেস নেতারা প্রথম থেকেই পুরো ভারত হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে তাই চেয়ে এসেছিলেন। তারা কাশ্মীরের ওপর আধিপত্য খাটাতে প্রথম থেকেই কাজ করে যাচ্ছিল। ভারত তার সেই নীতি থেকে এখনো সরে আসেনি। বরং কাশ্মীরের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া তো দূরের কথা, মৌলিক অধিকারটুকুও দিচ্ছে না। কাশ্মির সমস্যাটি এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবেচনা করা উচিত। আমরা সেখানকার পূর্ণ স্বাধীনতার প্রত্যাশা করি।

জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক বলেন,

ভারতের সম্প্রসারণবাদী ও আগ্রাসী ভূমিকার রহস্য উন্মোচনে এধরনের প্রবন্ধ অনেক বেশী প্রয়োজন। প্রবন্ধে কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। অনেক তথ্যবহুলও বটে। তবে প্রবন্ধের বিন্যাসে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। কাশ্মিরের বার্নিং ইস্যুকে কালোকাফনে মুড়িয়ে ডেড ইস্যুতে পরিণত করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি কাশ্মিরের জনগণ সেটা কখনই হতে দেবে না।

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আতাহার উদ্দিন বলেন,

কাশ্মির ভারতের তৈরী আরেক ফিলিস্তিন-প্রকৃত অর্থেই সঠিক। ভারত কাশ্মিরে যেধরনের যুলম নিপীড়ন চালাচ্ছে তা বর্বরতাকেও হার মানায়। কোনো সভ্যসমাজ সেটা কামনা করে না। কাশ্মিরের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন না জানিয়ে তাই উপায় থাকে না। কাশ্মিরের স্বাধীনতা এখন সময়ের দাবিও বটে।

জনাব শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন,

জনাব আজিজুল হক বান্না লিখিত কাশ্মির : ভারতের তৈরী আরেক ফিলিস্তিন শীর্ষক প্রবন্ধটি চমৎকার। এটি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ, এটি ছোট-খাটো পুস্তিকাও হতে পারে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লিখিত প্রবন্ধটি প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বে ঠাসা। প্রবন্ধটি সুলিখিত। প্রবন্ধকার যথেষ্ট পরিশ্রম করে এটি তৈরী করেছেন। উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মির ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মির--এ দু'য়ের চলমান বাস্তবতা প্রবন্ধটিতে পরিষ্কারভাবে বিধৃত হয়েছে। কাশ্মির কতটুকু ভারতের বা কতটুকু পাকিস্তানের অথবা ভূস্বর্গ বলে কথিত এ চমৎকার ভুখণ্ডটি কার অংশে থাকা সমীচীন--এ বিচার অপেক্ষা আজকের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বেশী ও সর্বাংশে সত্য যে, কাশ্মির কাশ্মিরিদের। বিজ্ঞ লেখক ইতিহাসের বিশ্লেষণে এ অমোঘ সত্য তাঁর প্রবন্ধে প্রতিপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। লেখককে ধন্যবাদ। তবে প্রবন্ধের শেষাংশে আশু ব্যবস্থা সমূহ শীর্ষক অংশটি আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল। মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলোও আরও স্পষ্ট হতে পারতো। তারপরও বলা যায় প্রবন্ধটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। এর ভাষা সাবলীল। প্রবন্ধকারকে পুনরায় মুবারকবাদ জানাই। ■

[২০১০ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রতিটি সেমিনার পরিচালনা করেন মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক মোশাররফ হোসেন খান।]

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com